গৃহিনীর জন্য বিছানা পেতে দিলে বেঞ্চিতে। তার স্বাভাবিক সেবা-প্রবৃত্তি এখানেও সজাগ আছে।

গিন্নি বললেন, কোন্ ইষ্টিশান রে মিনু ?

তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়েটি মুখ বাড়িয়ে বললে, ব্যাণ্ডেল জংসন—

—সব শুয়ে পড় তোরা। শরৎ ওদের বিছানা করে দাও—

মিনু তাড়াতাড়ি বলল, আমি বিছানা পেতে নিচ্চি মা—আমার পাতাই আছে।

শরৎ অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে চাইলে। বাঃ, বেশ মেয়েটি। এতক্ষণ চুপ করে লাজুকের মত আপন মনে বসেছিল।

পথে তারপর মেয়েটির সঙ্গে ওর বড় ভাব হয়ে গেল। ওর ভাল নাম মৃণাল, মৃদু স্বভাব, হৃদয়বতী। ও শরৎকে কি চোখে দেখে ফেলেচে, দিদি বলে ডাকে, লুকিয়ে হাতের কাজ কেড়ে নেয়।

জামালপুরে বদল করে ওরা গেল প্রথমে মুঙ্গেরে। সেখানে গিন্নীর ছোট ঠাকুর-পো চাকরী করে। গঙ্গার ধারে বেশ ভাল বাসা। তিন দিন ধরে ওরা কাটালো সেখানে, শরৎ মিনুকে সঙ্গে নিয়ে কষ্টহারিণীর ঘাটে রোজ স্নান করে আসে। গৃহিনীর বাতের ধাত, তিনি বাথরুমে স্নান করেন।

কষ্টহারিণীর ঘাটে প্রথমে যে দিন গিয়ে দাঁড়াল, শরতের মন অভিভূত হয়ে পড়লো—গঙ্গার রূপ দেখে। একদিকে জামালপুরের মাবক পাহাড়ের লম্বা, টানা সুনীল রেখা, সামনে প্রশস্ত পুণ্যতোয়া জাহ্নবী, দু'একখানা পাল তোলা নৌকা নদীবক্ষে, কত স্নানার্থীর যাতায়াত।

পৃথিবীতে এমন সুন্দর জায়গাও আছে ?

আবার চোখে জল আসে, শরৎ দেখেন নি কখনো এসব।

মিনু বলল, দিদি চেয়ে দেখো—এই যে ভাঙ্গা পাঁচিল না ? এখানে মীরকাসীমের দুর্গ ছিল। ওই যে ফটক দিয়ে এলাম—দেখলে তো ?

—তোর দিদি মুখ্যু মেয়ে, তোরা এ কালের ইস্কুলে পড়া মেয়ে দিদিকে একটু শিখিয়ে নে। মীরকাসীমের দুর্গ বললে তো—কে ছিল সে?

—আহা দিদি, তুমি কিছু জান না। শোনো বলি—

তারপর মিনু বিজ্ঞভাবে স্কুলে সদ্য অধীত ইতিহাসের বিদ্যা সবিস্তারে জাহির করে।

শরৎ চোখ বড় বড় করে বলল—ও!

দিন বেশ কেটে যায়। একদিন সবাই মিলে চণ্ডীর মন্দিরে পুজো দিতে গেল, আর একদিন গেল সীতাকুণ্ড। মুঙ্গের থেকে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে গমের ক্ষেত, ছোলার ক্ষেতের পাশের পথ দিয়ে গিয়ে, কত ছোট বড় বস্তি ছাড়িয়ে কতখানি বেড়িয়ে এল সবাই মিলে।

পাহাড় জিনিসটা শরতের কাছে একটা বিস্ময়ের বস্তু!

প্রথম যেদিন মিনু ওকে দেখালে—ঐ দ্যাখো দিদি জামালপুরের পাহাড়—

শরৎ অপলক চোখে চেয়ে রইল সেদিকে। তারপর আরো ভাল করে দেখলে যেদিন মুঙ্গের থেকে ওরা বখ্‌তিয়ারপুর রওনা হোল। কাজরা ষ্টেশনের কাছে এবং ষ্টেশন ছাড়িয়ে বাঁ দিকে সে কি লম্বা, উঁচু পাথরের পাহাড়—এত বড় বড় পাথর যে আবার হয়, তার এত বড় স্তূপ হয়—এ কথা কে আবার কবে ভেবেছিল?

কিউলের কাছাকাছি এসে দূরে দূরে কত নীল পাহাড়—শরৎ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। দেখে মনে আনন্দ হয়, দুঃখও হয়—কেবলই মনে হয় বাবাকে এসব সে যদি আজ দেখাতে পারতো!

রেলে যেতে যেতে একটা চমৎকার জায়গা সে দেখেচে—মনের মধ্যে গেঁথে গেল জায়গাটা। কাজরা পাহাড়ের একটা কি সুবৃহৎ গাছের ছায়ায় অনেকটা যেন পাথরের সান বাঁধানো রোয়াক, চারিধারে শুধু

পাহাড়, নিকটেই একটা ঝর্ণা ঝিরঝির করে পাহাড় থেকে বয়ে নেমে এসেচে। কি শান্তি পাহাড়ের ওপর সান বাঁধানো রোয়াকের মত পাথরটাতে। কি ছায়া!

ট্রেণের এককোণে সে বসে বসে ভাবে বাবাকে নিয়ে সে ওই থানে একটা ছোট ঘর বাঁধবে। মাঝে মাঝে গড়-শিবপুর থেকে বাবা আর সে ওখানে এসে বাস করবে তু'মাস, তিনমাস। জ্যোৎস্না রাতে এ দিকের সেই যে পাথরখানা বাবা ওটার ওপর বসে বেহালা বাজাবেন, তাঁর সেই প্রিয় গানটি গাইবেন—

"তাঁরা কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে, সংসার গারদে থাকি বল্"—

ভাবতে বেশ লাগে। যদিও সে জানে, এ সব ভাবনা আকাশকুসুম, কোথায় বা বাবা, কোথায় কে? এত দূর দূর সব জায়গা আছে তা হোলে? গড়শিবপুর থেকে, কলকাতা থেকে? সত্যি পৃথিবীটা কত বড়—না মিনু?

মিনু হেসে খিল্ খিল্ করে গড়িয়ে পড়ে বলল—দিদি, তুমি বড় ছেলেমানুষ। কিছু জানো না।

—মুখ্যু যে তোর দিদি—তোরা আজকাল কত পড়িস বোন কত জানিস্—

—দিদি, তোমাদের বাড়ীর যে বড় গড়টা আর সেই ভাঙা কি কি পাথরের মূর্ত্তি সেই বলেছিলে?

—বারাহী দেবীর মূর্ত্তি।

—সেটা অন্ধকারে চলে বেড়ায় জঙ্গলের মধ্যে—না?

—হ্যাঁ—তাই মিনু।

—সামনে যে পড়ে তাকে মেরে ফেলেন বুঝি?

—এই রকম সবাই বলে। গড়ের জঙ্গলে সেই তিথিতে কেউ যায় না প্রাণের ভয়ে।

—সব দিন বুঝি নয়?

—তিথির দিনে।

—আচ্ছা দিদি—কখনো এ রকম হ'তে দেখেচ তুমি? তোমাদেরই ত গড়—

শরৎ গড়শিবপুরের জঙ্গল থেকে বহু দূরে থেকেও যেন ভয়ে শিউরে উঠে বলল—না দিদি, আমি কিছু দেখিনি চোখে। তবে পায়ের দাগ দেখেচে অনেকে—আমিও দেখেচি ছোটবেলায়—

—কিসের পায়ের দাগ?

—বারাহী দেবীর পাথরের পায়ের ছাপ—

—সত্যি?

—সত্যি ভাই মিনু। তোর গা ছুঁয়ে বলচি—

শরৎ যুবতী হলে কি হবে, ছেলেপুলে হয় নি, একা নির্জ্জন গ্রাম্য সংসারে চিরদিন কাটিয়েচে, বালিকা স্বভাব তার যায় নি। যায় নি বলেই সে বালিকাদের সঙ্গে নিজেকে যত মিশ খাওয়াতে পারে, বড়দের দলে তেমন পারে না। মিনুর সঙ্গে তাই তার মিল-ছিল ভালই—যেমন গাঁয়ে থাকতে মিলেছিল রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে। বখ্‌তিয়ারপুর থেকে ওরা গেল রাজগীর। কর্ত্তার শরীর ভাল নয়, গিন্নীর বাতের ধাত—রাজগীরের উষ্ণ-কুণ্ডে স্নান করে বাত ভাল করতে চান। মিনু ও শরৎ বাসা থেকে বেরিয়ে রাজগীরের বৌদ্ধ মঠ পার হ'য়ে বাজার ও উষ্ণ-কুণ্ডকে ডাইনে রেখে বেণুবন ও বৈভার পর্ব্বতের ছায়ায় ছায়ায় সোনভাণ্ডার গুহা পর্য্যন্ত বেড়িয়ে আসে সরস্বতী নদীর ধারের পথ বেয়ে। ওদের ডাইনেই থাকে সেই গৃধ্রকূট পর্ব্বত ও সেই সুপবিত্র বেণুবন, বুদ্ধদেব যেখানে শিষ্য আনন্দকে উপদেশ দিয়াছিলেন। হাজার বছর ধরে পার্ব্বত্য সরস্বতী নদীর বাতাসে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন পূত ও করণ্ড বেণুবন ধ্বনিত হয়, হাজার হাজার বছরের জ্যোৎস্নালোকে বৈভার পর্ব্বতের শিখর দেশ উদ্ভাসিত

হয়—ছেলেমানুষ মিনু ও অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়ে শরৎ তার কিছুই খবর রাখে না। তবুও মিনু তার স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের জ্ঞানকে আশ্রয় করে বলল—এই যে রাজগীরি দেখছো দিদি, এর নাম রাজগৃহ। মগধের রাজধানী ছিল রাজগৃহ—জরাসন্ধের নাম জানো তো দিদি? এখানে জরাসন্ধের রাজধানী ছিল—

মগধের খবর রাখে না শরৎ, কিন্তু কাশীরাম দাসের মহাভারত ও গ্রাম্য যাত্রার কল্যাণে জরাসন্ধের নাম তার তার অপরিচিত নয়।

শরতের চোখ বিস্ময়ে বড় বড় হয়। জরাসন্ধের রাজ্যে এসে গিয়েছে তারা—পুরাণের সেই জরাসন্ধ? কতদূরে এসে পড়েছে আজ···কতদূর বিদেশে?

এখানে প্রতিদিন ওরা উষ্ণ-কুণ্ডে স্নান করে, গিন্নীকে ধরে এনে রোজ স্নান করাতে হয়, শরৎ অত্যন্ত যত্নে নিয়ে আসে, অত্যন্ত যত্নে নিয়ে যায়। গিন্নী শরতের ওপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট—সেবাপরায়ণা শরৎ প্রাণ দিয়ে আশ্রয়-দাত্রীর সেবা করে। সে সেবার মধ্যে এতটুকু ফাঁকি নেই।

রাজগীর থাকতেই গিন্নীর এক জা কোন্ জায়গা থেকে ছেলেপুলে নিয়ে ওদের ওখানে হাওয়া বদলাতে এলেন। ইনি নাকি বেশ বড় লোকের মেয়ে, স্বামী পশ্চিমের কোন সহরে ইনজিনিয়ার, মোটা পয়সা রোজগার করে। সঙ্গে দুটি ছেলেমেয়ে, একজন আয়া এসেচে। সর্ব্বাঙ্গে সোণার গহনা—গুমোরে মাটিতে পা পড়ে না। দোহারা গড়ন, খুব ফর্সাও নয়, খুব কালোও নয়—দাম্ভিক মুখশ্রী।

প্রথম দিন থেকেই মিনুর কাকীমা শরতের ওপর ভাল ব্যবহার করতো না। যে দিন গাড়ী থেকে নামলো—সেই দিনই বিকেলে মিনু ও শরৎ রাজগীরের বাজার ছাড়িয়ে সরস্বতী নদীর ধারে বেড়িয়ে সন্ধ্যার কিছু আগে ফিরলো। মিনুর কাকী অমনি শরৎকে বলে উঠলো, ছেলে দুটোকে একটু কোথায় ধরবে, না কোথা থেকে এখন বেড়িয়ে

ফিরলো বাম্‌নী, ও বাম্‌নী—খোকাদের কাপড় ছাড়িয়ে গা-হাত ধুইয়ে দাও—

তারপর থেকে প্রত্যেক সময় সেই শরৎকে ডাকে 'বাম্‌নী' বলে। শরৎ নিজের হাতেই দু'বেলার রান্নার ভার নিয়েছিল। বাড়ীর পাচিকাকে যে চোখে দেখা উচিত, মিনুর কাকী সেই চোখেই দেখতো ওকে।

একদিন মিনুকে ডেকে বলল, হাঁরে, বাম্‌নীকে নিয়ে রোজ রোজ যাস কোথায়?

—কে? দিদি? দিদির সঙ্গে বেড়াতে যাই—

—ছ্যাখ্‌ তোকে বলে দিই মিনু! চাকর-বাকরের সঙ্গে বেশি মেশামেশি করা ভাল নয়। সেবার তো দেখিনি, ওকে কোথা থেকে আন্‌লি?

—মা কলকাতা থেকে এনেচে এবার।

—ক'টাকা মাইনে ঠিক হয়েচে জানিস?

—আমি জানিনে কাকীমা। তবে আমার মার যিনি গুরু-মা, কালীঘাটে থাকেন, তিনিই দিয়েচেন।

—যাক্‌গে, ওদের সঙ্গে এত মেশামেশি ভাল না বাপু। ওদের নাই দিলেই মাথায় চ'ড়ে বসবে, চাকর-বাকরকে কখনো নাই দিতে নেই। অমনি একদিন বলে বসবে দুটাকা মাইনে বাড়িয়ে দাও—ওসব করিস নে।

—উনি কিন্তু তেমন নয় কাকীমা—বড় ভাল, কি কথাবার্তা! ওঁদের দেশে মস্ত বড় বাড়ী ছিল, এখন পড়ে গিয়েছে—গড় ছিল বাড়ীতে—কেমন দেখতে দেখছো তো? বড় বংশের মেয়ে—

মিনুর কাকীমা হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি। একটু সাম্‌লে নিয়ে বললে, তোকে এই সব গল্প করে বুঝি? কলকাতা থেকে এসেচে, ওই

বয়েস—যাই হোক, ওরা লোক ভাল হয় না। সে কথা তোর শোনার দরকারও নেই—মোট কথা তুই ছেলেমানুষ, ওর সঙ্গে অত মেলামেশা করো না—বারণ করলুম।

তারপর থেকে মিনুর সত্যিই শরতের সঙ্গে বেড়ানো বন্ধ হয়ে গেল, কাকীমার হুকুমে।

একদিন মিনুর কাকীমা শরৎকে ডেকে বললে, ওগো বামনী, শোনো এদিকে। আগে কোথায় কাজ করতে?

শরৎ এই বৌটির পাশ কাটিয়ে চলতো—এপর্য্যন্ত সামনেই এসেচে কম, উত্তর দিলে—কাজ বলচেন? কাজ—কলকাতাতেই—

—কোথায় বলোতো? আমরা কলকাতার লোক। সব চিনি। কোথায় ছিলে?

—কালীঘাটে গৌরী-মার কাছে?

—না না, আমি বলচি কাজ করতে কোথায়?

—কাজ করিনি কোথাও।

—তবে যে খানিক আগে বললে কাজ করতে। বাড়ী কোথায় তোমার?

—যশোর জেলার গড়শিবপুর—

—আচ্ছা, তোমার নাম কি বলো। কি পোষ্টাফিস তোমার গাঁয়ের, আমরা চিঠি লিখবো। তোমাকে সেখানে কেউ চেনে কি দেখা দরকার। অজানা লোককে রাখা ঠিক নয় কিনা? তোমার কেউ আছে, সেই কি নাম বললে, সেই গাঁয়ে?

শরতের মুখ শুকিয়ে গেল। সে সত্য কথা বলে বিপদে পড়ে যাবে এমন তা ভাবেনি। কথা বানিয়ে বলা তার অভ্যাস নেই—তার বাবাও যেমন চিরকাল সোজা সরল কথা বলে এসেচেন, সেও তাই শিখেচে। এখন কি করা যায়, দেশে চিঠি লিখলে তো সব ফাঁস হয়ে যাবে।

কিন্তু এর মধ্যে একটা সত্য কথা বলবার ছিল, ডাকঘরের নাম তার জানা নেই। আগে ডাকঘর ছিল কুলবেড়ে। সে ডাকঘর উঠে গিয়েচে, বাবার কাছে সে শুনেছিল—তাদের কস্মিন্‌কালে চিঠিপত্র আসে না, কেই বা দেবে, ডাকঘর যে কোথায় হয়েচে।

সে বললে—ডাকঘর কোথায় জানিনে—

—ওমা, সে কি কথা—ডাকঘর জানো না কোথায়—কে আছে তোমার?

—কেউ নেই মা—

কথাটা বলবার সময়ে শরতের গলা ধরে গেল, মিনুর কাকীমা সেটা লক্ষ্য করলে। গিন্নীকে গিয়ে বললে—দিদি, লোক দেখে রাখতে হয়। বামুনীর বাড়ীঘর আজ জিজ্ঞেসে করলুম তা বলতে চায় না। আমি তো ভাল বুঝচি নে। ওকে তাড়াও—

গিন্নী বললেন, গৌরী-মা ওকে দিয়েচেন, তাঁর কাছে থাকতো। ভাল মেয়ে বড্ড—কোনো বদ্‌চাল তো দেখিনি। ওর আর কেউ নেই, তখনি জানি। ওকে তাড়াতে পারবো না।

আট

মিনুর কাকীমার এ খুঁটিনাটি জেরার পরদিন থেকে শরৎ ভয়ে আর তার সামনে বেরুতে চায় না সহজে। সে জানতো না গিন্নির কাছে তার সম্বন্ধে লাগানোর কথা। কিন্তু আবার কোনদিন বাপের বাড়ীর কথা জিজ্ঞেস করে হয় তো বসবে বৌটি—হয়তো যে আশ্রয়টুকু আছে, তাও যাবে। তার চেয়ে সামনে না যাওয়া নিরাপদ।

কিন্তু শরৎ এড়িয়ে চলতে চাইলেও মিনুর কাকীমা অত সহজে

শরৎকে রেহাই দিতে রাজি নয় দেখা গেল। শরৎকে সে পছন্দও করে না—অথচ পছন্দ না করার মধ্যেই শরৎ সম্বন্ধে ওর কেমন এক ধরণের উগ্র কৌতূহল।

একদিন শরৎকে ডেকে বললে—ও বাম্‌নী—শোনো—

শরৎ কাছে গিয়ে বললে, কি বলচেন?

—তোমার হাতের রান্না বেশ ভালো। কোন্ জেলায় বাপের বাড়ী বললে সেদিন যেন -

শরতের মুখ শুকিয়ে গেল। এই বুঝি আবার—

সে বললে, যশোর জেলা।

—যশোর জেলা। বাঙাল দেশের নিরিমিষ্যি রান্না বাপু তোমাদের ভালোই। তোমার বয়েস কত?

—সাতাশ বছর।

—না, তার চেয়ে বয়েস বেশি। বত্রিশ-তেত্রিশের কম না। তোমাদের হিসেব থাকে না।

শরৎ চুপ করে রইল। এর কোন উত্তর নেই।

—তোমার বিয়ে হয়েছিল কোথায়?

—আমাদের গাঁয়ের কাছেই।

—কতদিন বিধবা হয়েছ?

এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে শরতের মনে বড় কষ্ট হয়। যা ভুলে গিয়েচে, যা চুকেবুকে গিয়েছে কতদিন আগে, সে সব দিনের কথা, সে সব পুরোণো কাসুন্দি—এখন আর ঘেঁটে লাভ কি?

তবুও সে বললে, অনেকদিন আগে। আমার তখন আঠারো বছর বয়েস।

—সেই থেকে বুঝি কল্‌কাতায়—মানে, চাকরী করচ?

—না। দেশেই ছিলাম।

শরৎ খুব সতর্ক ও সাবধান হোল। তার বুক টিপ টিপ করতে লাগলো।

—কলকাতায় কতদিন আগে এসেছিলে?

—বেশিদিন না।

—গাঁ থেকে কার সঙ্গে—মানে কলকাতায় আনলে কে?

শরতের জিব ক্রমশঃ শুকিয়ে আসচে। তার মুখে কথা আর যোগাচ্চে না। কাঁহাতক বানিয়ে বানিয়ে কথা বলবে সে?

—কালীঘাট এসেছিলাম মা—গৌরী-মার কাছে সেই থেকে ছিলাম।

সেদিন মিনু এসে পড়াতে তার কাকীমার জেরা বন্ধ হোল। শরৎ মুক্তি পেয়ে সামনে থেকে সরে গেল।

পরদিন বাসার সকলে মিলে উষ্ণকুণ্ডে স্নান করতে গেল। শরৎ ছেলেমেয়েদের সামলে নিয়ে পেছনে পেছনে চললো। মিনুর মা সেদিন যাননি। মিনুর কাকীমার সঙ্গে যে আয়া এসেছিল, সে যেন এখানে এসে ছুটি পেয়েচে—খাটুনি যত কিছু শরতের ঘাড়ে। কাকীমার দুটি ছেলেমেয়ে যেমন দুষ্ট তেমনি চঞ্চল—তাদের সামলাতে সামলাতে শরৎ হয়রাণ হয়ে পড়ে।

মিনুর কাকীমা বলে, ও বামনী, ওই মিণ্টুকে চার পয়সার গরম জিলিপি কিনে এনে দাও ত বাজার থেকে—

বাজারে সকলের সামনে দোকান থেকে জিনিস কেনা শরতের অভ্যেস নেই। চুপি চুপি মিনুকে বললে, মিনু দিদি, যাবি আমার সঙ্গে?

মিনু সব সময়েই তার দিদিকে সাহায্য করতে রাজি।

বললে, চলো দিদি—

জিলিপি কিনে ফিরে আসতেই মিনুর কাকীমা বললে, চলো কুণ্ডীতে কাপড়গুলো নিয়ে—সাবানের বাক্স নেও। নেয়ে আসি—

মিনু পেছন থেকে এসে সাবানের বাক্স নিজেই নিয়ে চললো।

স্নান শেষ হয়ে গেল। সিক্ত বসনে সবাই উঠে এসে মেয়েদের কাপড় ছাড়বার ঘেরা জায়গার মধ্যে ঢুকলো। শরৎও স্নান করে এল। সে লক্ষ্য করলে, মিনুর কাকীমা ওর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখচে। পশ্চিমের জলহাওয়ার গুণে হয়তো শরতের স্বাস্থ্য আরও কিছু ভাল হয়ে থাকবে, তার গৌর তনুর জলুস আরও খুলে থাকবে, সিক্তবসনা দীর্ঘদেহা সে তরুণীর মূর্ত্তি এমন মহিমময়ী দেখাচ্ছিল—যে রাস্তার কত লোক তার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

মিনু অপলক চোখে চেয়ে চেয়ে ভাবলে—দিদি যে বলে তাদের রাজার বংশ, মিথ্যে নয় কথাটা। ওই তো কাকীমা অত সেজেগুজে এসেচেন, দিদির পাশে দাঁড়াতে পারেন না—

মিনুর কাকীমাও বোধ হয় শরতের অদ্ভুত রূপে কিছু ক্ষণের জন্যে মুগ্ধ না হয়ে পারলে না—কারণ সেও খানিকটা শরতের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলে।

সঙ্গে সঙ্গে তার কেমন এক ধরণের ভাব হোল মনে—সেই পুরাতন মনোভাব, সুন্দরী নারীর প্রতি সাধারণ নারীর ঈর্ষা।

সে ধমকের সুরে বললে, একটু হাত চালিয়ে কাপড়-টাপড়গুলো কেচেটেচে‍ন্দাও না বাপু, তোমার সব কাজেই ন্যাড়া ব্যাড়া—

যেন শরৎকে খাটো করে, অপমান করে ওর নিজের মর্য্যাদা ও আভিজাত্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করলে।

ফিরবার পথে মিনুর কাকীমা বললে, তুমি একটু আগে হেঁটে যাও বাপু, আমরা আস্তে আস্তে যাচ্ছি—তোমাকে আবার গিয়ে দিদির গরম জল চড়াতে হবে—কাপড়গুলো নিয়ে গিয়ে রোদে দাও গে—

বড় এক বোঝা ভিজে কাপড় শরতের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কাকীমা মিনুকে ও নিজের ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে পিছিয়ে পড়লো। মিনু বললে, দিদিকে আজ চমৎকার দেখাচ্ছিল নেয়ে উঠে, না কাকীমা?

কেন মিনু হঠাৎ একথা বললে? মিনুর কাকীমাও বোধ হয় ওই ধরণের কোনো কথাই ভাবছিল। হঠাৎ যেন চমকে উঠে মিনুর দিকে চেয়ে রইল অল্প একটু সময়ের জন্যে। পরক্ষণেই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, পরের ঘি-দুধ খেলেই অমন সবারই হয় বাপু—তুই চল নে—

বিকেলে আবার বৌটি ডাকলে শরৎকে। বৌ নিজে ষ্টোভ ধরিয়ে চা করে এক পেয়ালা মুখে তুলে চুমুক দিচ্চে, আর একটা ধূমায়মান পেয়ালা সামনে বসান মেঝের ওপর। শরৎকে বললে, ও বামনী, দিদিকে চাটা দিয়ে এসো তো?

তার পরের কথাতে শরৎ বড় চমৎকৃত হয়ে গেল কিন্তু।

বৌটি বললে, তোমার জন্যে এক পেয়ালা আছে, ওটা দিদিকে দিয়ে এসো—এসে তুমি খাও—

শরৎ অগত্যা ফিরে এসে কলাইকরা পেয়ালাটা তুলে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে যাচ্চে, বৌটি বললে, এখানে বসে খাও না গো। তাড়াতাড়ি কি আছে?

শরৎ বসে চা খেতে লাগলো কিন্তু কোন কথা বললে না।

মিনুর কাকীমা আবার বললে, তোমাকে একটা কথা বলবো ভাবচি। দিদির কাছ থেকে তোমায় যদি আমি নিয়ে যাই, তুমি মাইনে নেবে কত?

শরৎ আরও অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে—আমাকে?

—হ্যাঁ গো—তোমাকে। বল না মাইনে কত নেবে?

—গিন্নীমা যেতে দেবেন না আমায়।

মিনুর কাকীমা মুখ নেড়ে বললে, সে ভাবনা তোমার না আমার। আমি যদি বলে কয়ে নিতে পারি। মানে আর কিছু না, যেখানে থাকি খোট্টা বামুনে রাঁধে, বাঙালীর মুখে সে রান্না একেবারে অখাদ্য। আমার নিজের ওসব অভ্যেস নেই—হাঁড়ি হেঁসেল কখনো করিনি, বাপের

বাড়ীতেও না, শ্বশুর বাড়ীতে এসে তো নয়ই। তোমাদের বাঙাল দেশের রান্না ভাল—তাই বলছিলাম—বুঝলে ?

শরতের মুখ চুণ হয়ে গেল।

এমন একটা আশ্রয় পেয়ে সে যে কোথাও যেতে রাজি নয়, এদের ছেড়ে, মিনুকে ছেড়ে। কিন্তু সে এখনও পরের দয়ার পাত্রী, তার কোন ইচ্ছে বা দয়া এসব স্থলে খাটবে না, সে ভালই বোঝে।

সে চুপ করে রইল।

মিনুর কাকীমা ভুল বুঝে বললে, আচ্ছা তাই তবে ঠিক রইল। মাইনের কথা একটা কিন্তু ঠিক করে ফেল। ভালো—তা বলচি। তখন যে বলবে—

শরৎ মিনুকে নিরিবিলি পেয়ে বললে, মিনু বেড়াতে যাবি ?

—চলো দিদি—কোন্ দিকে যাবে ?

—সোন ভাণ্ডারের গুহার দিকে চল—

সরস্বতী নদীর ধারে ধারে বনাবৃত পথ গৃধ্রকূট শৈলের ছায়ায় ছায়ায় সোন ভাণ্ডার ছাড়িয়ে রাজগীরের প্রাচীনতর অঞ্চল জরাসন্ধের মল্লভূমির দিকে বিস্তৃত। ওরা সেই পথে চললো। কত পাথরের নুড়ি পড়ে আছে পাহাড়ের তলায়, নদীর পাড়ে। সমতলবাসিনী শরৎ এখনও এই সব রং চংয়ের নুড়ির মোহ কাটিয়ে ওঠেনি, দেখতে পেলেই কুড়িয়ে আঁচলে সঞ্চয় করে।

মিনু বললে, তুমি একটা পাগল দিদি। কি হবে ও সব ?

—বেশ না এগুলো ? ছাখ এটা কেমন—

—কি করবে ?

—ইচ্ছে কি করে জানিস্। এ সব দিয়ে ঘর সাজাই—কিন্তু ঘর কোথায় ?

—জড়ো করেচ তো একরাশ। তাতেই সাজিও—

—জানিস মিনু, তোর কাকীমা কি বলেচে ?

—কি দিদি ?

—আমায় নিয়ে যেতে চায় ওদের বাড়ী।

—তোমার যাওয়া হবে না, আমি মাকে টিপে দেবো !

—আমি তোদের ফেলে কোথাও যেতে চাইনি মিনু। যখন আশ্রয় পেয়েচি যতদিন বাঁচি এখানেই থাকব।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শরতকে যেতেই হল মিনুর কাকীমার সঙ্গে। মিনুর মা বললেন—যাও মা, ওরা কাশীতে যাচ্চে এখন, তোমার তীর্থ করা হবে এখন। আমি এর পরে তোমায় কাছে নিয়ে আসবো।

মিনুর কাকীমা সগর্ব্বে অন্যান্য বোঁচকা, ট্রাঙ্ক, আয়া ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে শরৎকেও নিয়ে গিয়ে কাশী নামলো দিন দশেক পরে। মাঝারি-গোছের তেতলা বাড়ী, ছোট্ট সংসার, স্বামী-স্ত্রী আর এক দেওর। দেওর লাহোর মেডিকেল ইস্কুলে পড়ে, এবার পাশ দেবে। নিচে একঘর গরীব লোক থাকে ওদের ভাড়াটে।

শরৎ মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি, কিন্তু নতুন জায়গায় এসে তার এত খারাপ লাগছিল। একটা কথা বলবার লোকও নেই। মিনুর কাকীমা চাকর বাকরকে আমল দেয় না, ছেলেমেয়েদেরও তার ভাল লাগে না। যেমন দুষ্ট, তেমনি একগুঁয়ে এগুলো। যা ধরবে তাই।

একদিন মিনুর কাকীমা বললে—ও বামনি, এই ডালটুকু ওই নিচের তালার পটলের মাকে দিয়ে এসো—চেয়েছিল আমার কাছে, গরীব লোক—

শরৎ ডাল দিতে গিয়ে দেখলে একটি বৌ রান্নাঘরে বসে ওর দিকে পিছন ফিরে রান্না করচে। ওর কথায় বৌটি ওর দিকে ফিরতেই শরৎ বললে, উনি ডাল পাঠিয়ে দিয়েচেন—রাখুন—

তারপরেই বৌয়ের চোখ দুটোর দিকে চেয়ে শরতের মনে কেমন খটকা লাগলে।

বৌটি হেসে বললে, তোমার গলা নতুন শুনচি। তুমি বুঝি ওদের ওখানে নতুন ভর্ত্তি হয়েচ? বলছিলেন কাল দিদি। বস ভাই। আমি চোখে দেখতে পাইনে—বাটিটা রাখ এই সিঁড়ির কাছে।

ও-তাই অমন চোখের চাউনি।

শরতের বুকের মধ্যে যেন কোথায় ধাক্কা লাগলো।

বৌটি আবার বললে, তোমার নাম কি ভাই? তোমার গলা শুনে মনে হচ্ছে বয়েস বেশি নয়।

—আমার নাম শরৎ। বয়েসে আপনার চেয়ে বেশি হবে বোধ হয়—

—না ভাই আমার বয়েস কম নয়। তা আমাকে তুমি আপনি আজ্ঞে কোরো না। আমি একা থাকি এই ঘরে—উনি ত বাইরের কাজেই ঘোরেন। তুমি এসো, দুজনে গল্প করব।

—বেশ ভাই। তা হলে ত বেঁচে যাই—

শরতের মনের মধ্যে কাশী আসবার কথা শুনে একটু আগ্রহ না হয়েছিল এমন নয়। মিনুর মার কাছে এজন্যে সে না আসার বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ করে নি। কাশী গয়া ক'জন বেড়াতে পারে? তাদের গাঁয়ের নীলমণি চাটুয্যের মা শরতের ছেলেবেলায় কাশীতে এসে তীর্থ করে যান—সে গল্প বুড়ীর এখনো ফুরালো না। আর বছরও সে গল্প বুড়ীর মুখে শরৎ শুনেচে। সেই কাশীতে যদি এমনি যাওয়া হয়—হোক!

কাশী এসে কিন্তু মিনুর কাকীমার ফরমাস আর হুকুমের চোটে এতটুকু সময় পায়না শরৎ। সকালে উঠে হেসেলের কাজ সুরু। একদফা ছোটদের দুধ বার্লি, একদফা বড়দের চা খাবার, বাজলো বেলা আটটা। তারপরে রান্নার পালা সুরু হোল এবং খাওয়ানো-দাওয়ানোর কাজ

মিটতে বেলা দেড়টা। ওবেলা তিনটে থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে আবার চা খাবারের পালা। সন্ধ্যার সময় বাবুর বন্ধুরা বৈঠকখানায় এসে বসে, রাত নটা পর্য্যন্ত বিশ পেয়ালা চা-ই হবে।

দুপুরবেলার কাজকর্ম্ম চুকিয়ে ফাঁক পেলে শরৎ এসে বসে একতলায় অন্ধ বৌটির কাছে। শরৎ তার পরিচয় নিয়েচে—নাম ওর রেণুকা, ওর বাবা কাশীতেই স্কুল মাষ্টারি করতেন। মা নেই, ভাই নেই, আজ কয়েক বছর আগে ওর বিয়ে দিয়েই বাবা মারা যান। ওরা ব্রাহ্মণ, স্বামী সামান্য মাইনাতে কি একটা চাকরী করে। সন্ধ্যার সময় ভিন্ন বাড়ী আসতে পারে না—সারাদিন রেণুকাকে একা বাসাতে থাকতে হয়।

শরৎ বলে, তুমি বাংলা দেশে যাওনি কখনো?

—না ভাই, এখানেই জন্ম, বিশ্বনাথের চরণ ছেড়ে আর কোথাও যাবার ইচ্ছে নেই।

—দেশ ছিল কোথায় বাবার মুখে শোনো নি?

—হালিসহর বলদেঘাটা। এখনো আমার কাকারা সেখানে আছেন শুনেচি।

দুজনে বসে সুখদুঃখের কথা বলে। রেণুকার অনেক কাজ শরৎ করে দেয়। বড় ভাল লাগে এই অন্ধ মেয়েটিকে। মন বড় সরল, অল্পেই সন্তুষ্ট, জীবন ওকে বেশি কিছু দেন নি, যা দিয়েচে তাই নিয়েই খুসী আছে।

রেণুকা বলে, একদিন আমার বাড়ী কিছু খাও ভাই—

—বেশ আমি কি খাবো না বলচি?

—রান্না তো খেতে পারবে না। নিরিমিষের হাঁড়ি নেই—সব একাকার। রান্না করে খাবে আলাদা?

—না ভাই, সে হাঙ্গামাতে দরকার নেই—তুমি ফল খাইও বরং—

রেণুকার স্বামী ছানা, ফলমূল মিষ্টি কিনে রেখে গিয়েছিল। একদিন

বিকেলে রেকাবি সাজিয়ে রেণুকা ওকে খেতে দিলে। চোখে দেখতে পায় না বটে—কিন্তু কাজকর্ম্ম সবই করে হাতড়ে হাতড়ে।

শরৎ একদিন মিনুর কাকীমাকে বলে কয়ে বিশ্বনাথ দর্শনের ছুটি নিলে। ওদের আয়া সঙ্গে গেল মন্দিরের পথ দেখানোর জন্যে। শরৎ রেণুকাকে হাতে ধরে নিয়ে গেল।

বিশ্বনাথের গলির মধ্যে কি লোকের ভিড়। কত বৌঝি, কত লোকজন। শরৎ অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখলে, তার সব কিছু নতুন, সবই আশ্চর্য্য। মন্দির থেকে বার হয়ে দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে বসলো বিকেল বেলা। নিত্য উৎসব যেন লেগেই আছে সেখানে। নৌকো আর বজরাতে কত লোক সাজগোজ করে বেড়াতে বেরিয়েচে।

রেণুকা বললে, আমি এসব জায়গা দেখেচি ছেলেবেলায়। চৌদ্দ বছর বয়েস থেকে অসুখে চোখ হারিয়েচি। এখনো সেইরকম আছে, কাণে শুনে বুঝতে পারি।

—ভারি ভাল জায়গা ভাই। কলকাতা সহর দেখে ভাল লেগেছিল বটে—কিন্তু সেখানে শান্তি পাই নি এমন। এখানে মন জুড়িয়ে গেল।

—একদিন গঙ্গায় নাইতে এসো—

—সময় পাই নে, আসি কখন। কাল একবার বলবো—

শরৎ আর রেণুকা একটু তফাৎ হয়ে বসে। চারিদিকের জন কোলাহল ও সম্মুখে পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর দিকে চেয়ে শরতের নতুন চোখ ফোটে। সত্যিই সে বড় শান্তি পেয়েচে মনে।

আয়া বললে, একদিন তোমাকে কেদার ঘাটে নিয়ে যাবে—

শরৎ চমকে উঠে বললে, কি ঘাট?

—কেদার ঘাট। ওই দিকে—আমার সঙ্গে যেও—

শরতের মন স্বপ্নঘোরে একমুহূর্ত্তে কোন্ পথে চলে গেল পাহাড় পর্ব্বত

বন বনানীর ব্যবধান ঘুচিয়ে। গরীব বাবা কত কষ্টে চাল যোগাড় করে, নুণ তেল যোগাড় করে এনে বলতেন ভাল করে রাঁধো, বাবা যে ছেলে-মানুষের মত, ঘরে কিছু নেই, তা বুঝবেন না—ভাল খাওয়াটি হওয়া চাই —নইলে অবুঝের মত রাগ করবেন, অভিমান করবেন। এতটুকু কষ্ট সহ্য করতে পারেন না বাবা। কোথায় গেলেন বাবা! জানবার জন্যে বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে, তিনি এখন কোথায় কি ভাবে আছেন। এমন জায়গা কাশী, সেই কতকাল আগের গল্প শোনা বিশ্বনাথের মন্দির, দশাশ্বমেধ ঘাট সব দেখা হোল—কিন্তু মনের মধ্যে সব সময় একথা আসে কেন, বাবা যে এসব কিছু দেখলেন না, বাবা বুড়ো হয়েচেন, তাঁর এখন তীর্থধর্ম্ম করবার সময়, অথচ বাবার অদৃষ্টে জুটলো না কিছু। তিনি গোয়ালাপাড়া বাগদিপাড়ায় বেহালা বাজিয়ে, গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন, ফিরে এসে অবেলায় হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাচ্চেন কিংবা তাও খাচ্চেন না, কে তাঁকে দেখচে, কে মুখের দিকে চাইবার আছে তাঁর?

কাশী গয়া সব তুচ্ছ—কিছু ভাল লাগে না।

শরৎ বলে, আচ্ছা, রেণুকা কাশীতে দুজন লোকের কত হোলে চলে?

রেণুকা ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে, তা পঁচিশ টাকার কম তো কোনো মাস যেতে দেখলাম না। আমরা তো দুটো মানুষ থাকি। কেন ভাই?

শরৎ কি ভেবে কি কথা বলেচে সে নিজেই জানে না। রেণুকা ভাবে, শরৎ হঠাৎ কি রকম অন্যমনস্ক হয়ে গেল, না কি—আর ভাল করে কথা বলচে না কেন?

বাড়ী ফিরে মিনুর কাকীমার কড়া ফাইফরমাজ ও হুকুমের মধ্যে রান্নাঘরে রাঁধতে বসে সে ভাবে তার কোন জীবনটা সত্যি, গড়শিব-পুরের ভাঙা গড়বাড়ীর বনের সেই জীবন, না পরের বাড়ীর হাঁড়ি-হেঁসেলের এ জীবন?

নয়

মিন্নুর কাকীমা শরৎকে প্রায়ই বেরুতে দেন না। আজ তিনি যাবেন মিছরীপোখরায় তাঁর বন্ধুর বাড়ী, শরৎকে বাড়ী আগলে বসে থাকতে হবে, কাল তিনি লফ্‌সাতে মাসিমার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন, শরৎ ছেলেমেয়ে সামলে বাড়ী বসে থাকবে।

একদিন মিন্নুর কাকীমা বললে, পটলের বউয়ের ওখানে অত ঘন ঘন যাও কেন?

—কেন?

—আমি পছন্দ করিনে। ওরা গরীব লোক, আমাদের ভাড়াটে, অত মাথামাখি করা ভাল না।

—আমি মিশি, আমিও তো গরীব লোক। এতে আর দোষ কি বলুন?

—তুমি বড় মুখে মুখে তর্ক করতে সুরু করেচ দেখচি। পটলের বউ মেয়ে ভাল নয়—তুমি জানো কিছু?

শরৎ এতদিন মিন্নুর কাকীমার কোনো কথার প্রতিবাদ না ক'রে নীরবে সব কাজ করে এসেচে, কিন্তু অন্ধ রেণুকার নামে কথা সে সহ্য করতে পারলে না। বললে—আমি যতদূর দেখেচি কোনো বেচাল তো দেখিনি। আমি যদি যাই, আপনাকে তাতে কেউ কিছু বলবে না তো?

—না, আমি চাই আমার বাড়ীর চাকরবাকর আমার কথা শুনবে—যাও, রান্না ঘরের দিকে দেখো গে—

শরৎ মাথা নামিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। সেখানে গিয়েই সে ক্ষুন্ন

অভিমানে কেঁদে ফেললে। আজ সে একথার জবাব দিতো মিনুর কাকীমার, একবার ভেবেছিল দিয়েই দেবে উত্তর, যা থাকে ভাগ্যে।

তার মুখে জবাব না দিলেও কাজে সে দেখালে মিনুর কাকীমার অসঙ্গত হুকুম সে মানতে রাজি নয়। রেণুকার বাড়ী সেই দিনই বিকালের দিকে সে আবার গেল।

রেণুকা ওকে পেয়ে সত্যিই বড় খুসী হয়। বললে—ভাই, আজ চল আমরা নতুন কোনো জায়গা যাই—

—কোথায় যাবে ?

—আমি রাস্তাঘাট চিনি নে, তুমি বাঙালীটোলায় আমার এক বন্ধুর বাড়ী নিয়ে যেতে পারবে ?

—কেন পারবো না চলো।

ছ' নম্বর ধ্রুবেশ্বরের গলি—জিগ্যেস করে চলো যাওয়া যাক।

একে ওকে জিজ্ঞেস্ করে ওরা ধ্রুবেশ্বরের গলিতে নির্দ্দিষ্ট বাসায় পৌছলো। তারাও খুব বড় লোক নয়, ছোট দু'টি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে স্বামী-স্ত্রী, চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে। বাড়ী অনেক দিন আগে ছিল ঢাকা জেলায় কি এক পাড়াগাঁয়ে, বাড়ীর কর্ত্তা বেনারস মিউনিসিপ্যালিটির কেরাণী, সেই উপলক্ষে এখানে বাস।

বাড়ীর গিন্নীর বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। তিনি ওদের যত্ন করে বসালেন, চা করে খেতে দিলেন।

তাদের বাড়ীতে একটি চার-পাঁচ বছরের খোকা আছে, নাম কালো। দেখতে কি চমৎকার, যেমন গায়ের রং, তেমনি মুখশ্রী, সোনালি চুল, চাঁচাছোলা গড়ন।

শরৎ বললে, এমন সুন্দর ছেলের নাম কালো রাখলেন কেন ?

গিন্নী হেসে বললেন, আমার শ্বশুরের দেওয়া নাম। তাঁর প্রথম ছেলে

মারা যায়, নাম ছিল ওই। তিনিই জোর করে কালো নাম রেখেচেন।

প্রথম দর্শনেই খোকাকে শরৎ ভালবেসে ফেললে।

বললে, এসো, খোকা আসবে?

খোকা অমনি বিনা দ্বিধায় শরতের কাছে এসে বসলো।

শরৎ বললে, আমি কে হই বলো তো খোকন?

খোকা হেসে শরতের মুখের দিকে চোখ তুলে চুপ ক'রে রইল।

খোকার মা বললেন, মাসীমা হন, মাসীমা বলে ডাকবে—

খোকা বললে, ও মাসীমা—

—এই যে বাবা, উঠে এসে কোলে বোসো—

খোকার মা বললেন, সেই ছড়াটা শুনিয়ে দাও তো তোমার মাসীমাকে খোকন?

খোকা অমনি দাঁড়িয়ে উঠে বলতে আরম্ভ করলে—

এই যে গঙ্গা পুণ্য ঢারা
বিমল মুরটি পাগলপারা
বিশ্বনাটের চরণটলে বইচে কুটুহলে—

খোকা 'ত' এর জায়গায় 'ট' বলে, 'ধ' এর জায়গায় 'ঢ' বলে—শরতের মনে হোল খোকার মুখে অমৃত বর্ষণ হচ্চে যেন। অভাগিনী শরৎ সন্তান-স্নেহ কখনো জানে নি, কিন্তু এই খোকাকে দেখে তার সুপ্ত মাতৃহৃদয় যেন হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠলো। কত ছেলে তো দেখলে এ পর্য্যন্ত, খুড়ীমা কাকীমারই তো এ বয়সের ছেলে রয়েচে, তাদের প্রতি স্নেহ তো দূরের কথা—শরৎ নিতান্তই বিরক্ত। এ ছেলেটির ওপর এমন ভাবের কারণ কি সে খুঁজে পায় না। কিন্তু মনে হোল এ খোকা তার কত দিনের আপনার, একে দেখে, একে কোলে ক'রে বসে ওর নারীজীবন যেন সার্থক হোল।

শরৎ সেদিন সেখান থেকে চলে এল বটে, কিন্তু মন রেখে এল খোকার কাছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তার মন হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

গড়বাড়ীর জঙ্গলে তাদের পুরানো কোঠা।

বাবা বাড়ী নেই।

—ও খোকন, ও কালো—

—কি মা?

—বেড়িও না এই রদ্দুরে হটর হটর ক'রে—ঘরে শোবে এসো—

খিল খিল করে দুষ্টুমির হাসি হেসে খোকা ছুটে পালায়!

হাঁড়ি-হেঁসেলের অবসরে নতুন আলাপী খোকনকে ঘিরে তার মাতৃহৃদয়ের সে কত অলস স্বপ্ন। যে সাধ আশা কোনোকালে পূর্ণ হবার নয়, ইহ জীবনে নয়, মন তাকেই হঠাৎ যেন সবলে আঁকড়ে ধরে।

দিন দুচ পরে সে রেণুকাকে বলে—চল ভাই কালোকে দেখে আসি গে—

কিন্তু সেদিন রেণুকার যাবার সময় হয় না। স্বামী দুজন বন্ধুকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেচেন, রান্নাবান্নার হাঙ্গামা আছে।

আরও দিন কয়েক পরে আবার শরতের অবসর মিললো—এবার রেণুকাকে বলে করে নিয়ে গেল ব্রুবেশ্বরের গলি। দূর থেকে বাড়ীটা দেখে ওর বুকের মধ্যে যেন সমুদ্রের ঢেউ উথলে উঠলো—বড় বড় পর্বত প্রমাণ ঢেউ যেন উদ্দাম গতিতে দূর থেকে ছুটে এসে কঠিন পাষাণময় বেলাভূমির গায়ে আছড়ে পড়ছে।

খোকা দেখতে পেয়েচে, সে তাদের বাড়ীর দোরে খেলা করছিল। সঙ্গে আরও পাড়ার কয়েকটি খোকাখুকি।

শরতের বুক ঢিপ ঢিপ করে উঠলো—খোকা যদি ওকে না চিনতে পারে।

কিন্তু খোকা তাকে দেখেই খেলা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দুধে দাঁত বার করে একগাল হেসে ফেললে।

শরতের অদৃষ্টাকাশের কোন্ সূর্য্য যেন রাশিচক্রের মধ্যে দিয়ে পিছু হঠতে হঠতে মীনরাশিতে প্রবিষ্ট হোলেন, যার অধিপতি সর্ব্বপ্রকার স্নেহপ্রেমের দেবতা শুক্র।

—চিন্‌তে পারিস্ খোকা? আয়—

শরৎ হাত বাড়িয়ে দিলে ওকে কোলে নেবার জন্যে। খোকা বিনা দ্বিধায় ওর কোলে এসে উঠলো, বললে—মাছিমা—

—তাহোলে তুই দেখচি ভুলিসনি খোকা—

খোকার মা ছুটে এসে বললেন, যাক এসেচ ভাই? ও কেবল মাসীমা মাসীমা করে, একদিন ভেবেছিলাম রেণুকাদের বাড়ী নিয়েই যাই—দাঁড়াও ভাই, পাশের বক্সীদের বাড়ীর বড়বউ তোমাকে দেখতে চেয়েচে, ডেকে আনি—

বক্সীদের বাড়ীর দুই বউ একটু পরে হাজির। দুজনেই বেশ সুন্দরী, গায়ে গহনাও মন্দ নেই দুজনের। বড় বউ প্রণাম করে বললে—ভাই, আপনার কথা সেদিন দিদি বলছিলেন, তাই দেখতে এলুম—

—আমার কথা কি বলবার আছে বলুন?

—দেখে মনে হচ্চে, বলবার সত্যিই আছে। যা নয় তা কখনো রটে ভাই? রটেচে যখন আপনার নামে—

শরতের মুখ শুকিয়ে গেল। কি রটেচে তার নামে? এ... কি কেউ গিরিন প্রভাসের কথা জানে নাকি? সে বললে—আমার নামে কি শুনেছেন?

বড় বউ হেসে বললে, না, তা আর বলবো না।

শরতের আরও ভয় হোল। বললে—বলুনই না?

—আপনার চেহারার বড় প্রশংসা করেছিলেন দিদি? আমার

বললেন, ভাই রেণুকাদের ভাড়াটেদের বাড়ীতে তিনি এসেচেন রান্না করতে, কিন্তু অনেক বড় ঘরে অমন রূপ নেই। সে যে সামান্য বংশের মেয়ে নয়, তা দেখলে আর বুঝতে বাকি থাকে না। তাই তো ছুটে এলাম, বলি দেখে আসি তো—

শরৎ বড় লজ্জা পায় রূপের প্রশংসা শুনলে। এ পর্য্যন্ত তা সে অনেক শুনেচে—রূপের প্রশংসাই তার কাল হয়ে দাঁড়ালো জীবনে, আজ এই দশা কেন হবে নইলে? কিন্তু সে সব কথা বলা যায় না কারো কাছে, সুতরাং সে চুপ করেই রইল।

কালোর মা বললেন, খোকা তো মাসীমা বলতে অজ্ঞান। তবু একদিনের দেখা। কি গুণ তোমার মধ্যে আছে ভাই তুমিই জানো—

বক্সীদের বড়বৌ বললে, একটু আমাদের বাড়ী পায়ের ধূলো দিতে হবে ভাই—

—এখন কি করে যাবো বলুন, ছুটি যে ফুরিয়ে এলো—

—তা শুনবো না, নিয়ে যাবো বলেই এসেচি—দিদিও চলুন, রেণুকা ভাই তুমিও এসো—

খোকাকে কোলে নিয়ে শরৎ ওদের বাড়ী চললো সকলের সঙ্গে।

বড়বৌ বললে, ভাই তোমার কোলে কালোকে মানিয়েছে বড় চমৎকার। ও যেমন সুন্দর, তুমিও তেমন। মা আর ছেলে দেখতে মানানসই একেই বলে—

ওদের বাড়ী যে জলযোগের জন্যেই নিয়ে যাওয়া একথা সবাই বুঝেছিল। হোলও তাই, শরতের জন্যে ফলমূল ও সন্দেশ—বাকি দুজনের জন্যে সিঙ্গাড়া কচুরির আমদানিও ছিল। বৌ দুটির অমায়িক ব্যবহারে শরৎ মুগ্ধ হয়ে গেল। খানিকক্ষণ বসে গল্পগুজবের পর শরৎ বিদায় চাইলে।

বড়বৌ বললে, আবার কিন্তু আসবেন ভাই, এখন যখন খোকার

মাসীমা হয়ে গেলেন, তখন খোকাকে দেখতে আসতেই হবে মাঝে মাঝে—

—নিশ্চয়ই আসবো ভাই—

খোকা কিন্তু অত সহজে তার মাসীমাকে যেতে দিতে রাজি হোল না। সে শরতের আঁচল ধরে টেনে বসে রইল, বললে—এখন টুমি যেও না মাছিমা—

—যেতে দিবি নে?

—না।

—আবার কাল আসবো। তোর জন্যে একটা ঘোড়া আনবো—

—না, টুমি যেও না।

শরৎ মুগ্ধ হয় শিশু কত সহজে তাকে আপন ব'লে গ্রহণ করেচে তাই দেখে। যেন ওর কতদিনের জোর, কতদিনের ন্যায্য অধিকার। সব শিশু যে এমন হয় না, তা শরতের জানতে বাকি নেই।

খোকা ওর ছোট্ট মুঠি দিয়ে শরতের আঁচলে কয়েক পাক জড়িয়েছে। সে পাক খুলবার সাধ্যি নেই শরতের, জোর করে তা সে খুলতে পারবে না, চাকুরী থাকে চাই যায়। শরতের হৃদয়ে অসীম শক্তি এসেচে কোথা থেকে, সে ত্রিভুবনকে যেন তুচ্ছ করতে পারে এই নবার্জ্জিত শক্তির বলে, জীবনের নতুন অর্থ যেন তার চোখের সামনে খুলে গিয়েচে। যখন অবশেষে সে বাড়ী চলে এল, তখন সন্ধ্যার বেশি দেরি নেই। মিন্টুর কাকীমা মুখ ভার করে বললেন, রোজ রোজ তোমার বেড়াতে যাওয়া আর এই রাত্তিরে ফেরা। উনুনে আঁচ পড়লো না এখনও, ছেলেমেয়েদের আজ আর খাওয়া হবে না দেখচি। আটটার মধ্যেই ওরা ঘুমিয়ে পড়বে—

—কিছু হবে না, আমি ওদের খাইয়ে দিলেই তো হোল—

—তোমার কেবল মুখে মুখে জবাব। এ বাড়ীতে তোমার সুবিধে

দেখে কাজ হবে, না, আমার সুবিধে দেখে কাজ হবে তা বলে দিচ্চি। কাল থেকে কোথাও বেরুতে পারবে না।

মুখোমুখি তর্ক করা শরতের অভ্যেস নেই! সে এমন একটি অদ্ভুত ধরণের নির্বিকার, স্বাধীন ভঙ্গিতে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল, একটা কথাও না বলে—যাতে মিনুর কাকীমা নিজে যেন হঠাৎ ছোট হয়ে গেল এই অদ্ভুত মেয়েটির ধীর, গম্ভীর, দর্পিত ব্যক্তিত্বের নিকট।

মিনুর কাকীমা কিন্তু দমবার মেয়ে নয়, শরতের সঙ্গে রান্নাঘর পর্য্যন্ত গিয়ে ঝাঁজালো এবং অপমানজনক সুরে বললে, কথার উত্তর দিলে না যে বড়? আমার কথা কানে যায় না নাকি?

শরৎ রান্নাঘরের কাজ করতে করতে শান্তভাবে বললে, শুনলাম তো যা বললেন—

—শুনলে তো বুঝলাম। সেই রকম কাজ করতে হবে—আর একটা কথা বলি। তোমার বেয়াদবি এখানে চলবে না জেনে রেখো। আমি কথা বললাম আর তুমি এমনি নাক ঘুরিয়ে চলে গেলে, ও-সব মেজাজ দেখিও অন্য জায়গায়। এখানে থাকতে হোলে—ও কি, কোথায় চললে?

—আসচি পাথরের বাটিটা নিয়ে আসি ওঘর থেকে—

মিনুর কাকীমার মুখে কে যেন এক চড় বসিয়ে দিলে। সে অবাক্ হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। এ কি অদ্ভুত মেয়ে, কথা বলে না, প্রতিবাদ করে না, রাগঝালও দেখায় না—অথচ কেমন শান্ত, নির্বিকার, আত্মস্থ ভাবে তুচ্ছ ক'রে দিতে পারে মানুষকে। মিনুর কাকীমা জীবনে কখনো এমন অপমানিতা বোধ করেনি নিজেকে।

শরৎ ফিরে এলে তাই সে ঝাল ঝাড়বার জন্যে বললে, কাল থেকে দুপুরের পর বসে বসে ডালগুলো বেছে হাঁড়িতে তুলবে। কোথাও বেরুবে না।

মিনুর কাকা তাঁর স্ত্রীর চীৎকার শুনে ডেকে বললেন, আঃ, কি দুবেলা চেঁচামেচি করো রাঁধুনীর সঙ্গে? অমন করলে বাড়ীতে চাকরবাকর টিকতে পারে?

—কেন গো, রাঁধুনীর ওপর যে বড্ড দরদ দেখতে পাই—

—আঃ কি সব বাজে কথা বল। শুনতেপাবে—

—শুনতে পেলে তো পেলে—তাতে ওর মান যাবে না। ওরা কি ধরণের মানুষ তা জানতে বাকি নেই—আজ এসেছে এখানে সাধু সেজে তীর্থ করতে।—

—লোককে অপ্রিয় কথাগুলো তুমি বড্ড কট কট করে বলো। ও ভাল না—

মিনুর কাকীমা ঝাঁজের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, আমায় তোমার পাদ্রী সাহেবের মত ধর্ম্মজ্ঞান শিখিয়ে দিতে হবে না—থাক্—

মিনুর কাকাটিকে শরৎ দূর থেকে দেখেচে। সামনে এ পর্য্যন্ত একদিনও বার হয় নি। লোকটি বেশ নাদুস্-নুদুস চেহারার লোক, মাথায় ঈষৎ টাক দেখা দিয়েচে, সাহেবের মত পোষাক পরে আপিসে বেরিয়ে যায়, বাড়ীতে কখনো চেঁচামেচি হাঁকডাক করে না, চাকরবাকরদের বলাবলি করতে শুনেচে যে লোকটা মদ খায়। মাতালকে শরৎ বড় ভয় করে, কাজেই ইচ্ছে করেই কখনো সে লোকটির ত্রিসীমানায় ঘেঁসে না।

সেদিন আবার তার মন উতলা হয়ে উঠলো খোকাকে দেখবার জন্যে। খোকাকে একটা ঘোড়া দেবে বলে এসেছিল, হাতে পয়সা নেই, এদের কাছে মুখ ফুটে চাইতে সে পারবে না, অথচ কি করা যায়?

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত খোকাকে খেলনা দেবার টানই বড় হোল। সে মিনুর কাকীমাকে বললে—আমায় কিছু পয়সা দেবেন আজ?

মিনুর কাকীমা একটু আশ্চর্য্য হোল। শরৎ এ পর্য্যন্ত কখনো কিছু চায় নি।

বললে—কত?

—এই—পাঁচ আনা—

মিনুর কাকীমা মনে মনে হিসেব করে দেখলে শরৎ পাঁচ মাস হোল এখানে রাঁধুনীর কাজ করচে, এ পর্য্যন্ত তাকে মাইনে বলে কিছু দেওয়া হয় নি, সেও চায় নি। আজ এতদিন পরে মোটে পাঁচ আনা চাওয়াতে সে সত্যিই আশ্চর্য্য হোল।

আঁচল থেকে চাবি নিয়ে বাক্স খুলে বললে, ভাঙানো তো নেই দেখছি, টাকা রয়েচে। ও বেলা নিও—

শরৎ ঠিক করেছিল আজ দুপুরের পরে কাজকর্ম্ম সেরে সে খোকার কাছে যাবে। মুখ ফুটে সে বললে, টাকা ভাঙিয়ে আনলে হয় না? আমার বিকেলে দরকার ছিল।

—কি দরকার?

—ও আছে একটা দরকার—

—বলোই না—

—একজনের জন্যে একটা জিনিস কিনবো।

—কে?

শরৎ ইতস্ততঃ করে বললে, রেণুকা জানে—পটলের বউ—

মিনুর কাকীমা মুখ টিপে হেসে বললে, আপত্তি থাকে বলবার দরকার নেই, থাকগে। নিও এখন—

শরৎ রেণুকাকে নিয়ে বিশ্বনাথের গলির দুধারের দোকানে ঘোড়া কিনতে গেল। এক জায়গায় লোকের ভিড় ও কান্নার শব্দ শুনে ও

রেণুকাকে দাঁড় করিয়ে রেখে দেখতে গেল। একটি আঠারো-উনিশ বছরের বাঙালীর মেয়ে হাউ হাউ করে কাঁদচে, আর তাকে ঘিরে কতকগুলো হিন্দুস্থানী মেয়েপুরুষ খেপাচ্চে ও হাসাহাসি করচে।

মেয়েটি বলচে, আমার গামছা ফেরৎ দে—ও মুখপোড়া, যম তোমাদের নেয় না, মণিকর্ণিকা ভুলে আছে তোদের? শালারা, পাজি ছুঁচোরা—গামছা দে—

শরৎকে দেখে ভিড় সসম্ভ্রমে একটু ফাঁক হয়ে গেল। কে একজন হেসে বললে, পাগলী, মাইজি—আপলোক হঠ্ যাইয়ে—

মেয়েটি বললে, তোর বাবা মা গিয়ে পাগল হোক্ হারামজাদারা—মণিকর্ণিকায় নিয়ে যা ঠ্যাংএ দড়ি বেঁধে, পুড়ুতে কাঠ না জুটুক—দে আমার গামছা—দে—

যে ওকে পাগলী বলেছিল সে তার পুণ্যশ্লোক পিতামাতার উদ্দেশে গালাগালি সহ্য করতে না পেরে চোখ রাঙিয়ে বললে, এইয়ো—মু সাম্হালকে বাত বোলো—নেই তো মু মে ইটা ঘুসা দেখা—

মেয়েটির পরনে চমৎকার ফুলন পাড় মিলের শাড়ি, বর্ত্তমানে অতি মলিন—খুব এক মাথা চুল তেল ও সংস্কার অভাবে রুক্ষ ও অগোছালো অবস্থায় মুখের সামনে, চোখের সামনে, কানের পাশে পড়েচে, হাতে কাঁচের চুড়ি, গায়ের রং ফর্সা, মুখশ্রী একসময়ে ভাল ছিল, বর্ত্তমানে র াে, হিংসায়, গালাগালির নেশায় সর্ব্বপ্রকার কোমলতা বর্জ্জিত, ােখের চাউনি কঠিন, কিন্তু তার মধ্যেই যেন ঈষৎ দিশাহারা ও অসহায়।

শরতের বুকের মধ্যে কেমন করে উঠলো। রাজলক্ষ্মী? গড়-শিবপুরের সেই রাজলক্ষ্মী? এর চেয়ে সে হয় তো দু-তিন বছরের ছোট—কিন্তু সেই পল্লীবালা রাজলক্ষ্মীই যেন। বাঙালীর মেয়ে হিন্দু-

স্থানীদের হাতে এভাবে নির্য্যাতিতা হচ্চে, সে দাঁড়িয়ে দেখতে পারবে এই বিশ্বনাথের মন্দিরের পবিত্র প্রবেশপথে ?

শরৎ সোজাসুজি গিয়ে মেয়েটির হাত ধরে বললে, তুমি বেরিয়ে এসো ভাই—আমার সঙ্গে—

মেয়েটি আগের মত কাঁদতে কাঁদতে বললে, আমার গামছা নিয়েচে ওরা কেড়ে—আমি রাস্তায় বেরুলেই ওরা এমনি করে রোজ রোজ— তার পরেই ভিড়ের দিকে রুখে দাঁড়িয়ে বললে, দে আমার গামছা, ওঃ মুখ পোড়ারা, তোদের মড়া বাঁধা ওতে হবে না—দে আমার গামছা—

ভিড় তখন শরতের অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে কিছু অবাক হয়ে ছত্রভঙ্গ হবার উপক্রম হয়েচে। দু-একজন হি হি করে মজা দেখবার তৃপ্তিতে হেসে উঠলো। শরৎ মেয়েটির হাত ধরে গলির বাইরে যত টেনে আনতে যায়, মেয়েটি ততই বার বার পিছন ফিরে ভিড়ের উদ্দেশে রুদ্রমূর্ত্তিতে নানা অশ্লীল ও ইতর গালাগালি বর্ষণ করে।

অবশেষে শরৎ তাকে টানতে টানতে গলির মুখে বড় রাস্তার ধারে নিয়ে এল, যেখানে মনোহারী দোকানের সামনে সে রেণুকাকে দাঁড় করিয়ে রেখে গিয়েছিল।

রেণুকা চোখে না দেখতে পেলেও গোলমাল ও গালাগালি শুনেচে; এখনও শুনচে মেয়েটির মুখে—সে ভয়ের সুরে বললে, কি, কি ভাই ? কি হয়েচে ? ও সঙ্গে কে ?

—সে কথা পরে হবে। এখন চলো ভাই ওদিকে—

মেয়েটি গালাগালি বর্ষণের পরে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যেন। সে কাঁদো কাঁদো সুরে বলতে লাগলো—আমার গামছাখানা নিয়ে গেল মুখপোড়ারা—এমন গামছাখানা—

শরৎ বললে, ভাই রেণুকা, দোকান থেকে গামছা একখানা কিনে দিই ওকে—চল তো—

মেয়েটি গালাগালি ভুলে ওর মুখের দিকে চাইল। রেণুকা জিগ্যেস করলে, তোমার নাম কি? থাকো কোথায়?

মেয়েটি কোনো জবাব দিলে না।

গামছা কিনতে গিয়ে দোকানী বললে, একে পেলেন কোথায় মা?

শরৎ বললে, একে চেন?

—প্রায়ই দেখি মা। গণেশমহল্লার পাগলী, গণেশমহল্লায় থাকে—ও লোককে বড় গালাগালি দেয় থামকা—

পাগলী রেগে বললে, দেয়! তোর পিণ্ডি চটকায়, তোকে মণিকর্ণিকার ঘাটে শুইয়ে মুখে নুড়ো জেলে দেয় হারামজাদা—

দোকানী চোখ রাঙিয়ে বললে, এই চুপ! খবরদার—ওই দেখুন মা—

শরৎ ছেলে মানুষকে যেমন ভুলোয় তেমনি সুরে বললে, ওকি, অমন করে না ছিঃ—লোককে গালাগালি দিতে নেই।

পাগলী ধমক খেয়ে চুপ ক'রে রইলো।

—গামছা কত?

—চোদ্দ পয়সা মা—আমার দোকানে জিনিসপত্তর নেবেন। এই রাস্তায় বাঙালী বলতে এই আমিই আছি। দশ বছরের দোকান আমার। হুগলী জেলায় বাড়ী, ম্যালেরিয়ার ভয়ে দেশে যাইনে, এই দোকানটুকু ক'রে বাবা বিশ্বনাথের ছিচরণে পড়ে আছি—আমার নাম রামগতি নাথ। এক দামে জিনিস পাবেন মা আমার দোকানে দরদস্তুর নেই। মেড়োদের দোকানে যাবেন না, ওরা ছুরি ছানিয়ে বসে আছে। বাঙালী দেখলেই গলায় বসিয়ে দেবে। এই গামছাখানা মেড়োর দোকানে কিনতে যান—চার আনার কম নেবে না।

দোকানীর দীর্ঘ বক্তৃতা শরৎ গামছা হাতে দাঁড়িয়ে একমনে শুনলে, যেন না শুনলে দোকানীর প্রতি নিষ্ঠুরতা ও অসৌজন্য দেখানো হবে।

তারপর আবার রাস্তায় উঠে পাগলীকে বললে, এই নেও বাছা গামছা—পছন্দ হয়েচে ?

পাগলী সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে বললে, খিদে পেয়েচে—

শরৎ বললে, কি করি রেণু, ছ'টা পয়সা সম্বল, তাতেই যা হয় কিনে থাক গে—

রেণুকা বললে, আমার হাঁড়িতে বোধ হয় ভাত আছে।

—তাই দেখি গে চলো,—

পাগলীকে ভাত দেওয়া হোল, কতক ভাত সে ছড়ালে, কতক ভাত ইচ্ছে করে ধুলোতে মাটিতে ফেলে তাই আবার তুলে তুলে খেতে লাগলো, অর্দ্ধেক খেলে ভাত, অর্দ্ধেক খেলে ধুলো মাটি।

শরতের চোখে জল এসে পড়ে পড়ে। মনে ভাবলে—আহা, অল্প বয়সে, কি পোড়া কপাল দেখো একবার! মুখের ভাত দুটো খেলেও না—

বললে, ভাত ফেলছিস্ কেন? থালায় তুলে নে মা—অমন করে না—

ঠিক সেই সময় রাজপথে সম্ভবতঃ কোনো বিবাহের শোভাযাত্রা বাজনা বাজিয়ে ও কলরব করতে করতে চলেচে শোনা গেল। শরৎ তাড়াতাড়ি সদর দরজার কাছে ছুটে এসে দেখতে গেল, এসব বিষয়ে তার কৌতূহল এখনও পল্লীবালিকার মতই সজীব।

সঙ্গে সঙ্গে পাগলীও ভাতের থালা ফেলে উঠে ছুটে গেল শরৎকে ঠেলে একেবারে সদর রাস্তায়—

শরৎ ফিরে এসে বললে, ওমা, একি কাণ্ড, ভাত তো খেলেই না, গামছাখানা পর্য্যন্ত ফেলে গেল।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও পাগলীর আর দেখা পাওয়া গেল না।

দশ

পরদিন শরৎ আবার খোকাদের বাড়ী ধ্রুবেশ্বরের গলিতে গিয়ে হাজির সঙ্গে পটলের বউ।

খোকার মা বললেন, দু-দিন আসনি ভাই, খোকা 'মাসিমা' 'মাসিমা' বলে গেল।

খোকার জন্যে আজ সে এসেচে শুধু হাতে, কারণ পাগলীকে পয়সা দেবার পরে ওর হাতে আর পয়সা নেই। মিনুর কাকীমার কাছে বার বার চাইতে লজ্জা করে।

খোকা শরতের কোল ছাড়তে চায় না।

শরৎ যখন এদের বাড়ী আসে, যেন কোন নূতন জীবনের আলো, আনন্দের আলোর মধ্যে ডুবে যায়। আবার যখন মিনুর কাকীমাদের বাড়ী যায়, তখন জীবনের কোন্ আলো-আনন্দহীন অন্ধকার রন্ধ্রপথে ঢুকে যায়, দূর দিক্‌চক্রবালে উদার আলোকজ্জ্বল প্রসার সেখান থেকে চোখে পড়ে না।

খোকা বলে, এসো, মাসিমা—খেলা করি—

খোকার আছে দুটো রবারের বল, একটা কাঠের ভাঙা বাক্স, তার মধ্যে 'মেকানো' খেলার সাজ-সরঞ্জাম। শেষোক্ত জিনিসটা ছিল খোকার দাদার, এখন সে বড় হয়ে তার ত্যক্ত সম্পত্তি ছোট ভাইকে দিয়ে দিয়েচে।

খোকা বলে, সাজিয়ে দাও মাসিমা।

শরৎ জীবনে 'মেকানো'র বাক্স দেখেনি, কল্পনাও করে নি। সে সাজাতে পারে না। খোকাও কিছু জানে না, দুজনে মিলে হেলাগোছা ক'রে একটা অদ্ভুত কিছু তৈরি করলে।

থোকার মা শরতের জন্যে খাবার তৈরী ক'রে খেতে ডাকলে।

শরৎ বললে, আমি কিছু খাবো না দিদি—

—তা বললে হয় না ভাই, খোকার মাসিমা যথন হয়েচ, কিছু মুখে না দিয়ে—

—রোজ রোজ এলে যদি খাওয়ান তা হোলে আসি কি ক'রে?

—খোকনকে তুমি বড় হোলে খাইও ভাই। শোধ দিও তথন না হয়—

বক্সীদের বড়বউ খবর পেয়ে এসে শরতের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলে।

সে বললে, কি ভাল লেগেচে ভাই তোমাকে, তুমি এসেচ শুনে ছুটে এলাম—একটা কথা বলবে?

—কি, বলুন?

—তোমার বাপের বাড়ী কোথায় ভাই?

—গড়শিবপুর, যশোর জেলায়।

—শ্বশুরবাড়ী

—বাপের বাড়ীর কাছেই—

—বাবা মা আছেন?

শরৎ চুপ ক'রে রইল। দু-চোথ বেয়ে টস্‌-টস্‌ ক'রে জল গড়িয়ে পড়লো বাবার কথা মনে পড়াতে। সে তাড়াতাড়ি চোথের জল আঁচল দিয়ে মুছে নিয়ে বললে, ওসব কথা জিজ্ঞেস করবেন না দিদি—

বক্সীদের বউ বুদ্ধিমতী, এবিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞেস করলে না তথন। কিছুক্ষণ অন্য কথার পরে শরৎ যথন ওদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে আসচে, তথন ওকে আড়ালে ডেকে বললে, আমি তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করতে চাইনে ভাই—কিন্তু আমার দ্বারা যদি তোমার

কোন উপকার হয়, জানিও তা যে ক'রে হয় করবো। তোমাকে যে কি চোখে দেখেছি।

শরৎ অশ্রুভারনত চোখে বললে, আমার ভাল কেউ করতে পারবে না দিদি। যদি এখন বাবা বিশ্বনাথ তাঁর চরণে স্থান দেন, তবে সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়।

—তুমি সাধারণ ঘরের মেয়ে নও কিন্তু—

—খুব সাধারণ ঘরের মেয়ে দিদি। ভালবাসেন তাই অন্যরকম ভাবেন। আচ্ছা এখন আসি।

—আবার এসো খুব শীগ্‌গির—

শরৎ ও পটলের বৌ পথ দিয়ে চলে আসতে সেদিনকার সেই পাগলীর সঙ্গে দেখা। সে রাস্তার ধারে একখানা ছেঁড়া কাপড় পেতে বসেচে জাঁকিয়ে—আর যে পথ দিয়ে যাচ্ছে, তাকেই বলচে—একটা পয়সা দিয়ে যাও না?

শরৎ বললে, আহা, সেদিন ওর কিছু খাওয়া হয় নি, পয়সা আছে কাছে ভাই?

পটলের বউ বললে, পাঁচটা পয়সা আছে—

—ওকে কিছু খাবার কিনে দিই—এসো।

নিকটবর্ত্তী একটা দোকান থেকে ওরা কিছু খাবার কিনে নিয়ে ঠোঙাটা পাগলীর সামনে রেখে দিয়ে বললে, এই নাও খাও—

পাগলী ওদের মুখের দিকে চেয়ে কোন কথা না বলে খাবারগুলো গোগ্রাসে খেয়ে বললে, আরও দাও—

শরৎ বললে, আজ আর নেই—কাল এখানে বসে থেকো বিকেলে এমনি সময়। কাল দেবো।

পটলের বৌ বললে, ভাই, আমার বাড়ী থেকে দুটো রেঁধে নিয়ে এসে দেবো কাল?

—বেশ এনো। আমি একটু তরকারি এনে দেবো। আমার যে ভাই কোন কিছু করবার যো নেই—তাহলে আমার ইচ্ছে করে ওকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে ভালো ক'রে পেট ভরে খাওয়াই। দুঃখ-কষ্টের মর্ম্ম নিজে না বুঝলে অপরের দুঃখ বোঝা যায় না। বাঙালীর মেয়ে কত দুঃখে পড়ে আজ ওর এ দশা—তা এক ভগবান ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। আমিও কোনদিন ওই রকম না হই ভাই—

—বালাই ষাট, তুমি কেন অমন হতে যাবে, ভাই?···ধরো, আমার হাত ধর ভাই, বড্ড উঁচু নীচু—

এই অন্ধ পটলের বউ। এর ওপরও এমন মায়া হয় শরতের! কে আছে এর জগতে, কেউ নেই—পটল ছাড়া। আজ যদি, ভগবান না করুন, পটলের কোনো ভালমন্দ হয়, তবে কাল এই নিঃসহায়, নিঃসম্বল অন্ধ মেয়েটি দাঁড়ায় কোথায়?

আবার ওই রাস্তার ধারের পাগলীর কথা মনে পড়ে।

জগতে যে এত দুঃখ, ব্যথা, কষ্ট আছে, শরৎ সেসব কিছু খবর রাখতো না। গড়শিবপুরের নিভৃত বনবিতান শ্যামল আবরণের সংকীর্ণ গণ্ডি টেনে ওকে স্নেহে যত্নে মানুষ করেছিল—বহির্জগতের সংবাদ সেখানে গিয়ে কোনোদিনও পৌঁছোয় নি।

শরৎ জগৎটাকে যে রকম ভাবতো, আসলে এটা সে রকম নয়। এখন তার চোখ ফুটেছে, জীবনে এত মর্ম্মান্তিক দুঃখের মধ্যে দিয়েই তবে সে উদার দৃষ্টি লাভ হয়েচে তার, এক এক দিন গঙ্গার ঘাটে চুপ ক'রে বসে থাকতে থাকতে শরতের মনে ওঠে এসব কথা।

আগেকার গড়শিবপুরের সে শরৎ যে আর সে নেই—সেটা খুব ভাল করেই বোঝে। সে শরৎ ছিল মনে প্রাণে বালিকা মাত্র। বয়েস হয়েছিল যদিও তার ছাব্বিশ—দৃষ্টি ছিল রাজলক্ষ্মীর মতই, সংসারের

কিছু বুঝতো না, জানতো না। সব লোককে ভাবতো ভাল, সব লোককে ভাবতো তাদের হিতৈষী।

সেই বালিকা, শরতের কথা ভাবলে এ শরতের এখন হাসি পায়!

শরৎ মনে এখন যথেষ্ট বল পেয়েচে। কলকাতা থেকে আজ এসেচে প্রায় দেড় বছর, যে ধরণের উদ্‌ভ্রান্ত, ভীরু মন নিয়ে দিশেহারা অবস্থায় পালিয়ে এসেছিল কলকাতা থেকে—এখন সে মন যথেষ্ট বল সঞ্চয় করেচে। দুনিয়াটা যে এত বড়, বিস্তৃত—সেখানে যে এত ধরণের লোক বাস করে, তার চেয়েও কত বেশী দুঃখী অসহায়, নিরাবলম্ব লোক যে তার মধ্যে রয়েচে. এই সব জ্ঞানই তাকে বল দিয়েচে।

সে আর কি বিপদে পড়েচে, তার চেয়েও শতগুণে দুঃখিনী ওই গণেশমহল্লার পাগলী, এই অন্ধ পটলের বউ। এই কাশীতে সেদিন সে এক বুড়ীকে দেখেচে দশাশ্বমেধ ঘাটে, বয়েস তার প্রায় সত্তর-বাহাত্তর, মাজা ভেঙে গিয়েচে, বাংলা দেশে বাড়ী ছিল, হাওড়া জেলার কোন এক পাড়াগাঁয়ে। কেউ নেই বুড়ীর, অনেক দিন থেকে কাশীতে আছে, ছত্রে, ছত্রে খেয়ে বেড়ায়।

সেদিন শরৎকে বললে, মা তুমি থাকো কোথায় গা?

—কাছেই। কেন বলুন?

—তোমরা?

—ব্রাহ্মণ।

—আমায় দুটো ভাত দেবে একদিন?

—আমার সে সুবিধে নেই মা। আমি পরের বাড়ী থাকি। আপনার মত অবস্থা। কেন আপনি খান কোথায়?

—পুঁটের ছত্তরে খেতাম, সে অনেকদূর। অত দূর আর হাঁটতে পারি নে—আজকাল আবার নিয়ম করেচে একদিন অন্তর মাদ্রাজীদের

ছত্তরে ডাল ভাত দেয়। তা সে সব তরকারী নারকোল তেলে রান্না মা। আমাদের মুখে ভাল লাগে না। আজ এতজায়গায় ভোজ দেবে, সেখানে যাবো—ওই পাঁড়েদের ধর্ম্মশালায়—চলো না যাবে মা?

—কতদূর?

—বেশি দূর নয়। এক হিন্দুস্থানী বড়লোক কাশীতে তীর্থধর্ম্ম করতে এসেচে মা। লোকজন খাওয়াবে—আমাদের সব নেমন্তন্ন করেচে। চলো না?

—না মা, আমি যাবো না।

—এতে কোনো লজ্জা নেই, অবস্থা খারাপ হোলে মা সব রকম করতে হয়। আমারও দেশে গোলাপালা ছেল, দুই ছেলে হাতীর মত। তারা থাকলে আজ আমার বেদ্ধ বয়েসে কি এ দশা হয়?

বুড়ীর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো।

শরৎ ভাবলে, দেখেই আসি, খাবো না তো—যা জিনিস দেবে, নিয়ে এসে পাগলীকে কি পটলের বউকে দিয়ে দেবো।

তাই সেদিন সে মনোমোহন পাঁড়ের ধর্ম্মশালায় গেল বুড়ীর সঙ্গে। ধর্ম্মশালার বিস্তৃত প্রাঙ্গণে অনেক বৃদ্ধ বাঙালী ও হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ জড়ো হয়েছে—মেয়েমানুষও সেখানে এসেচে, তবে সংখ্যা খুব বেশি নয়।

যারা ভোজ দিচ্চে, তারা বাংলা জানে না—হিন্দীতে কথাবার্ত্তা কি বলে, শরৎ ভাল বুঝতে পারে না। তারা খুব বড়লোক, দেখেই মনে হোল। শরৎকে দেখে আলাদা ডেকে তাদের একটি বউ বললে, তুমি কি আলাদা বসে খাবে, মাইজি?

—না মা—আমি নিয়ে যাবো।

—বাড়ীতে লেড়কালেড়কি আছে বুঝি?

শরৎ মৃদুহেসে বললে, না।

—আচ্ছা বেশ নিয়েই যাও—এখানে থাকো কোথায়?

—একজনদের বাড়ী। রান্না করি।

—বাঙালী রান্না করো?

—হ্যাঁ মা।

একটু পরে ভোজের বন্দোবস্ত হোল। অন্য কিছু নয়, শুধু হালুয়া, তিল তেলে রান্না। প্রকাণ্ড চাদরের কড়াইয়ে প্রায় দশ সের সুজি, দশ সের চিনি—আর ছোট টিনের একটিন তিলতেল ঢেলে হালুয়া তৈরি হচ্চে, শরৎকে ডেকে নিয়ে গিয়ে হিন্দুস্থানী বৌটি সব দেখালে। অভ্যাগত দরিদ্র নরনারীদের বসিয়ে পেট ভরে সেই হালুয়া খাওয়ানো হোল—যাবার সময় দু-আনা করে মাথাপিছু ভোজন দক্ষিণাও দেওয়া হোল। শরৎকে কিন্তু একটা পুঁটুলিতে হালুয়া ছাড়া পুরী ও লাড্ডু অনেক ক'রে দিয়ে দিলে ওরা।

খাবারগুলো পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে এসে শরৎ পটলের বউকে দিয়ে দিলে। বললে, আজ আর পাগলীর দেখা নেই। আজ খেতে পেতো, আজই নিরুদ্দেশ।

পটলের বউ বললে, পাগলীর জন্যে রেখে দেবো দিদি?

—কেন মিথ্যে বাসি করে থাবে? কাল যে আসবে তারই বা মানে কি আছে? খাও তোমরা।

—আপনি খাবেন না?

—আমি খাবো না, সে তুমি জানো। ওরা কি জাত তার ঠিক নেই, ওদের হাতে রান্না—

—কাশীতে আবার জাতের বিচার—

—কেন কাশী ত জগন্নাথ ক্ষেত্তর না, সেখানে নাকি জাতের বিচার নেই—

এমন সময় ওপর থেকে ঝি এসে বললে—ওগো বামুনঠাকরুণ, মা ডাকচেন—

ওপরে যেতেই মিনুর কাকীমা এক তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে দিল। মোগল সরাই থেকে তার ভাইপোরা এসেচে, রাত আটটার গাড়ীতে চলে যাবে, অথচ বাম্‌নীর দেখা নেই, মাইনে যাকে দিতে হচ্চে সে সব সময় বাড়ী থাকবে। বিধবা মানুষের আবার অত সখের বেড়ানো কিসের, এতদিন কোনো কৈফিয়ৎ চাওয়া হয় নি শরতের গতিবিধির, কিন্তু ব্যাপার ক্রমশঃ যে রকম দাঁড়াচ্চে, তাতে কৈফিয়ৎ না নিলে আর চলে না।

শরৎ বললে, আমি তো জানতাম না ওঁরা আসবেন। আমি আটটার অনেক আগে খাইয়ে দিচ্চ—

—তুমি রোজ রোজ যাও কোথায়?

—পটলের বউয়ের সঙ্গে তো যাই—

—কোথায় যাও?

—৬ নম্বর ধ্রুবেশ্বরের গলি। হরিবাবু বলে এক ভদ্রলোকের বাড়ী—

—সেখানে কেন?

—পটলের বউ বেড়াতে নিয়ে যায়। ওদের জানাশুনো।

—আজ কোথায় গিয়েছিলে?

—একটা ধর্ম্মশালা দেখ্‌তে।

—ওসব চলবে না বলে দিচ্চি—কোথায় বেরুতে পারবে না কাল থেকে। ডুবে ডুবে জল খাও, সে আমি সব টের পাই। একশো বার ক'রে কর্ত্তাকে বললাম পটলদের তাড়াও নীচের ঘর থেকে। এগারো টাকার জায়গায় এখুনি পনেরো টাকা ভাড়া পাওয়া যায়। তা কর্ত্তার কোন কথা কানে যাবে না—পটলের বউয়ের স্বভাবচরিত্র আমার ভাল ঠেকে না—

বেচারী অন্ধ পটলের বউ, তার নামে মিথ্যা অপবাদ শরতের সহ্য

হোল না। সে বললে, আমার নামে যা হয় বলুন, সে বেচারী অন্ধ, তাকে কেন বলেন? আমায় না রাখেন, কাল সকালেই আমি চলে যাবো—

—বেশ যেও। কাল সকালেই চলে যাবে—

শরৎ নির্বিকার চিত্তে রান্নাবান্না ক'রে গেল। লোকজনকে খাইয়ে দিলে। রাত ন'টার পরে মিনুর কাকীমা বললে, তোমার কি থাকবার ইচ্ছে নেই নাকি?

—আপনিই তো থাকতে দিচ্চেন না। পটলের বউয়ের নামে অমন বললেন কেন? আমি মিশি বলে সে বেচারীও খারাপ হয়ে গেল?

—তোমার বড্ড তেজ—কাশী সহরে কেউ জায়গা দেবে না। সে কথা ভুলে যাও—

—আমার কারো আশ্রয়ে যাওয়ার দরকার নেই। বিশ্বেশ্বর স্থান দেবেন। আমি আপনাদের বাড়ী থাকতে পারবো না। সকালে উঠেই চলে যাবো, যদি বলেন তো রেঁধে দিয়ে যাবো, নয় তো খোকাদের খাওয়ার কষ্ট হবে।

রাত্রে বাড়ী ফিরে মিনুর কাকা সব শুনলেন। সেই রাত্রেই তিনি শরৎকে ডেকে বললেন, তুমি কোথাও যেতে পারবে না বামুন-ঠাকরুণ। ও যা বলেচে, কিছু মনে কোরো না।

শরৎ মিনুর কাকার সামনে বেরোয় না, কথাও বলে না। ঝিকে দিয়ে বলালে, তিনি যদি যেতে বারণ করেন, তবে সে কোথাও যাবে না। কারণ গৌরীমা তাকে যার হাতে সঁপে দিয়েছিলেন—তাঁর অর্থাৎ মিনুর মার বিনা অনুমতিতে সে এ সংসার ছেড়ে যেতে পারবে না।

আরও দিন পনেরো কেটে গেল। এক দিন বিশ্বেশ্বরের গলির

মুখে সেই বুড়ীর সঙ্গে আবার দেখা। বুড়ী বললে, কি গা থাচ্চ কোথায় ? কোন্ ছত্তরে ?

শরৎ অবাক হয়ে বললে, আমি ছত্তরে থাই নে তো? আমি লোকের বাড়ী থাকি যে।

—চলো, আজ কুচবিহারের কালীবাড়ী খুব কাণ্ড, সেখানে যাই। নাটকুটের ছত্তর চেন ?

—না মা, আমি কোথাও যাই নি—

—চলো আজ সব দেখিয়ে আনি—

সারা বিকেল তিন-চারটি বড় বড় ছত্রে শরৎ কাঙালী ভোজন, ব্রাহ্মণ ভোজন দেখে বেড়ালে। বাঙালীটোলা ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিরাট কালীবাড়ী ও ছত্র কুচবিহার মহারাজের। কালী মন্দিরের দেওয়ালে কত রকমের অস্ত্রশস্ত্র, কি চমৎকার বন্দোবস্ত অনাহূত রবাহূত গরীব, নিরন্ন সেবার! মেয়েদের জন্যে খাওয়ানোর আলাদা জায়গা, পুরুষদের আলাদা, ব্রাহ্মণদের আলাদা। এত অকুণ্ঠ অন্নদান সে কখনো কল্পনাও করতে পারে নি।

শরৎ বললে, হ্যাঁ মা, এখানে যে আসে তাকেই খেতে দেয় ?

—কুচবিহারের কালীবাড়ীতে তা দেয় গো। তবুও আজকাল কড়াকড়ি করেচে। হবে না কেন, বাঙাল দেশ থেকে লোক এসে সব নষ্ট ক'রে দিয়েচে।

—আমি নিজে যে বাঙাল—হ্যাঁ, মা—

শরৎ কথা বলেই হেসে ফেললে। বুড়ী কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বললে, হ্যাঁ গো, বাঙাল না ছাই, তোমার কথায় বুঝি বোঝা যায় কিছু চলো চলো—নাটকুটের ছত্তর দেখিয়ে আনি—

নাটকুটের ছত্রে যখন ওরা গেল, তখন সেখানকার খাওয়া-দাওয়া শেষ। বাইরের গরীব লোকেরা ভাত নিয়ে যাচ্চে কেউ কেউ।

শরৎ বললে, এ কাদের ছত্র মা?

—তৈলঙ্গিদের ছত্তর। এখানে খেতে এসেছিলুম একদিন, ডালে যত বা টক্, তত বা লঙ্কা। সে মা আমাদের পোষায় না। তুণ্ডুমুণ্ডুদের পোষায়, ওদের মুখে কি সোয়াদ আছে মা?

শরৎ হেসে কুটি কুটি। বললে, তুণ্ডুমুণ্ডু কারা মা?

—আর ওই তৈলঙ্গিদের কথাবার্ত্তা শোনো নি? তুণ্ডুমুণ্ডু নাকি সব বলে না?

—আমি কখনো শুনি নি। আমায় একদিন শোনাবেন তো।

—একদিন খাওয়া দাওয়ার সময় নাটকুটের ছত্তরে নিয়ে আসবো—দেখতে পাবে—

—আর কি ছত্তর আছে?

—এখনো রাজরাজেশ্বরী ছত্তর, পুঁটের ছত্তর, আমবেড়ে—অহিল্যেবাই—

—সব দেখবো মা, আজ সব দেখে আসবো—

সমস্ত ঘুরে শেষ করতে ওরা প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। বললে, কাশীতে ভাতের ভাবনা নেই, অন্নপুন্নো মা দু-হাতে বিলিয়ে যাচ্চেন—

শরৎ বাসায় ফিরে এসে ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইল। ত[illegible] সকলের চেয়ে ভাল লেগেছে কাশীর এই অন্নদান। এমন একটা ব্যাপারের কথা সত্যিই সে জানতো না। ডাল ভাত উনুনে চাপিয়ে দিয়ে সে শুধু ভাবে ওই কথাটা। তার আর কিছু ভাল লাগে না। কাল সকালে সকালে এদের খাইয়ে দাইয়ে দিয়ে সে আবার বেরুবে ছত্র দেখতে। ছত্রে খাওয়ানোর দৃশ্য সে মাত্র দেখলে কুচবিহারের কালীবাড়ীতে। অন্য ছত্রে যখন গিয়েছিল তখন সেখানকার খাওয়ানো বন্ধ হয়ে গিয়েচে। সে দেখতে চায় দুচোখ ভরে এই বিরাট অন্নব্যয়, অকুণ্ঠ সদাব্রত—যেখানে

গণেশমহল্লার পাগলীর মত, অই অন্ধ রেণুকার মত, তার নিজের মত ওই সত্তর বছরের মাজা-ভাঙা বুড়ীর মত—নিরন্ন, নিঃসহায় মানুষকে দুবেলা খেতে দিচ্চে। ওই দেখতে তার খুব ভাল লাগে—খুব—খুব ভাল লাগে। ওই শব ছত্রেই বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা প্রত্যক্ষ বিরাজ করেন বুভুক্ষু অভাজনদের ভোজনের সময়—মন্দিরে তাঁদের দেখার চেয়েও সে দেখা ভালো। অনেক, অনেক ভালো।

ঝি এসে বলে, ও বামন ঠাকরুণ, মাছের ঝোল দিয়ে বাবুকে আগে ভাত দিতে হবে। খেয়ে এখুনি বেরিয়ে যাবেন—

—ও ঝি শোনো—পাঁচফোড়ন মোটে নেই, বাজার থেকে আগে এনে দাও—

ঝি চলে যায়। মাছের ঝোল ফোটে। নিভৃত রান্নাঘরের কোণে গোলমাল নেই—বসে শরৎ স্বপ্ন দেখে, সে প্রকাণ্ড ছত্র খুলেচে, কেদার ছত্র, বাবার নামে। কত লোক এসে যাচ্চে, খাচ্ছে—অবারিত দ্বার। বাবার ছত্র থেকে কোনো লোক ফিরবে না, অনাহারে কেউ ফিরে যাবে না। সে নিজে দেখবে শুনবে—সকলকে খাওয়াবে। সে দু-হাতে অন্নদান করবে। সকলকেই—ব্রাহ্মণ, শূদ্র নেই, তুণ্ডমুণ্ড নেই, বাছ-বিচার নেই—সকলেই হবে তার পরম সম্মানিত অতিথি। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সবাইকে খাওয়াবে সে।

শরতের মাথার মধ্যে কি যেন নেশা জমেচে।···

রান্নাবান্না সেরে সে মিনুর কাকীমাকে বললে, আজ একবারটি বাইরে যাবো?

—কোথায়?

শরৎ হঠাৎ সলজ্জ হেসে বললে—সে বলবো এখন এসে।

শরতের হাসি দেখে মিনুর কাকীমার মনে সন্দেহ হোল। সে

বললে, কোথায় না বললে চলে ? সব জায়গায় যেতে দিতে পারি কি ? রাগ করলে তো চলে না—বুঝে দেখতে হয়।

—ছত্তর দেখতে। রাজরাজেশ্বরী ছত্তরে অনেক বেলায় খাওয়া-দাওয়া হয়, পুঁটের ছত্তরেও হয়—দেখে আসি একটিবার—

মিনুর কাকীমা শরতের মনের উত্তাল উদ্বেল সমুদ্রের কোনো খবর রাখে না—সেবা ও অন্নদানের যে বিরাট আকুতি ও আগ্রহের কোনো খবর রাখে না—বললে, কেন ছত্তর দেখতে কেন ? সে আবার কি ?

—দেখিনি কখনো। যেতে দিন আজ আমায়—

শরতের কণ্ঠে সাগ্রহ মিনতির সুরে মিনুর কাকীমা ছুটি দিতে বাধ্য হোল, তবে হয়তো শরতের কথা সে আদৌ বিশ্বাস করলে না।

শরৎ এসে বললে, ও রেণু পোড়ারমুখী—কি হচ্চে ?

—ও, আজ যেন খুব ফুর্ত্তি, তোমার কি হয়েচে শুনি ?

—কি আবার হবে, তোর মুণ্ড হবে। চল ছত্তরে যাই, খাওয়া দেখে আসি।

রেণু অবাক হয়ে বললে, কেন ?

—কেন, তোর মাথা। আমি যে কাশীতে ছত্তর খুলচি জানিস নে ?

—বেশ তো ভাই। আমাদের মত গরীব লোকে তা হোলে বেঁচে যায়। দু-বেলা তোমার ছত্তরে পেট ভরে দুটো খেয়ে আসি। হাঁড়ি-হেঁসেলের পাট উঠিয়ে দিই। কি নাম হবে, শরৎসুন্দরী ছত্র ?

না ভাই। বাবার নামে—কেদার ছত্তর। কেমন নাম হবে বল তো ?

—যাই বলো ভাই, শরৎসুন্দরী ছত্র শুনতে যেমন, তেমনটি কিন্তু হোল না।

রাজরাজেশ্বরী ছত্রে ওরা যেতেই ছত্রের লোকে জিগ্যেস করলে—আপনারা আসুন, মেয়েদের জন্যে আলাদা বন্দোবস্ত আছে—

শরৎ বললে, চল ভাই রেণু, দেখিগে—

—যদি খেতে বলে ?

—জোর ক'রে খাওয়াবে না কেউ, তুমি চলো।

মেয়েদের মধ্যে সবাই বুড়ো-হাবড়া, এক আধ জন অল্প বয়সী মেয়েও আছে—কিন্তু তারা এসেচে বুড়ীদের সঙ্গে, কেউ নাতনী, কেউ মেয়ে সেজে। বুড়ীরা বড় ঝগড়াটে, পাতা আর জলের ঘটি নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়েচে। শরৎ বললে, মা বসুন, আমি জল দিচ্চি আপনাদের—

একজন জিগ্যেস করলে—তুমি কি জেতের মেয়ে গা?

—বামুনের মেয়ে, মা।

কাশীতে এলে সবাই বামুন হয়। কোথায় থাকো তুমি?

—বাঙালীটোলায় থাকি মা—কিছু ভাববেন না আপনি।

ছত্রের পরিবেশনকারিণী একটি মধ্যবয়স্কা মেয়ে শরৎকে বললে, তোমরা বসচো না বাছা?

—আমি খাবো না মা।

সে অবাক হয়ে বললে, তবে এখানে কেন এসেচ?

—দেখতে।

রেণুকা বললে, উনি বড়লোকের মেয়ে, ছত্তর খুলবেন কাশীতে। তাই দেখতে এসেচেন কি রকম খাওয়া-দাওয়া হয়।

এক মুহূর্ত্তে যেসব বুড়ী খেতে বসেচে এবং যারা পরিবেশন ও দেখাশুনা করচে, সকলেরই ধরণ বদলে গেল। যে বুড়ী শরতের জাতি-বর্ণের প্রশ্ন তুলেছিল, সেই সকলের আগে একগাল হেসে বললে, সে চেহারা দেখেই আমি ধরেচি মা, চেহারা দেখেই ধরেচি। আগুন কি ছাই চাপা থাকে? তা ত্যাখো রাণীমা, একটা দরখাস্ত দিয়ে রাখি। আমার এই নাতনী, অল্পবয়সে কপাল পুড়েচে, কেউ নেই আমাদের। আপনার ছত্তর খুললে এর দুটো বন্দোবস্ত যেন সেখানে হয়। ভগবান

আপনার ভাল করবেন। কুচবেহার কালীবাড়ীতেও আমাদের নাম-লেখানো আছে মাসে পনেরো দিন। বাকী পনেরো দিন আমবেড়ের আর এই ছত্তরে—

আরও চার-পাঁচজন নিজেদের দুরাবস্থা সবিস্তারে এবং নানা অলঙ্কার দিয়ে বর্ণনা করচে, এমন সময় পায়েস এসে হাজির হোল। একটা ছোট পিতলের গামলার এক গামলা পায়েস, খেতে বসেচে প্রায় জন ত্রিশ-বত্রিশ, বেশি ক'রে কাউকে দেওয়া সম্ভব নয়—অথচ প্রত্যেকেই নির্লজ্জভাবে অনুযোগ করতে লাগলো তার পাতে পায়েস কেন অতটুকু দেওয়া হোল, রোজই সে পায়েস কম পায়, তাকে আজ একটু বেশি করে দেওয়া হোক্। কেউ কেউ ঝগড়াও আরম্ভ করলে পরিবেশনকারিণীর সঙ্গে।

শরৎ রেণুকাকে নিয়ে বাইরে চলে এল। বললে, কেন ও রকম বললি?—ছিঃ—ওরা সবাই গরীব, ওদের লোভ দেখাতে নেই।

তারপর অন্যমনস্কভাবে বললে, ইচ্ছে করে ওদের খুব ক'রে পায়েস খাওয়াই। আহা, খেতে পায় না, ওদের দোষ নেই—ছত্তরে বন্দোবস্ত ঠিকই আছে, একটু পায়েস দেয়। একটু ঘি দেয়—তবে ছিটেফোঁটা।

রেণুকা বললে, বাবাঃ, বুড়ীগুলো একটু পায়েসের জন্যে কি রকম আরম্ভ ক'রে দিয়েচে বল তো? খাচ্চিস্ পরের দয়ায়—আবার ঝগড়া। ভিক্ষের চাল কাঁড়া-আকাঁড়া!

—আহা ভাই—কত দুঃখে যে ওরা এমন হয়েচে তা তুমি আমি কি জানি? মানুষে কি সহজে লজ্জাসরম খোয়ায়? ওদের বড় দুঃখ। সত্যি ভাই আমার ইচ্ছে করচে আজ যদি আমার ক্ষমতা থাকতো, বাবার নামে ছত্তর দিতাম। আর তাতে নিজের হাতে বড় কড়ায় পায়েস রেঁধে ওদের খাওয়াতাম। সেদিন যেমন কড়ায় হালুয়া রেঁধেছিল সেই ছত্তরটা—তুই দেখিস্ নি—চাদরের মস্ত বড় কড়া।

—নে চল্ আমায় হাত ধর—

—ওই পাগলীকে নিজের হাতে রেঁধে একদিন পেট ভরে খাওয়াবো। তোর বাড়ীতে—

—বেশ তো।

—আমি মাইনে ব'লে কিছু চাইলে ওরা দেবে না?

—দেওয়া তো উচিত। তবে গিন্নিটি যে রকম ঝানু—তুমি তো ভাই মুখ ফুটে কিছু বলতে পারবে না—

—মরে গেলেও না। তবে একবার বলে দেখতে হবে। বেশী লোককে না পারি, একজনকেও তো পারি।

ওরা খানিক দূর এসেচে, ছত্রের উত্তর দিকের উঁচু রোয়াক থেকে পুরুষের দল খেয়ে নেমে আসছে, হঠাৎ তাদের মধ্যে কাকে দেখে শরৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তার মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বার হোল—পরক্ষণেই সে রেণুকার হাত ছেড়ে দিয়ে সেদিকে এগিয়ে চললো।

বিস্মিতা রেণুকা বললে, কোথায় চললে ভাই? কি হোল?

পুরুষের ভিড়ের মধ্যে এঁটো হাতে নেমে আসছেন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তিন বৎসর আগে যিনি পদব্রজে দেশভ্রমণে বেরিয়ে গড়শিবপুরে শরৎদের বাড়ীর অতিথিশালায় কয়েকদিন ছিলেন।

শরৎ চেয়ে চেয়ে দেখলে। কোনো ভুল নেই--তিনিই। সেই গোপেশ্বর চট্টোপাধ্যায়!

সে প্রথমটা একটু ইতস্ততঃ করছিল—কিন্তু তখনি দ্বিধা ও সঙ্কোচ ছেড়ে কাছে গিয়ে বললে, ও জ্যাঠামশায়? চিনতে পারেন?

সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণই বটে। শরতের দিকে অল্পক্ষণ হাঁ ক'রে চেয়ে থেকে তিনি আগ্রহ ও বিস্ময়ের সুরে বললেন—মা তুমি এখানে?

—হ্যাঁ জ্যাঠামশায়। আমি এখানেই আছি—

—কতদিন এসেছ? রাজামশায় কোথায়? তোমার বাবা?

—তিনি—তিনি দেশে। সব কথা বলচি, আসুন আমার সঙ্গে। আমার সঙ্গে একটি মেয়ে আছে—ওকে ডেকে নি। আপনি হাত মুখ ধুয়ে নিন জ্যাঠামশায়।

পথে বেরিয়েই গোপেশ্বর চাটুয্যে বললেন—তারপর মা, তুমি এখানে কবে এসেচ? আছো কোথায়?

—সব বলবো। আপনি আগে বলুন, আপনি কবে এসেচেন?

—আমি সেই তোমাদের ওখান থেকে বেরিয়ে আরও দু-এক জায়গায় বেড়িয়ে বাড়ী যাই। বাড়ীতে বলেচি তো ছেলের বউ আর ছেলেরা। তাদের অবস্থা ভাল না। কিছুদিন বেশ রইলাম—তারপর এই মাঘ মাসে আবার বেরিয়ে পড়লাম—একেবারে কাশী।

—হেঁটে?

—না মা, বুড়ো বয়েসে তা কি পারি। ভিক্ষেসিক্ষে করে কোনো মতে রেলে চেপেই এসেচি। ছত্তরে ছত্তরে খেয়ে বেড়াচ্ছি। মা অন্নপূর্ন্নোর কৃপায় আমার মত গরীব ব্রাহ্মণের দুটো ভাতের ভাবনা নেই এখানে। চলে যাচ্চে এক রকমে। আর দেশে ফিরবো না ভেবেচি মা।

রেণুকাকে বাড়ীতে পৌছে দিয়ে শরৎ বললে, চলুন জ্যাঠামশায়, দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে বসি।

দু'জনে গিয়ে দশাশ্বমেধ ঘাটের রাণায় বসলো।

গোপেশ্বর চাটুয্যে বললেন, তারপর মা তোমার কথা বলো। কার সঙ্গে এসেচ কাশীতে? ও মেয়েটি বুঝি চোখে দেখতে পায় না? ও কেউ হয় তোমাদের?

শরতের কোন দ্বিধা হোল না এই পিতৃসম স্নেহশীল বৃদ্ধের কাছে সব কথা খুলে বলতে। অনেক দিন পরে সে এমন একজন মানুষ পেয়েচে, যার কাছে বুকের বোঝা নামিয়ে হাল্কা হওয়া যায়। কথা শেষ ক'রে সে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লো।

বৃদ্ধ গোপেশ্বর চাটুয্যে সব শুনে কাঠের মত ব'সে রইলেন।

এসব কি শুনচেন তিনি? এও কি সম্ভব?

শেষে আপন মনেই যেন বললেন, তোমার বাবা রাজামশায় তা হোলে দেশেই—না?

—তা জানি নে জ্যাঠামশায়, বাবা কোথায় তা ভেবেচিও কতবার —তবে মনে হয় দেশেই আছেন তিনি—যদি এতদিন বেঁচে থাকেন—

কান্নার বেগে আবার ওর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল।

—আচ্ছা থাক মা কেঁদো না। আমিও বলচি শোনো—গোপেশ্বর চাটুয্যে যদি অভিনন্দ ঠাকুরের বংশধর হয়, তবে এই কাশীর গঙ্গাতীরে বসে দিব্যি করচি তোমাকে তোমার বাবার কাছে নিয়ে যাবোই। তুমি তৈরি হও মা—কালই রওনা হয়ে যাবো বাপে-ঝিয়ে—তুমি কোন্ বাড়ী থাকো—চল দেখে যাই। তুমি কি মেয়ে, আমার তা জান্তে বাকী নেই। নরাধম পাষণ্ড ছাড়া তোমার চরিত্রে কেউ সন্দেহ করতে পারে না। আমার রোগ থেকে সেবা করে তুমি বাঁচিয়ে তুলেছিলে—তা আমি ভুলি নি—আমার আর জন্মের মা-জননী তুমি। তোমায় এ অবস্থায় এখানে ফেলে গেলে আমার নরকেও স্থান হবে না যে।

এগার

রেণুকা ও বৃদ্ধ গোপেশ্বর চাটুয্যেকে সঙ্গে নিয়ে শরৎ [illegible] নিজের বাসায়।

বৃদ্ধ বললেন, এই বাড়ী ? বেশ। কাল তুমি তৈরি হয়ে থেকো। তোমার এই বুড়ো ছেলের সঙ্গে কাল যেতে হবে তোমায়। পয়সা কড়ি না থাকে, সেজন্যে কিছু ভেবো না—ছেলের সে ক্ষমতা আছে মা-জননী।

রেণুকা এতক্ষণ কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে গিয়েছিল, শরৎকে চুপি চুপি বললে, উনি কে ভাই ?

—আমার জ্যাঠামশাই—

—তোমাকে দেশে নিয়ে যাবেন ?

—তাই তো বলচেন।

—হঠাৎ কালই চলে যাবে কেন, এ মাসটা থেকে যাও না কাশীতে। বলো তোমার জ্যাঠামশায়কে। খোকার সঙ্গে একবার দেখাও করতে হবে তো ? আমাকে এত শীগ্‌গির ফেলে দিয়েই বা যাবে কোথায় ?

শরৎ বৃদ্ধকে জানালে। কালই যাওয়া মুস্কিল হবে তার। যেখানে কাজ করচে, যারা এতদিন আশ্রয় দিয়ে রেখেছিল, তারা একটা [illegible] দেখে নিলে সে যাবার জন্যে তৈরি হবে।

বৃদ্ধ গোপেশ্বর চাটুয্যে তাতে রাজি হোলেন। পাঁচ দিনের সময় নিয়ে শরৎ রোজ রান্নাবান্নার পরে রেণুকাকে সঙ্গে নিয়ে খোকনদের বাড়ী যায়। কাশী থেকে কোন্ অনির্দ্দেশ্য ভবিষ্যতের পথে সে যাত্রা সুরু করবে তা সে জানে না—কিন্তু খোকনকে ফেলে যেতে তার সব চেয়ে কষ্ট হবে তা সে এ কয় দিনে হাড়ে হাড়ে বুঝছে। খোকনের মা ওর যাবার কথা শুনে খুবই দুঃখিত।

শরৎ বলে, ও খোকন বাবা, গরীব মাসিমাকে মনে রাখবি তো বাবা ?

খোকন না বুঝেই ঘাড় নেড়ে বলে—হুঁ। তোমাকে একটা বল কিনে দেবো মাসিমা—

—সত্যি ?

—হ্যাঁ মাসিমা, ঠিক দেবো।

—আমায় কখনো ভুলে যাবিনে? বড় হোলে মাসিমার বাড়ী যাবি, মুড়কী নাড়ু দেবো ধামি করে, পা ছড়িয়ে বসে খাবি।

খোকা ঘাড় নেড়ে বলে—হুঁ।

বক্সীদের বড়বৌ ওর নাম ঠিকানা সব লিখে নিলে, খোকনের মার কাছে ওর নাম ঠিকানা রইল।

ফিরবার পথে শরৎ গণেশমহল্লার পাগলীর সন্ধানে ইতস্ততঃ চাইতে লাগলো, কিন্তু কোথাও তাকে দেখা গেল না। রেণুকাকে বললে, ওই একটা মনে বড় সাধ ছিল, পাগলীকে একদিন ভাল করে বেঁধে খাওয়াবো —তা কিন্তু হোল না। আমি মাইনে বলে কিছু চেয়ে নেবো মিনুর কাকার কাছ থেকে, যদি কিছু দেয় তবে তোর কাছে রেখে যাবো। আমার হয়ে তুই তাকে একদিন খাইয়ে দিস্—

রেণুকা ধরা গলায় বলে—আর আমার উপায় কি হবে বললে না যে বড়? তোমার ছত্র কবে এসে খুলচো কাশীতে—শরৎ সুন্দরী ছত্র? গরীব লোক দুটো খেয়ে বাঁচি।

শরৎ হেসে ভঙ্গি ক'রে ঘাড় দুলিয়ে বললে, আ তোমার মরণ! এর মধ্যে ভুলে গেলি মুখপুড়ী? শরৎসুন্দরী নয় কেদার ছত্তর—

—ও ঠিক, ঠিক। জ্যাঠামশায়ের নামে ছত্র হবে যে! ভুলে যাই ছাই—

না হোলেও তুই যাবি আমাদের দেশে। মস্ত বড় অতিথিশালা আছে। রাজারাজড়ার কাণ্ড! সেখানে বারো মাস খাবি, রাজকন্যের সখী হয়ে—কি বলিস?

—উঃ তা হলে তো বর্তে যাই দিদি ভাই। কবে যেন যাচ্ছি তাই বলো, জোড়ে না বিজোড়ে?

—তা কি কখনো হয় রে পোড়ারমুখী? জোড়ের পায়রা জোড় ছাড়া করতে গিয়ে পাপের ভাগী হবে কে?

মিনুর কাকীমাকে শরৎ বিদায়ের কথা বলতেই সে চমকে উঠলো প্রায় আর কি। কেন যাবে, কোথায় যাবে, কার সঙ্গে যাবে—নানা প্রশ্নে শরৎ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো। তার কোনো কথাই অবিশ্যি মিনুর কাকীমার বিশ্বাস হোল না। ও সব চরিত্রের লোকের কথার মধ্যে বারো আনাই মিথ্যে।

শরৎ বললে, আমায় কিছু দেবেন? যাবার সময় খরচপত্র আছে—

—যখন তখন হুকুম করলেই কি গেরস্তর ঘরে টাকাকড়ি থাকে? আমি এখন যদি বলি আমি দিতে পারবো না?

—দেবেন না। আপনারা এতদিন আশ্রয় দিয়েছিলেন এই ঢের। পয়সাকড়ির জন্যে তো ছিলাম না, গৌরী-মা বলে দিয়েছিলেন, সব ঠিক ক'রে দিয়েছিলেন—তাই এখানে ছিলাম। আপনাদের উপকার জীবনে ভুলবো না।

মিনুর কাকীমা শরতের কথা শুনে একটু নরমও হোল। বললে, তা—তা তো বটেই। তা আচ্ছা দেখি যা পারি দেবো এখন।

বিদায়ের দিন শরৎ মিনুর কাকীমাকে অবাক ক'রে দিয়ে বাড়ীর ছেলেমেয়েদের জন্যে কিছু না-কিছু খেলনা ও খাবার জিনিস কিনে নিয়ে এল। রেণুকাকে তার ঘরে একখানা লালপাড় শাড়ী দিতে গিয়ে চোখের জলের মধ্যে পরস্পরের ছাড়াছাড়ি হোল।

রেণুকা বললে, এ শাড়ী আমার পরা হবে না ভাই, মাথায় কোরে রেখে দেবো—

—তাই করিস্ মুখপুড়ী।

—কেন আমার জন্যে খরচ করলি! ক'টাকা দাম নিয়েচে?

—তোর সে খোঁজে দরকার কি? দিলাম, নে। মিটে গেল। জানিস্ আমি রাজকন্যে, আমাদের হাত বাড়ালে পর্ব্বত?

রেণুকা চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললে—তুমি আমায় ভুলে গেলে আমি মরে যাবো ভাই।

শরৎ মুখে ভেংচি কেটে বললে, মরে ভূত হবি পোড়ার মুখী। ভূত না তো, পেত্নী হবি। রাত্রে আমায় যেন ভয় দেখাতে যেয়ো না।

শরতের মুখে হাসি অথচ চোখে জল।

আবার কলকাতা সহর।...

গোপেশ্বর চাটুয্যে বললেন, এখানে বৃন্দাবন মল্লিকের লেনে আমাদের গাঁয়ের একজন লোক থাকে বাসা করে, আপিসে চাকুরী করে। চলো সেখানে গিয়ে উঠি দুজনে।

খুঁজতে খুঁজতে বাসা মিললো। বাড়ীর কর্ত্তা জাতিতে মোদক, স্বগ্রামের প্রবীণ ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর উপস্থিতিতে সে যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গেল। মাথায় রাখে কি কোথায় রাখে, ভেবে যেন পায় না। বললে—মা-ঠাকুরণ কে?

—আমার ভাইঝি, গড়শিবপুরে বাড়ী ওদের। তুমি চেনো না। মস্ত লোক ওর বাবা।

—তা চাটুয্যে মশায়, সব জোগাড় আছে ঘরে। দিদি-ঠাকুরণ রান্না-বান্না করুন, ওরা সব জুগিয়ে দেবে এখন। আমার আবার

আপিসের বেলা হয়ে গেল—দশটায় হাজির হতেই হবে। আমি তেল মাখি—কিছু মনে করবেন না।

বাড়ীর গৃহিণী শরৎকে যথেষ্ট যত্ন করলেন। তাকে কিছুই করতে দিলেন না। বাটনা বাটা, কুটনো কোটা সবই তিনি আর তাঁর বড়মেয়ে দুজনে মিলে করে শরৎকে রান্না চড়িয়ে দিতে ডাক দিলেন।

শরতের জন্যে মিছরী ভিজের সরবৎ, দই সন্দেশ আনিয়ে তার স্নানের পর তাকে জল খেতে দিলেন।

আহারাদির পর শরতের বড় ইচ্ছে হোল একবার কালীঘাটে গিয়ে সে গৌরী-মার সঙ্গে দেখা করে। বৃদ্ধ গোপেশ্বর চাটুয্যে শুনে বললেন, চলো না মা, আমারও ওই সঙ্গে অমনি দেবদর্শনটা হয়ে যাক্।

বিকেলের দিকে ওরা কালীঘাটে গেল। বাড়ীর গৃহিণী তাঁর বড়-মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ওদের সঙ্গিনী হলেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণে বিস্তৃত নাটমন্দিরে দু-তিনটি নূতন সন্ন্যাসী আশ্রয় গ্রহণ করেচেন। গৌরীমা তাঁর পুরোনো জায়গাটিতেই ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন। শরৎকে দেখে তিনি প্রায় চমকে উঠলেন। বললেন, সরোজিনীরা কি কলকাতায় এসেচে

শরৎ তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে সব খুলে বললে।

গৌরীমা বললেন, তোমার জ্যাঠামশায়? কই দেখি—

বৃদ্ধ চাটুয্যে মহাশয় এসে গৌরীমার কাছে বসলেন, কিন্তু প্রণাম করলে না, বোধ হয় সন্ন্যাসিনী তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট ব'লে। বললেন —মা, আমি আপনার কথা শরতের মুখে সব শুনেচি। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন আমি ওকে যেন ওর বাবার কাছে নিয়ে যেতে পারি। আপনার আশীর্ব্বাদ ছিল ব'লে বোধ হয় আমার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল কাশীতে।

গৌরীমা বললেন, তাঁর কৃপায় সব হয় বাবা, তিনিই সব করচেন— আপনি আমি নিমিত্ত মাত্র।

বাসায় ফিরে আসবার পথে শরতের কেবলই মনে হচ্ছিল, যদি কমলার সঙ্গে একবারটি পথে ঘাটে কোথাও দেখা হয়ে যেতো, কি মজাই হোত তা হোলে! কলকাতার মধ্যে যদি কারো সঙ্গে দেখা করবার জন্যে প্রাণ কেমন করে—তবে সে সেই হতভাগিনী বালিকার সঙ্গেই আবার সাক্ষাতের আশায়।

কাশীতে গিয়ে এই দেড় বৎসরে সে অনেক শিখেচে, অনেক বুঝেচে। এখন সে হেনাদের বাড়ী আবার যেতে পারে, কমলাকে সেখান থেকে টেনে আনতে পারে, সে সাহস তার মধ্যে এসে গিয়েচে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে হেনাদের বাড়ীর ঠিকানা জানে না, সহর বাজারে ঘর বাড়ীর ঠিকানা বা রাস্তা না জানলে বের করতে পারা যায় না আজকাল সে বুঝেচে।

কলকাতায় এসে আবার তার বড় ভাল লাগচে। কাশী তো কত পুণ্য স্থান, কত দেউল, দেবমন্দির, ঘাট, যত ইচ্ছে স্নান কর, দান কর, পুণ্য কর—স্বয়ং বাবা বিশ্বনাথের যেখানে অধিষ্ঠান। কিন্তু কলকাতা যেন ওকে টানে, এখানে এত জিনিস আছে যার সে কিছুই বোঝে না—সেজন্যেই হয়তো কলকাতা তার কাছে বেশী রহস্যময়? এত লোকজন, গাড়ীঘোড়া, এত বড় জায়গা কাশী নয়।

শরৎ বলে, জ্যাঠামশায় আপনি কোন্ কোন্ দেশ বেড়ালেন?

—বাংলা দেশের কত জেলায় পায়ে হেঁটে বেড়িয়েচি মা, বৰ্দ্ধমানে গিয়েচি, বৈঁচি, শক্তিগড়, নারানপুর গিয়েচি। রাঢ় দেশের কত বড় বড় মাঠ বেয়ে সন্দেবেলা সুমুখ আঁধার রাত্তিরে একা গিয়েছি। বড় তাল-গাছ ঘেরা দীঘি, জনমানব নেই কোথাও, লোকে বলে ঠ্যাঙাড়ে ডাকাতের ভয়—এমন সব দীঘির ধারে সারাদিন পথ হাঁটবার পরে বসে চাট্টি জলপান খেয়েচি। একদিন সে কথা গল্প করবো তোমাদের বাড়ী বসে।

—বেশ জ্যাঠামশায়।

—বেড়াতে বড় ভাল লাগে আমার। আগে বাংলাদেশের মধ্যেই ঘুরতাম, এবার গয়া কাশীও দেখা হোল—

—আমারও খুব ভাল লাগে। বাবা কোন দেশ দেখেন নি, বাবাকে নিয়ে চলুন আবার আমরা বেরুবো—

—খুব ভাল কথা মা। চলো এবার হরিদ্বার যাবো—

—সে কতদূর? কাশীর ওদিকে?

—সে আরও অনেক দূর শুনেচি। তা হোক, চলো সবাই মিলে যাওয়া যাক্—বৃন্দাবন হয়ে যাবো—তোমার বাবাও চলুন।

—জ্যাঠামশায়?

—কি মা?

—বাবার দেখা পাবো তো?

—আমি যখন কথা দিয়েচি মা, তুমি ভেবো না। সে বিষয়ে নিশ্চিন্দি থাকো।

পরদিন গোপেশ্বর চাটুয্যে শরৎকে কলকাতায় তাঁর স্বগ্রামবাসী কৃষ্ণচন্দ্র মোদকের বাসায় রেখে দুদিনের জন্যে গড়শিবপুরে গেলেন। শরৎকে আগে হঠাৎ গ্রামে না নিয়ে গিয়ে ফেলে সেখানকার বা[illegible]র কি জানা দরকার। গড়শিবপুরে গিয়ে সন্ধান নিয়ে কিন্তু তাঁর চক্ষুস্থির হয়ে গেল, যা শুনলেন সেখানে। গ্রামের লোক বললে, কেদার রাজা বা তাঁর মেয়ে আজ প্রায় দেড় বৎসর দুবৎসর আগে গ্রাম থেকে কলকাতায় চলে যান। সেখান থেকে তাঁরা কোথায় চলে গিয়েছেন তা কেউ জানে না। কলকাতায় তাঁরা নেই একথাও ঠিক। যাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন, তারাই ফিরে এসে বলেচে।

গোপেশ্বর চাটুয্যে গ্রামের অনেককেই জিগ্যেস করলেন, সকলেই ওই এক কথা বলে। সেবার সে সেই মুদীর দোকানে কেদারের সঙ্গে বসে গান-বাজনা করেছিলেন সেখানেও গেলেন। কেদার গাঁয়ে না থাকায় গানবাজনার চর্চ্চা আর হয় না, মুদী খুব দুঃখ করলে। গোপেশ্বরকে তামাক সেজে খাওয়ালে। অনেকদিন কেদার বা তাঁর মেয়ের কোনো সন্ধান নেই, আর আসবেন কিনা কে জানে।

বৃদ্ধ তামাক খেয়ে উঠলেন।

গ্রামের বাহিরের পথ ধ'রে চিন্তিত মনে চলেচেন, শরতের বাপের যদি সন্ধান নাই পাওয়া যায়, তবে উপস্থিত শরতের গতি কি করা যাবে? কাশী থেকে এনে ভুল করলেন না তো?

এমন সময় পেছন থেকে একজন চাষা লোক তাঁকে ডাক দিলে—বাবাঠাকুর?

গোপেশ্বর চাটুয্যে ফিরে চেয়ে দেখে বললেন—কি বাপু?

—আপনি ক্যাদার খুড়ো ঠাকুরের খোঁজ করছিলেন ছিবাস মুদীর দোকানে? আমিও সেখানে ছেলাম। আপনি কি তাঁর কেউ হও?

—হ্যাঁ বাপু। আমি তাঁর আত্মীয়, কেন, তুমি কিছু নাকি?

—আপনি কারো কাছে বলবেন না তো?

—না, বলতে যাবো কেন? কি ব্যাপার বলো তো শুনি। আমি তাঁর বিশেষ আত্মীয়, আর আমার দরকারও খুব।

লোকটা স্বর নীচু ক'রে বললে—তিনি হিংনাড়ার ঘোষেদের আড়তে কাজ করচেন যে। হিংনাড়া চেনেন? হলুদপুকুর থেকে তিন ক্রোশ। আমি পটল বেচতে যাই সেবার মাঘ মাসে। আমার সঙ্গে দেখা। আমায় দিব্যি দিয়ে দিয়েছিলেন গ্রামের কাউকে বলতে নিষেধ করে দিলেন। তাই কাউকে বলিনি। আপনি সেখানে যাও, পুকুরের

উত্তর পাড়ে যে ধান-সর্ষের আড়ৎ, সেখানেই তিনি থাকেন। আমার নাম করে বলবেন, গেঁয়োহাটির ক্ষেত্র সন্ধান দিয়েচে। আমাদের গাঁয়ের সখের যাত্রার দলে কতবার উনি গিয়ে বেয়ালা বাজিয়েছেন। আমায় বড্ড স্নেহ করতেন। মনে থাকবে? গেঁয়োহাটির ক্ষেত্র কাপালী।

গোপেশ্বর চাটুয্যে আশা করেন নি এভাবে কেদারের সন্ধান মিলবে। বললেন—বড্ড উপকার করলে বাপু। কি নাম বললে? ক্ষেত্র? আমি বলবো এখন তাঁর কাছে বড় ভালো লোক তুমি।

সেই দিনই সন্ধ্যার আগে গোপেশ্বর চাটুয্যে হিংনাড়ার বাজারে গিয়ে ঘোষেদের আড়ত খুঁজে বার করলেন। আড়তের লোকে জিগ্যেস করলে—কাকে চান মশাই? কোত্থেকে আসা হচ্চে?

—গড়শিবপুরের কেদার বাবু এখানে থাকেন?

—হ্যাঁ আছেন। কিন্তু তিনি মালঞ্চার বাজারে আড়তের কাছে গিয়েছিলেন—এখনও আসেন নি। বসুন।

রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় কে তাঁকে বললে—মুহুরী মশায় ঐ যে ফিরচেন—

গোপেশ্বর চাটুয্যে সামনে গিয়ে বললেন, রাজামশায়, নমস্কার! আমায় চিনতে পারেন?

গোপেশ্বরের দেখে মনে হোল কেদারের বয়স যেন খানিকটা বেড়ে গিয়েচে, কিন্তু হাবভাবে সেই পুরানো আমলের কেদার রাজাই রয়ে গিয়েচেন পুরোপুরিই।

কেদার চোখ মিট্‌ মিট্‌ করে বললেন, হ্যাঁ, চিনেচি। চাটুয্যে মশায় না?

—ভাল আছেন?

—তা একরকম আছি।

—এখানে কি চাকুরী করচেন? আপনার মেয়ে কোথায়?

—আমার মেয়ে? ইয়ে—

কেদার যেন একবার ঢোক গিলে তারপর অকারণে হঠাৎ উৎসাহিতের স্বরে বললেন, মেয়ে কলকাতায়—তার মাসীমার—

গোপেশ্বর চাটুয্যে স্বর নিচু করে বললেন, শরৎ মাকে আমার সঙ্গে এনেচি। সে আমার কাছেই আছে—কোনো ভয় নেই।

এই কথা বলার পরে কেদারের মুখের ভাবের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটলো। তাঁর মুখ যেন নিতান্ত নিরীহ ও নির্ব্বোধ লোক ধমক খেলে যেমন হয় তেমন হয়ে গেল। গোপেশ্বর চাটুয্যের মনে হোল এখুনি তিনি যেন হাত জোড় করে কেঁদে ফেলবেন।

বললেন, আমার মেয়েকে—আপনি এনেচেন? কোথায় সে?

—কলকাতায় রেখে এসেচি। কালই আনবো। বসুন, একটু নিরিবিলি জায়গায়—সব বলচি। ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন, কোনো ভয় নেই রাজামশায়। চলুন ওদিকে—বলি সব খুলে।

গোপেশ্বর চাটুয্যে বললেন, আপনার মেয়ে আগুনের মত পবিত্র—

কেদার হা-হা করে হেসে বললেন, ও কথা আমায় বলার দরকার হবে না হে গোপেশ্বর। আমার মেয়ে, আমাদের বংশের মেয়ে—ও আমি জানি।

গোপেশ্বর চাটুয্যে বললেন, রাজামশায় শেষটাতে কি এখানে চকুরী স্বীকার করলেন?

কেদার অপ্রতিভের হাসি হেসে বললেন, ভুলে থাকবার জন্যে, স্রেফ ভুলে থাকবার জন্যে দাদা। এরা আমার বাড়ী যে গড়শিবপুরে তা জানে না। বেহালা বাজাইনি আজ এই দেড় বছর—বেহালার বাজনা যদি কোথাও শুনি, মন কেমন ক'রে ওঠে।

—চলুন, আজই কলকাতায় যাই—

—আমার বড় ভয় করে। ভয়ানক জায়গা—আমি আর সেখানে যাবো না হে, তুমি গিয়ে নিয়ে এস মেয়েটাকে। আজ রাতে এখানে থাকো—কাল রওনা হয়ে যাও সকালে। আমার কাছে টাকা আছে, খরচপত্র নিয়ে যাও। প্রায় সওয়া-শো টাকা এদের গদিতে মাইনের দরুণ এই দেড় বছরে আমার পাওনা দাঁড়িয়েচে। আজ ঘোষমশায়ের কাছে চেয়ে নেবো।

গোপেশ্বর চাটুয্যে পর দিন সকালে কলকাতায় গেলেন এবং তুদিন পরে শরৎকে সঙ্গে নিয়ে স্বরূপপুর ষ্টেশনে নেমে নৌকাযোগে বৈকালে হিংনাড়া থেকে আধক্রোশ দূরবর্ত্তী ছুতারঘাটায় পৌঁছে কেদারকে খবর দিতে গেলেন। শরৎ নৌকাতেই রইল বসে।

সন্ধ্যার কিছু আগে কেদার এসে বাইরে থেকে ডাক দিলেন—ও শরৎ—

শরৎ কেঁদে ছইয়ের মধ্যে থেকে বার হয়ে এল। সে যেন ছেলেমানুষের মত হয়ে গেল বাপের কাছে। অকারণে বাপের ওপর তার এক তুর্জ্জয় অভিমান।

কেদার বড় শক্ত পুরুষমানুষ—এমন সুরে মেয়ের সঙ্গে কথা বললেন, যেন আজ ওবেলাই মেয়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েচে, যেন রোজই দেখা-সাক্ষাৎ হয়।

—কাঁদিস নে মা, কাঁদতে নেই, ছিঃ। কেঁদো না। ভাল আছিস্?

শরৎ কাঁদতে কাঁদতেই বললে, তুমি তো আর আমার সন্ধান নিলে না? বাবা তুমি এত নিষ্ঠুর! আজ যদি মা বেঁচে থাকতো, তুমি এমনি ক'রে ভুলে থাকতে পারতে?

তুজনেই জানে কারো কোনো দোষ নেই, যা হয়ে গিয়েচে তার

ওপর হাত ছিল না বাবা বা মেয়ের কারো—রাগ বা অভিমান সম্পূর্ণ অকারণ।

কেদার অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন, তা কিছু মনে করিস নে তুই মা। আমার কেমন ভয় হয়ে গেল—আমায় ভয় দেখালে পুলিস ডেকে দেবে, তোমায় ধরিয়ে দেবে সে আরও কত কিছু। আমার সব মনেও নেই মা। যাক্, যা হয়ে গিয়েচে, তুমি কিছু মনে কোরো না। চলো আজই গড়শিবপুরে রওনা হই। দেড় বছর বাড়ী যাইনি।

গড়শিবপুরের রাজবাড়ী এই দেড় বছরে অনেক খারাপ হয়ে গিয়েচে।

চালের খড় গত বর্ষায় অনেক জায়গায় ধ্বসে পড়েচে। বাঁশের আড়া ও বাতা উইয়ে খেয়ে ফেলেচে। বাড়ীর উঠোনে এক হাঁটু বন-জঙ্গল—আজ গোপেশ্বর চাটুয্যে ও কেদার অনবরত কেটে পরিষ্কার ক'রেও এখনও সাবেক উঠোন বের করতে পারেন নি।

নিড়ানি ধরে সামনের উঠোনের লম্বা লম্বা মুথো ঘাস উপড়ে তুলতে তুলতে কেদার বললেন, ও মা শরৎ, আমাদের একটু তামাক দিতে পারো?

গোপেশ্বর চাটুয্যে উঠোনের ওপাশে কুক্‌শিমা গাছের জঙ্গল দা দিয়ে কেটে জড় করতে করতে বলে উঠলেন—ও কি রাজামশায়, না না, মেয়েমানুষদের দিয়ে তামাক সাজানো—ওরা ঘরের লক্ষ্মী—না ছিঃ—তামাক আমি সেজে আনচি গিয়ে—

ততক্ষণ শরৎ তামাক ধরিয়ে কলকেতে ফুঁ পাড়চে। দুপুর গড়িয়ে বিকেলের ছায়া ঈষৎ দীর্ঘতর হয়েচে। বাতাসে সদ্য কাটা বনজঙ্গলের

কটুতিক্ত গন্ধ। ভাঙা গড়বাড়ীর দেউড়ির কার্ণিসে বন্য পাখীর কাকলী

তখন ভাবেনি আবার সে দেশে ফিরতে পারবে কখনো, আবার সে এমনিতর বৈকালে বাবাকে নিড়ানহাতে উঠোনের ঘাস পরিষ্কার করতে দেখবে, বাবার তামাক আবার সাজবার সুযোগ পাবে সে।

তামাক দিয়ে শরৎ বললে, বাবা হিম হয়ে বসে থেকো না—এবেলা একটা তরকারী নেই যে কুটি, ব্যবস্থা আগে করো।

কেদার কিছুমাত্র ব্যস্ত না হয়ে বললেন, কেন পুকুরপাড়ে ঝিঙে দেখে এলাম তখন?

কালোপায়রা দীঘির পাড়ে বাঁধানো ঘাটের পাশের ঝোপের মাথায় বন্য ঝিঙে ও ধুঁধুলের লতা বেড়ে উঠেচে, কেদারের কথার লক্ষ্যস্থল সেই বুনো ধুঁধুলের গাছ।

—শুধু ঝিঙে বাবা?

—তাই নিয়ে এসে ভাতে দে—কি বল হে দাদা? হবে না?

গোপেশ্বর চাটুয্যে বনজঙ্গল কাটতে কাটতে একটা ঝালের চারা দায়ের মুখে উপড়ে ফেলেছিলেন, সেটিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে কিছুক্ষণ থেকে প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। অন্যমনস্ক ভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন—খুব, খুব। রাজভোগ ভেসে যাবে।

কেদার বললেন—তবে তাই করো মা শরৎ। ত নিয়ে এসো।

শরৎ কালো পায়রা দীঘির ধারে জঙ্গলে এল ঝিঙে খুঁজতে।

আজই দুপুরবেলা ওরা গরুর গাড়ী করে এসে পৌঁছেচে এখানে। বাপ ও জ্যাঠামশায় সেই থেকে বনজঙ্গল পরিষ্কার নিয়েই ব্যস্ত আছেন। সে নিজে ঘর দোর পরিষ্কার করছিল—এই মাত্র একটু অবসর মিলেচে চোখ মেলে চারিদিকে চাইবার। কালোপায়রা দীঘির টলটলে জলে

রাঙা কুমুদ ফুল ফুটেচে গড়বাড়ীর ভগ্নস্তূপের দিকটাতে। ওই তো বাঁধাঘাট। ঘাটের ধাপে শেওলা জমেচে, কুকৃশিমার জঙ্গল বেড়েচে খুব—কতকাল বাসন মাজেনি ঘাটটাতে বসে! কাল সকালে আসতে হবে আবার।

ছাতিম বনের ছায়ার দিকে চেয়ে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ছাতিম বনের ওপরে ওই উত্তর দেউলের গম্বুজাকৃতি চূড়োটা বনের আড়াল থেকে মাথা বার ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। ছায়া ওপার থেকে এপারে এসে পৌঁছেচে, চাতালের যে কোণে বসে শরৎ বাসন মাজতো, এপারের বটগাছটার ডাল তার ওপরে ঝুঁকে পড়েচে। শরৎ যেন কতকাল পরে এসব দেখচে, জন্মান্তরের তোরণ-দ্বার অতিক্রম ক'রে এ যেন নতুন বার পৃথিবীতে এসে চোখ মেলে চাওয়া বহুকালের পুরোনো পরিচয়ের পৃথিবীতে। কালোপায়রা দীঘির ধারের এমনি একটি সুপরিচিত বৈকালের স্বপ্ন দেখে কতবার চোখের জল ফেলেচে কাশীতে পরের বাড়ী দাসত্ব করতে করতে। দশাশ্বমেধ ঘাটের রানায় সন্ধ্যাবেলা রেণুকার সঙ্গে বসে। রাজগিরিতে গৃধ্রকূট পাহাড়ের ছায়াবৃত পথে মিনুর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে।

সে শরৎ নেই আর। শরৎ নিজের অনুভূতিতে নিজেই বিস্মিত হয়ে গেল। নতুন দৃষ্টি; নতুন মন নিয়ে শরৎ ফিরেচে। পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা যে শরৎসুন্দরীর দৃষ্টি সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিল, আজ বহির্জগতের আলো ও ছায়া, পাপ ও পুণ্যের সঙ্গে সংস্পর্শে এসে যেন শরতের মন উদারতর, দৃষ্টি নবতর দর্শনের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েচে।

ঝিঙে তুলে রেখে এসে শরৎ বার বার দীঘির ঘাটের ভাঙা চাতালে প্রাচীন বটতলায় নানা কারণে অকারণে ছুটে ছুটে আসতে লাগলো শুধু এই নতুন ভাবানুভূতিকে বাব বার আস্বাদ করবার জন্যে। একবার

উপরে গিয়ে দেখলে গ্রামের জগন্নাথ চাটুয্যে কার মুখে খবর পেয়ে এসে পৌঁছে গিয়েচেন। বাবা ও জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে বসে গল্প করচেন।

ওকে দেখে জগন্নাথ বললেন, এই যে মা শরৎ, তা কাশী গয়া অনেক জায়গা বেড়িয়ে এলে বাবার সঙ্গে আর গোপেশ্বর ভায়ার সঙ্গে? ভালো —প্রায় দেড় বছর বেড়ালে।

বুদ্ধিমতী শরৎ বুঝলে এ গল্প জ্যাঠামশায়ই রচনা করেচেন তাদের দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণ নির্দ্দেশ করবার জন্যে। শরৎ জগন্নাথ চাটুয্যের পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করলে।

—এসো, এসো মা যাক্। চিরজীবী হও—তা কোন্ কোন্ দেশ দেখলে

কেদার বললেন, দেড় বছর ধরে তো বেড়ানো হয় নি। আমি মধ্যে চাকরীর করেছিলাম হিংনাড়ার বাজারে ঘোষেদের আড়তে। এই গোপেশ্বর দাদা সপরিবারে পশ্চিমে গেলেন, শরৎকে নিয়ে গিয়েছিলেন—

শরৎ বললে, চা খাবেন জ্যাঠামশায়, যাবেন না বসুন। আমি বাসনগুলো ধুয়ে আনি পুকুরঘাট থেকে।

আবার সে ছুটে এল কালোপায়রা দীঘির পাড়ে ছাতিম বনের দীর্ঘ, ঘন, শীতল ছায়ায়। পুরোনো দিনের মত আবার রোদ রাঙা হয়ে উঠে গিয়েচে ছাতিম গাছের মাথায়। বেলা পড়ে এসেচে। এমন সময়ে দূর থেকে রাজলক্ষ্মীকে আসতে দেখে সে হঠাৎ লুকিয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজলক্ষ্মীর হাতে একটি প্রদীপ, তেল সলতে দেওয়া।

দুজনেই দুজনকে দেখে উচ্ছ্বসিত আনন্দে আত্মহারা।

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে, মানুষ না ভূত, দিদি?

—ভূত, তোর ঘাড় মটকাবো।

তারপর দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরলে।

—শুনিস নি আমরা এসেচি?

—কারো কাছে না। কে বলবে? আমি অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, উঠে এই আসচি—

—কোথায় চলেচিস রে এদিকে।

—তোমাদের উত্তর দেউলে পিদিম দিচ্ছি আজ এই দেড় বছর। বলে গিয়েছিলে মনে নেই?

—সত্যি ভাই?

—না মিথ্যে।

—আর-জন্মের বোন্ ছিলি তুই, এই বংশের মেয়ে ছিলি কোন্ জন্মে।

—এতদিন কোথায় ছিলে তোমরা দিদি?

—কাশীতে। সব বলবো গল্প তোকে। চল—

—আজ পিদিম তুমি দেবে দিদি?

—নিশ্চয়। ভিটেয় যখন এসেচি, তখন তোকে আর পিদিম দিতে হবে না। তবে আমার সঙ্গে চল—

বার

কালোপায়রা দীঘির ওপারের ছাতিমবন নিবিড় হয়েচে, তার ছায়ায় ছায়ায় উত্তর দেউলে যাবার পথে বাদুড়নখী গাছের জঙ্গল তেমনি ঘন, যেমন শরৎ চিরকাল দেখে এসেচে, তবে এখন গাছ শুকিয়ে যায় নি—সবে বেগুনে রংয়ের ফুল ধরেচে বড় বড় সবুজ পাতার আড়ালে। শরৎ আগে আগে প্রদীপ হাতে, রাজলক্ষ্মী পেছনে। কত পরিচিত

পুরোনো পথ, সারা জীবনই যেন অতীব শান্ত ও নিরুপদ্রব আরামে এই বাদুড়নখী গাছের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলেচে সে, তার পিতৃগৃহের পুণ্য আবেষ্টনী তার জীবনের পাথের যুগিয়ে এসেচে—যে জীবনের না রাত্রি, না আছে অরুণোদয়—শুধু এমনি চাপা গোধূলি, হৈচৈহীন, কর্ম্মকোলাহলহীন।

প্রদীপ দিয়ে ওরা আবার ফিরলে। পথের দু-পাশে পুষ্পশ্রীর লীলায়িত চেতনা ওর আগমনে যেন আনন্দিত। কতকাল পরে রাজকন্যা বাড়ী ফিরেচে।

রাজলক্ষ্মী বলে, এঃ দিদি, এ ঘরে বসে রাঁধবে কি ক'রে? জল প'ড়ে মেজে যে একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েচে!

—পিঁড়ি পেতে নেবো এখন। তুই আমার বাপের ভিটের নিন্দে করিস নে বলে দিচ্চি—

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে, সেই ছেলেমানুষি স্বভাব তোমার এখনও যায় নি শরৎদি—

—চা খাবি?

তা খাচ্চি—এখন বলো এতকাল কোথায় ছিলে তোমরা!

—রাজারাজড়ার কাণ্ড, একটু হিল্লিদিল্লী বেড়িয়ে আসা গেল।

—সে তো বুঝতেই পারচি।

—আজ রাত্তিরে এখানে খাবি রাজলক্ষ্মী। কিন্তু কিছু নেই ঘরে, শুধু ধুঁধুল ভাতে, ধুঁধুল ভাজা।

ভাঙা ঘরে দুই তরুণীতে বসে বহুকাল পরে আবার আসর জমালে —ওদিকে দুই বৃদ্ধ উঠোনে দুই কাঁটাল কাঠের পিঁড়ি পেতে বসে অনেকরকম রাজা-উজীর বধের গল্প করছিলেন। জগন্নাথ চাটুয্যে ইতিমধ্যে চলে গিয়েচেন।

—ভাই, জ্যাঠামশায় আর বাবাকে চাটুকু দিয়ে আয় তো—

রাজলক্ষ্মী চা দিতে গেলে কেদার বললেন, আরে আমার যে! আয় আয়—কতকাল পরে দেখলাম ভাল ছিলি?

গোপেশ্বর চাটুয্যেও বললে, হ্যাঁ, এ খুকিকে তো দেখেচি বটে এখানে—কি নাম যেন তোমার মা?

রাজলক্ষ্মী দু-জনের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম ক'রে রান্নাঘরে চলে গেল।

কেদার বললে, দাদা, এবার এখানে কিছু দিন থেকে যাও। এক-সঙ্গে দিনকতক কাটানো যাক—

—শরৎমা বলছিল তীর্থভ্রমণে একবার চলুন বেরুনো যাক রাজামশায়—

কেদার নিশ্চিন্ত আরামে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বললেন, আর কোথাও বেরুতে ইচ্ছে করে না দাদা। বিদেশে বড় গোলমাল—শুনলে তো সবই। আমাদের এই জায়গাটাই ভালো—বাইরে নানারকম ভয়। কেন এখানে ওখানে বেরুনো—আমার হাতে এখনো যা টাকা আছে, এ বছরটা হেসে খেলে চলে যাবে। খাজনা-পত্তর কেউ দেয় নি দুটি বছর—কাল থেকে আবার তাগাদা সুরু করি।

শরৎ নিজে তামাক সেজে আনতেই গোপেশ্বর চাটুয্যে হাঁ হাঁ করে উঠলেন।

—তুমি কেন মা—তুমি কেন? আমাকে বললেই তো হোত—এ সব আমি পছন্দ করিনে, মেয়েদের দিয়ে তামাক সাজানো। রাজামশায়ের তামাক আমি সাজবো।

কেদার বললেন, তুমি আমার বয়সে অনেক বড়, দাদা। আর যে উপকার তুমি করেচ, তার ঋণ আমি বা আমার মেয়ে কেউ শুধতে পারবো না। আমার এ বাড়ীতে যত দিন ইচ্ছে থাকো, তোমার বাড়ী

তোমার ঘর দোর। আমার মেয়ে তোমার আমার তামাক সাজবে এ আর বেশি কথা কি দাদা?

গোপেশ্বর চাটুয্যে বললেন, আচ্ছা রাজামশাই, ওই কালোপায়রা দীঘির ওপারের বন কেটে বেশ আলু হয়—কিছু বীজ এনে—

—না দাদা, ওসব আমাদের বংশে নেই। চাষকাজ করে চাষা লোকেরা। আমার দরকার হয় গড়ের জঙ্গল থেকে মেটে আলু তুলে আনবো। সোজা মেটে আলুটা হয় গড়ের জঙ্গলে? সে বছর উত্তর দেউলের গায়ের বন থেকে আলু তুলেছিলাম এক একটা আধমণ ত্রিশ সের। আলুর অভাব কি আমার?

হঠাৎ জগন্নাথ চাটুয্যেকে পুনরায় আসতে দেখে উচ্চকণ্ঠে বললেন, ও শরৎ, জগন্নাথ খুড়ো আসচেন—আর একটু চা পাঠিয়ে—

জগন্নাথ চাটুয্যে আসতে আসতে বললেন, তুমি বাড়ী এসেচ শুনে অনেকে দেখা করতে আসচে কেদার রাজা। আমি গিয়ে সাতকড়ির চণ্ডীমণ্ডপে খবরটা দিয়ে এলাম—সেই জন্যেই গিয়েছিলাম। ওঃ একটু তেল আনতে বলো তো শরৎকে? বিছুটি যা লেগেচে গায়ে—বড্ড বিছুটির জঙ্গল বেড়েচে গড়ের খালের পথটাতে। ছিলে না অনেক দিন, চারিধার বনজঙ্গল হয়ে—

গোপেশ্বর চাটুয্যে বললেন, কাল আমি সব কেটে সাফ্ করে দেবো—দেবেন তো দেখিয়ে জায়গাটা?

জগন্নাথ চাটুয্যে এসেচেন এদের সব খবর সংগ্রহ করতে। একটু পরেই তিনি বড় বেশি আগ্রহ দেখাতে লাগলেন, এতদিন কোথায় ছিলেন, কি ভাবে কাটলো সে সব খবর জানতে। কেদার বললেন, তুমি কি বরাবর হিংনাড়ায় ছিলে এই দেড় বছর—না আর কোথাও—

—না, আমি—গিয়ে হিংনাড়াতেই—

—কাদের আড়তে বললে?

—ঘোষেদের আড়তে। বিপিন ঘোষ বিনোদ ঘোষ দুই ভাই—ওদেরই—

—মাট্‌সের বিনোদ ঘোষ ?

—মাট্‌সে তো ওদের বাড়ী নয়, শত্রুঘ্নপুর—

—সে আবার কোনদিকে ? নাম তো শুনিনি—

—শত্রুঘ্নপুর বাজিতপুর—রামনগর থানা।

কেদার ক্রমশঃ অস্বস্তি বোধ করছিলেন জগন্নাথ চাটুয্যের জেরায়। এত খুঁটিনাটি জিগ্যেস করবার কি দরকার তিনি বুঝতে পারলেন না। জগন্নাথ চাটুয্যে পরের ছিদ্র অনুসন্ধান ক'রে জীবন কাটিয়ে দিলেন কি না, তাই ভয় হয়।

গোপেশ্বরকে দেখিয়ে জগন্নাথ বললেন, ইনি সেই একবার তোমার এখানে এসেছিলেন না ? চমৎকার হাত তবলার। একদিন শুনতে হবে আবার।

—হ্যাঁ।

—শরৎ বুঝি এঁর পরিবারের সঙ্গে তীর্থ করে এল ?

—হ্যাঁ।

—বেশ বেশ।

জগন্নাথ চাটুয্যে হঠাৎ বললেন, ভাল কথা কেদার ভায়া শুনেচ বোধ হয় প্রভাসের বাবা হারান বিশ্বাস মারা গিয়েছে আজ বছরখানেক হোল। প্রভাসদের কলকাতার বাড়ীতে তোমরা তো প্রথম যাও—না ?

কেদারের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। জগন্নাথ চাটুয্যে কতটা জানে বা না জানে আন্দাজ করা শক্ত। কি ভেবে ও কি কথা বলচে, তাই বা কে জানে ? হঠাৎ প্রভাসের কথা তোলার মানে কি ?

তবুও সত্য কথার মার নেই ভেবে তিনি বললেন, প্রভাসদের বাড়ীতে তো ছিলাম না আমরা। একটা বাগান বাড়ীতে আমাদের থাকবার জায়গা করে দিয়েছিল।

—কতদিন সেখানে ছিলে তোমরা?

—বেশি দিন নয়—দিন পনেরো।

—তার পর কোথায় গেলে?

এইবার জবাব দিলেন গোপেশ্বর চাটুয্যে। বললেন, তার পর একদিন আমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা। আমি ওঁদের সঙ্গে দেখা করলাম বাগান-বাড়ীতে গিয়ে তার পর দিন সকালে। আমার বাড়ীর সকলে তীর্থ করতে বেরিয়েছিল—সেই সঙ্গে শরৎকে নিয়ে গেলাম। রাজামশাই দেশে চলে আসচেন, হিংনাড়ার বাজারে ঘোষেদের আড়তের একজন কর্ম্মচারীর সঙ্গে ওঁর চেনা ছিল—সে নিয়ে গিয়ে চাকুরী জুটিয়ে দিলে। এই হোল মোট ব্যাপার। কেমন এই তো রাজামশাই?

—হ্যাঁ, ওই বৈকি।

দুপুরবেলা। কেউ কোথায় নেই। গোপেশ্বর কালোপায়রার দীঘিতে মাছের চার করতে গিয়েছেন, আহারাদির পর কেদারকে নিয়ে মাছ ধরতে যাবেন।

শরৎ বাবাকে একা পেয়ে বললে, আচ্ছা বাবা আমাকে খোঁজ করলে না কেন?

কেদার এ কথার কি উত্তর দেবেন? এ সব ব্যাপারকে তিনি এড়িয়ে চলতে চান—জীবনের সব চেয়ে বড় ধাক্কাকে তিনি ভুলে যেতে চেষ্টা করে আসচেন—তাঁর সব চেয়ে ভয় মেয়ে পাছে আবার ঐ সব কথা তোলে।

আমতা আমতা করে বললেন, তা—খোঁজ করি কোথায় ? আমার—

—তোমাকে ওরা বলেছিল আমি ইচ্ছে করেই তোমার সঙ্গে দেখা করি নি—না ? বলো বাবা, তা যদি বিশ্বাস করে থাকো আমি তোমার সামনেই দীঘির জলে ডুবে মরবো।

এবার কেদার যেন একটু বিচলিত হোলেন, তাঁর অনড় আত্ম-স্বাচ্ছন্দ্য বোধ এইবার একটু ধাক্কা খেলে। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে তিরস্কারের সুরে বললেন, তাই তুই বিশ্বাস করিস যে আমি ওসব ভাবতে পারি ? দে—একটু তেল দে মাখবার—দেখি আবার গোপেশ্বর ভায়া মাছের চারের কতদূর কি করলে। তোর রান্না হোল ?

—বেশ বাবা, কি নিশ্চিন্দিই থাকতে পারো তুমি, তাই শুধু আমি ভাবি। ঘরে আগুন লাগলেও বোধ হয় তোমার সাড়া জাগে না—মানুষে যে কি করে তোমার মত—আচ্ছা, আর একটা কথা জিগ্যেস করি—উত্তর দেবে ?

কেদার বিষণ্ণ মুখে বললেন, কি ?

—প্রভাসদের নামে তোমাকে কেউ কিছু বলেছিল তো ? সেই মুখপোড়া গিরীনই বলে থাকবে। তুমি পুলিশে খবর দিলে না কেন ?

—তারাই বললে পুলিশে খবর দেবে তোর নামে। তাতেই তো আমি পালিয়ে এলাম।

পুলিশের কাছে নালিশে কে আসামী কে ফরিয়াদী হয় এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা নেই শরতের—ও সব বড় গোলমেলে ব্যাপার। সে চুপ করে রইল।

কেদার বললেন, বড় কষ্ট পেয়েছিস না মা ?

—যাও তোমাকে আর—

—না মা ছিঃ রাগ করতে নেই। কি রাঁধচিস ? বেগুন এনে

দেখো এখন ওবেলা। গেঁয়োহাটি যাবো তাগাদা করতে, ব্যাটারা আজ দু-বছর খাজনার নামটি করেনি।

—করবে কি? তুমি ছিলে এ চুলোয়? মেয়েকে ভাসিয়ে দিয়ে নিজেও ভেসে পড়েছিলে। কি নির্ব্বিকার পুরুষ মানুষ তুমি তাই শুধু ভাবি বাবা।

শরতের এ মেজাজকে কেদারের চিনতে বাকি নেই। এ সময় ওর সামনে থাকতে যাওয়া মানে বিপদ টেনে আনা। কেদার তেল মেখে সরে পড়লেন। বাবাকে যতক্ষণ দেখা গেল শরৎ চেয়ে চেয়ে দেখলে, তারপর তিনি কালোপায়রা দীঘির পাড়ের বন-ধুঁধুলের লতা-জালের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলে শরৎ দুই হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো। তার বাবা, তাদের বনজঙ্গলে ঘেরা এত বড় গড়বাড়ী, কত পুরানো ভাঙ্গা মন্দির, উত্তর দেউল, বারাহী দেবীর ভগ্ন পাষাণমূর্ত্তি, ওই ছায়ানিবিড় ছাতিম-বন—এ-সব ফেলে তাকে কোথায় চলে যেতে হয়েছিল ভাগ্যের বিপাকে! আর যদি সে না ফিরতো, আর যদি বাবাকে না দেখতো, গড়বাড়ীর মাটির পুণ্যস্পর্শ-লাভের সৌভাগ্য যদি আর না ঘটতো তার?

কাঁর পায়ের শব্দে সে মুখ তুলে দেখলে রাজলক্ষ্মী একটা বাটি হাতে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠচে। এই আর একটি মানুষ—যাকে দেখে শরৎ এত আনন্দ পায়। দেড় বছরের মধ্যে কত জায়গা সে বেড়াল কত নতুন নতুন মেয়ের সঙ্গে আলাপ হোল—কিন্তু এমন কি একটা দিনও গিয়েচে যেদিন সে এই গরীব ঘরের মেয়েটার কথা ভাবে নি?

—কি রে ওতে?

—তোমাদের জন্যে একটু সুক্তুনি—মা বললেন জ্যাঠামশায়কে দিয়ে আয়—

—খাওয়া হয়েচে?

—পাগল! এখুনি খাওয়া হবে? তোমাদের এখান থেকে গিয়ে নাইবো—তার পর—

—আর বাড়ী যায় না, এখানেই খা—

—না না শরৎ-দি—

—খেতেই হবে। আচ্ছা, কেন অমন করিস বলতো? কত্তকাল তুই বোনে বসে একসঙ্গে খাইনি তা তোর মনে পড়ে? মোটে কাল আর আজ যদি হয়—সত্যি ভাই, বিশ্বাস এখনও যেন হচ্ছে না যে, আমি আবার গড়শিবপুরের ভিটিতে বসে আছি। একযুগ পরে আবার এ মাটিতে—

রাজলক্ষ্মীকে শরৎ এখনও সব কথা খুলে বলে নি। রাজলক্ষ্মীও ওকে খুঁটিনাটি কিছুই জিগ্যেস করেনি প্রথম আনন্দের উত্তেজনায়। শরৎ মনে মনে ঠিক করে রেখেছে রাজলক্ষ্মীকে সে অবসর সময়ে সব খুলে বলবে। বন্ধুত্বের মধ্যে দেওয়াল তুলে রাখা তার পছন্দ হয়না।

শরৎ বললে, এই দেড় বছরে গাঁয়ের খবর বল—কিছুই তো জানিনে।

—চিন্তে বুড়ী মরে গিয়েছে জানো?

—আহা, তাই নাকি? কবে মোলো?।

—ফাল্গুন মাসে। গুরুপদ জেলের সেই হাবা ছেলেটা মরে গিয়েছে আষাঢ় মাসে। ম্যালেরিয়া জ্বর।

—আহা!

—পাঁচী গয়লানীর বাড়ী চোর ঢুকে সব বাসন নিয়ে গিয়েছিল। থানার দারোগা এল, এর নাম লিখলে, ওর নাম লিখলে—কিছুই হোল না শেষটা।

—ভাল কথা, ওপাড়ার সেজখুড়ীমার ছেলেপিলে হবে দেখে গিয়েছিলাম—

—একটা ছেলে হয়েচে—বেশ ছেলেটি। দেখতে যাবে কাল?

—বেশ তো চল না। সাতকড়ি চৌধুরীর মেয়ের বিয়ে হয়েছে?

—কেন হবে না? হাতে পয়সা আছে—মেয়ের বিয়ে বাকি থাকে?

শরৎ হেসে বললে, কেন রে, তোর বুঝি বড় দুঃখু—বিয়ে না হওয়ায়?

—কার না হয় শরৎ-দি, যদি সত্যি কথা বলা যায়। যেমনি মা হিম হয়ে বসে আছে, তেমনি মেজখুড়ীমা হিম হ'য়ে বসে আছে—আমার এ দিকে আঠারো পেরুলো, লোকের কাছে বলে বেড়ান পনেরোতে নাকি পা দিইচি। এমন রাগ ধরে!

শরৎ হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি।

—ওমা, তুই হাসালি রাজলক্ষ্মী! আজকালকার মেয়ে সব হোল কি? সত্যিরে তোর মনে কষ্ট হয়?

—ঐ যে বললাম দিদি, সত্যি কথা বললে হাসবে সবাই। তুমি বললে, তাই বললাম।

—আমি দেখবো রে তোর সম্বন্ধ?

—না হাসি না শরৎ-দি। এতদিন তুমি ছিলে না—আমার মন পাগল পাগল হয়ে উঠতো। এই গাঁয়ে একঘেয়ে থাকলে মানুষ পাগল হয়ে যায় না তুমিই বলো। তার চেয়ে মনে হয়—যা হয় একটা দেখে শুনে দে, একঘেয়েমির হাত থেকে নিস্তার পাই। জন্মালাম গড়শিবপুর, তো রয়েই গেলাম সেই গড়শিবপুরে। এই যে তুমি কত দেশ বেড়িয়ে এলে শরৎ-দি, কেন বেড়িয়ে এলে? নতুন জিনিস দেখবার জন্যে তো?

শরৎ গম্ভীর সুরে বললে, আমার কপাল দেখে হিংসে করিস্ নে ভাই। তোকে সব খুলে বলবো সময় পেলে।

রাজলক্ষ্মী বিস্ময়ের সুরে বললে, কেন শরৎ-দি।

—সে কথা এখন না ভাই—বাবা আসচেন, সরে আয়—

কেদার গামছায় মাথা মুছতে মুছতে বললেন, কে ও? রাজলক্ষ্মী? বেশ মা বেশ। হ্যাঁ ভাল কথা শরৎ—মনে পড়লো নাইতে নাইতে—তোর মায়ের সেই কড়িগুলো কোথায় আছে মা?

শরৎ হেসে বললে, কোনো ভয় নেই বাবা। লক্ষ্মীর হাঁড়িতেই আছে। প্রথম দিন এসেই আমি আগে দেখে নিয়েচি। ঠিক আছে।

—ও, তা বেশ। আর—ইয়ে—তোর মার সেই ভাঙা চিরুণীখানা?

—সেই গোল তোরঙ্গের মধ্যে রেখে গিয়েছিলাম, সেইখানেই আছে। সেও দেখে নিয়েচি সেদিন।

—ইয়ে, ডাকি তবে গোপেশ্বর দাদাকে? রান্না হয়েচে তো?

কেদার আবার গেলেন পুকুরপাড়ে গোপেশ্বর চাটুয্যেকে ডাকতে। শরৎ মৃদু হেসে রাজলক্ষ্মীকে বললে, দুটি নিষ্কর্মা আর নিশ্চিন্দি লোক এক জায়গায় জুটেচে, জ্যাঠামশায় আর বাবা—দুই-ই সমান। দুটিতে জুড়ি মিলেচে ভালো।

কেদার বলতে বলতে আসছিলেন—বেয়ালা বাজাই নি আজ দেড় বছর দাদা। তারগুলো সব ছিঁড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েচে। আজ ওবেলা ছিবাসের ওখানে আসর করা যাক গিয়ে। তোমার তবলাও অনেক দিন শোনা হয় নি।

তেরো

দিন দশ পনেরো কেটে গেল।

এদিনগুলো কেদার ও গোপেশ্বরের কাটলো খুব ভালই। ছিবাস মুদির, দোকানে প্রায়ই সন্ধ্যার পরে ছেঁড়ামাদুর আর চট পেতে আসর জমে, কেদার এসেছেন শুনে তাঁর পুরোনো কৃষ্ণযাত্রা দলের দোহার, জুড়ি, একানে গায়কেরা কেউ জাল রেখে, কেউ লাঙল ফেলে ছুটে আসে।

—রাজামশাই? ভাল ছেলেন তো? এট্টু পায়ের ধূলো দ্যান—

—বাবাঠাকুর, এ্যাদ্দিন ছেলেন কনে? মোদের দল যে একেবারে কানা পড়ে গেল আপনার জন্যি?

গেঁয়োহাটি কাপালী পাড়ার মধু কাপালী, নেত্য কাপালী এসে পীড়াপীড়ি—গেয়োহাটীতে একবার না গেলে চলবে না। সবাই রাজা মশাইকে একবার দেখতে চায়। এদের ওপর কেদারের যথেষ্ট আধিপত্য, অন্য সময় যে কেদার নিতান্ত নিরীহ—এদের দলের দলপতি হিসেবে তিনি রীতিমত কড়া ও উগ্র মেজাজের শাসক।

মধুকে ডেকে বলেন, তোর যে সেই ভাইপো দোয়ার দিতো সে কোথায়?

—আজ্ঞে সে পাট কাটচে মাঠে—

কেদার মুখ খিচিয়ে বলেন, পাট তো কাটচে বুঝতে পারচি, চাষার ছেলে পাট কাটবে না তো কি বড় গাইয়ে হবে? কাল একবার ছিবাসের এখানে পাঠিয়ে দিও তো? বুঝলে?

—যে আজ্ঞে রাজামশাই—

—আর শশীকে খবর দিও, দু'বছরের খাজনা বাকী। খাজনা দিতে হবে না? নিষ্কর জমি ভোগ করতে লাগলো যে একেবারে—

নেত্য কাপালী এগিয়ে এসে বললে, বাবাঠাকুর, আপনি যদি বাড়ী থাকতেন, তবে সবই হোত। তারা খাজনা নিয়ে এসে এসে ফিরে গিয়েল—

কেদার ধমক দিয়ে বললেন, তুই চুপ কর—তোকে ফোঁপল দালালি করতে বলেচে কে?

কেদারের নামে বহু লোক জড় হয় ছিবাসের দোকানে—কেদারের বেহালার সঙ্গে মিশেচে ওস্তাদ গোপেশ্বরের তবলা! পাড়াগাঁয়ে নিঃসঙ্গ দিনে রাত্রে সময় কাটাবার এতটুকু সূত্রও যারা নিতান্ত আগ্রহে আঁকড়ে ধরে—তাদের কাছে এধরণের গুণী-সম্মেলনের মূল্য অনেক বেশী। দু-তিনখানা গ্রাম থেকে লোকে লণ্ঠন হাতে লাঠি হাতে জুতো বগলে করে এসে জোটে। সেই পুরোনো দিনের মত অনেক রাত্রে দু'জনেই অপরাধীর মত বাড়ী ফেরেন।

শরৎ বলে—এলে? ভাত জুড়িয়ে জল হয়ে গিয়েচে—

গোপেশ্বর আমতা আমতা করে বলেন—আমি গিয়ে বললাম মা রাজামশায়কে—যে শরৎ বসে থাকবে হাঁড়ি নিয়ে—তা হয়েচে কি, উনি সত্যিকার গুণী লোক, ছড়ে ঘা পড়লে আর স্থির থাকতে পারেন না। জ্ঞান থাকে না মা—

কেদার গোপেশ্বরের পেছনে দাঁড়িয়ে মনে মনে কৈফিয়ৎ তৈরি করেন।

শরৎ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে—আপনি জানেন না জ্যাঠামশায়, বাবার চিরকাল একরকম গেল আর যাবেও—আজ বলে না, কোন কালে ওঁর ছিল জ্ঞান ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন না?

গোপেশ্বর মিটমাটের সুরে বলেন, না না কাল থেকে রাজামশাই আর দেরি করা হবে না। শরতের বড্ড কষ্ট হয়, কাল থেকে আমি সকাল সকাল নিয়ে আসবো মা, রাত করতে দেবো না—

এই দুই বৃদ্ধের ওপর শাসন দণ্ড পরিচালনা করে শরৎ মনে মনে খুব আমোদ পায় এবং এঁদের সঙ্কোচজড়িত কৈফিয়তের সুরে যথেষ্ট কৌতুক অনুভব করে—কিন্তু কোনো তর্জ্জন-গর্জ্জনেই বিশেষ ফল হয় না, প্রতি রাত্রেই যা তাই—সেই রাত একটা। নির্জ্জন গড়বাড়ীর জঙ্গলে ঝিঁ ঝিঁ পোকার গম্ভীর আওয়াজের সঙ্গে মিশে শরতের শাসন-বাক্য বৃথাই প্রতি রাত্রে নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে।

শরৎ বলে—আজ কিছু নেই বাবা, কি দিয়ে ভাত দেবো তোমাদের পাতে? হাট না, বাজার না, একটা তরকারি নেই ঘরে, আমি মেয়ে মানুষ যাবো তরকারি যোগাড় করতে? ওল তুলে ছিলাম কালো পায়রার পাড় থেকে এক গলা জঙ্গলের মধ্যে—তাই ভাতে আর ভাত খাও—এত রাত্তিরে কি করবো আমি?

কেদার সঙ্কুচিত ভাবে বল্লেন, ওতেই হবে—ওতেই হবে—

—তুমি না হয় বললে ওতেই হবে। জ্যেঠামশায় বাড়ীতে রয়েচেন, ওঁর পাতে শুধু ওল ভাতে দিয়ে কি করে—

গোপেশ্বর তাড়াতাড়ি বল্লেন, যথেষ্ট মা যথেষ্ট। তুমি দাও দিকি? ভেসে যাবে—কাঁচালঙ্কা দিয়ে ওল ভাতে মেখে এক পাথর ভাত খাওয়া যায় মা—

তবে খান। আমার আপত্তি কি?

—কাল গেঁয়োহাটির হাট থেকে আমি ঝিঙে পটল আনবো দুটো—মনে করে দিও তো?

শরতের কি আমোদই লাগে! কতদিন পরে আবার পুরাতন জীবনের পুনরাবৃত্তি চলছে—আবার যে প্রতি নিশীথে গড়বাড়ীর জঙ্গলের মধ্যে তাদের ভাঙ্গা বাড়ীতে সে একা শুয়ে থাকবে; বাবা এসে অপ্রতিভ কণ্ঠে বলবেন—ও মা শরৎ দোর খুলে দাও মা, এ সব কখনো হবে বলে তার বিশ্বাস ছিল?

সেই সব পুরোনো দিন আবার ঠিক সেই ভাবেই ফিরে এসে চে……

—জ্যাঠামশায়ের জন্যে একটু দুধ রেখেচি—ভাতক'টা ফেলবেন না জ্যাঠামশায়—

গোপেশ্বর ব্যস্তভাবে বললেন, কেন আমি কেন—রাজা মশায়ের দুধ কই ?

—বাবার হবে না। দু-হাতা দুধ মোটে—

—না না সে কি হয় মা ? রাজা মশায়ের দুধ ও থেকেই—

কেদার ধীর ভাবে বললেন, আমার দুধের দরকার নেই। আমরা রাজা-রাজড়া লোক, খাই তো আড়াইসের মেরে একসের করে খাবো। ও দু-এক হাতা দুধে আমাদের—

কথা শেষ না করেই হা হা করে প্রাণখোলা উচ্চ হাসির রবে কেদার রান্নাঘর ফাটিয়ে তুললেন।

এই রকম রাত্রে একদিন গোপেশ্বর ভয় পেলেন কালো পায়রা দীঘির পাড়ের জঙ্গলে। বেশী রাত্রে তিনি কি জন্যে দীঘির পাড়ের দিকে গিয়েছিলেন—সে দিন আকাশে একটু মেঘ ছিল, ঘুম ভেঙে তিনি রাত কত তা ঠিক আন্দাজ করতে পারলেন না। দীঘির জঙ্গলের দিকে একাই গেলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে কোথায় যেন পদক্ষেপের শব্দ তাঁর কানে গেল—গুরুগম্ভীর পদক্ষেপের শব্দ। উৎকর্ণ হয়ে কিছুক্ষণ শুনে গোপেশ্বরের মনে হোল তাঁরই কাছাকাছি গভীর বন-ঝোপের মধ্যে কে যেন সাবধানের সঙ্গে ধীরে ধীরে পা ফেলে চলেচে—তাঁর দিকেই ক্রমশঃ এগিয়ে আসচে নাকি ? চোর-টোর হবে কি তাহোলে ? না কোনো ছাড়া গরু বা ষাঁড়—

কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে হোল এ পায়ের শব্দ মানুষের নয়—গরু বা ষাঁড়েরও নয়। পদশব্দের সঙ্গে কোনো কঠিন জিনিসের যোগ আছে—খুব ভারি ও কঠিন কোনো জিনিস।

এক-একবার শব্দটা থেমে যায়···হয় তো এক মিনিট···তার পরেই আবার···

হঠাৎ গোপেশ্বরের মনে হোল শব্দটা যেন তাঁকেই লক্ষ্য ক'রে হোক বা নাই হোক—মোটের ওপর খুব কাছে এসে গিয়েচে। তিনি আর কালবিলম্ব না করে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে নিজের ঘরে ঢুকতেই পাশের বিছানা থেকে কেদার জেগে উঠে বললেন, কি, কি—অমন করচ কেন দাদা?

—ইয়ে, একবার বাইরে গিয়েছিলাম—কিসের শব্দ—তাই ছুটে চলে এলাম—কেমন যেন গা ছম্ ছম্—

—শব্দ? ও শেয়াল-টেয়াল হবে—

—না দাদা মানুষের পায়ের শব্দ মত, ভারি পায়ের শব্দ—যেন ইট পড়ার মত—

কেদার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, হুঁ। আজ কি তিথি?

তা কি জানি, তিথি-টিথির কোন খোঁজ রাখি নে তো···

···হুঁ। নাও শুয়ে পড় দাদা···একটা কথা বলি। অমন একা রাত্তির বেলা যেখানে-সেখানে যেও না···দরকার হয় আমায় ডাক দিও!

রাজলক্ষ্মী দুপুরবেলা হাসি মুখে একখানা চিঠি হাতে ক'রে এসে বললে, ও শরৎদি, তোমার নামে কে চিঠি দিয়েচে ছাখো—

শরৎ সবিস্ময়ে বললে, আমার নামে! কে আনলে?

—দাদার সঙ্গে পিওনের দেখা হয়েছিল বাজারে—তাই দিয়েচে—

—দেখি দে—

—কোথাকার ভাবের মানুষ চিঠি দিয়েচে দ্যাখো খুলে—

বলে রাজলক্ষ্মী দুষ্টমির হাসি হাসলে।

শরৎ ভ্রুকুটি করে বললে, মারবো থ্যাংরা মুখে যদি ও রকম বলবি—তোর ভাবের মানুষেরা তোকে চিঠি দিক গিয়ে—জন্ম-জন্ম দিক গিয়ে—

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক শরৎদি, তাই বলো—তাই যেন হয়।

—ওমা, অবাক করলি যে রে রাজি? সত্যি তাই তোর ইচ্ছে নাকি?

—যদি বলি তাই?

—ও মা আমার কি হবে!

—অমন বোলো না শরৎদি। তুমি এক ধরণের মানুষ তোমার কথা বাদ দিই—কিন্তু মেয়েমানুষ তো, ভেবে ছাখো। আমার বয়েস কত হয়েচে হিসেব রাখো?

শরৎ সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বললে, কেউ আটকে রাখতে পারবে না যেদিন ফুল ফুটবে, বুঝলি রাজি? কাকাবাবুর হাতে পয়সা থাকলে কি আর এতদিন—ফুল যে দিন ফুটবে—

—ফুল ফুটবে ছাতিমতলার শ্মশান সই হলো—নাও তুমিও যেমন! খোলো চিঠিখানা দেখি—

শরৎ চিঠি খুলে পড়ে বললে, কাশী থেকে রেণুকা চিঠি দিয়েচে—বাঃ—

—সে কে শরৎদি?

—সে একটা অন্ধ মেয়ে। বিয়ে হয়েচে অবিশ্যি। গরীব লোক। এ চিঠি তার বরের হাতে লেখা, সে তো আর লিখতে—

—কাশীতে থাকে? কি করে ওর বর?

—চাকুরী করে কোথায় যেন—

—দেখতে কেমন?

কে দেখতে কেমন ? মেয়েটা না তার বর ?

—দুই-ই—

—রেণুকা দেখতে মন্দ নয়, বয় তার চেয়েও ভাল—ছোকরা বয়েস লোক ভালই ওরা। দ্যাখ না চিঠি পড়ে।

—অন্ধ মেয়েরও বিয়ে আটকে থাকে না, যদি কপাল ভাল হয়—

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ। তোর আর বকামি করতে হবে না—পড় চিঠি—

রেণুকা অনেক দুঃখ করে চিঠি লিখেচে। শরৎ চলে গিয়ে পর্য্যন্ত সে একা পড়েচে, আর কে তার ওপর দয়া করবে, কে তার হাত ধরে বেড়াতে নিয়ে যাবে ? ওঁর মোটে সময় হয় না। তার মন আকুল হয়েচে শরৎকে দেখবার জন্যে, রাজকন্যা কবে এসে কাশীতে 'কেদার ছত্র' খুলচে ? এলে যে রেণুকা বাঁচে—ইত্যাদি।

চিঠি পড়ে শরৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। অসহায়া অভাগী রেণুকা ! ছোট বোনটির মত কত যত্নে শরৎ তাকে নিয়ে বেড়াতো—কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট, জলে ভাসমান নৌকা ও বজরার ভিড়, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে সান্ধ্য আরতির ঘণ্টা ও নানা বাদ্যধ্বনি।···রেণুকার করুণ মুখখানি। এখানে বসে সব স্বপ্নের মত মনে হয়। খোকা—খোকনমণি ! রেণুকা খোকনের কথা কিছু লেখে নি কেন ? কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হোল রেণুকাকে কে বক্সীদের বাড়ী নিয়ে যাবে হাত ধরে অত দূরে ? তাই লিখতে পারে নি।

রাজলক্ষ্মী কৌতুহলের সঙ্গে নানা প্রশ্ন করতে লাগলো কাশী ও সেখানকার মানুষ-জন সম্বন্ধে, বহির্জগৎ সম্বন্ধে। শরৎ বিরাট অন্নসত্র-গুলোর গল্প করলে, রাজরাজেশ্বরী, আমবেড়ে, কুচবিহারের কালীবাড়ী।

হেসে বললে, জানিস্ এক বুড়ী তৈলঙ্গিদের ছত্তরকে বলতো তুণ্ডুমুণ্ডুদের ছত্তর ?

তৈলঙ্গি কারা ?

—সে আমিও জানি নে—তবে তাদের দেখেছি বটে।

রাজলক্ষ্মী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। বাইরের জগৎ মস্ত একটা স্বপ্ন। জীবনে কিছুই দেখা হোল না, একেবারে বৃথা গেল জীবনটা। শরৎদি'র ওপর হিংসে না হয়ে পারে ?

চৌদ্দ

কেদার ও গোপেশ্বর দুজনে মিলে খেটে বাড়ীর উঠানটা অনেকটা পরিষ্কার করে তুলেচেন, কেদার তত নন, বলতে গেলে গোপেশ্বরই খেটেচেন বেশি। শরৎকাল পড়েচে, পূজার দেরী নেই, গোপেশ্বর একদিন উঠানের এক ধার খুঁড়ে কতকগুলো কচুর চারা পুঁতচেন, কেদার মহাব্যস্ত হয়ে এসে বললেন, দাদা, এসো—ওসব ফেলে রাখো—

—কি রাজামশায় ?

—আরে একটা নতুন রাগিণীর সন্ধান পেয়েচি একজনের কাছে। মুখুয্যে-বাড়ীতে জামাই এসেচে—ভাল গায়ক। দেওগান্ধার ওর কাছে আদায় করতে হবে। থাকবে এখন কিছু দিন এখানে, চলো দু'জনে যাই—

—দেবে কি রাজামশাই ? ও-সব লোক বড় কষ্ট দেয়। আমি কাশীতে এক ওস্তাদের কাছে বড় আশা করে যাই। একখানা ভীমপলশ্রীর আস্তাই দিলে অতি কষ্টে তো মাসাবধি অন্তরা আর দেয় না। কত খোসামোদ, কেবল বলে, অন্তরা এক মিনিটে নাকি হয়ে যাবে। হায়রাণ হয়ে গেলাম হাঁটাহাটি করে।

—পেলে?

—কোথায় পেলাম? আদায় করা গেল না শেষ পর্য্যন্ত। সেই থেকে নাকে কানে খৎ—ওস্তাদের কাছে আর যাবো না—

—যা হোক চলো দাদা। এ আমাদের গাঁয়ের জামাই—ওকে নিয়ে এক দিন মজলিস করা যাক—অনেক দিন থেকে দেওগান্ধারের খোঁজ করচি। ধরা যাক্ চলো—ওখানে কি হচ্চে?

—মানকচুর চারা লাগিয়ে রাখলাম গোটাকতক। সামনের বছরে এক-একটা কচু হবে দেখবেন কত বড় বড়। আপনার ভিটের এ জমিতে এক-একটা মানকচু—

—জানি দাদা। ও এখন রাখো, হবে পরে। ও শরৎ—

শরৎ রান্নাঘর থেকে বার হয়ে এসে বললে, কি বাবা?

—আমাদের দুজনকে একটু তেল দেও মা। রান্নার কতদূর?

—ওলের ডালনা চড়েচে—নামিয়ে ভাত চড়াবো। তা হলেই হোয়ে গেল—

—হাঁ মা, রাজলক্ষ্মী এসেচে?

—না আজ আসে নি এখনো। কেন?

—না, বলছিলাম, মুখুয্যে-বাড়ী জামাই এসেচে, ভদ্রেশ্বর বাড়ী, কেমন লোক তাই তাকে জিগ্যেস করতাম।

—সে খোঁজে তোমার কি দরকার? সে ভাল হোক মন্দ হোক—

—তুই তা বুঝবি নে, বুঝবি নে। অন্য কাজ আছে তার কাছে। যদি এর মধ্যে রাজলক্ষ্মী আসে—

মুখুয্যে-বাড়ী কোন্ জামাই বাবা? আশাদিদির বর? আশাদিদির শ্বশুরবাড়ী তো ভদ্রেশ্বর—

—তাই হবে।

—সে তো বুড়ো মানুষ। আশাদিদিকে বিয়ে করেচে দোজপক্ষে—

—তোর সে সব কথায় দরকার কি বাপু? বুড়ো হয়, আরও ভালো।

—বল না, কেন বাবা—

—নাঃ, সে তুই শুনে কি করবি?

—না আমি শুনবো—

—শুনবি? রাগিণী ভূপালী, বাদী গান্ধার, বিবাদী মধ্যম' আর নিখাদ—সম্বাদী ধৈবত—আরও শুনবি? রাগিণী আশাবরী—বাদী—

—থাক্ আর শুনে দরকার নেই—নেয়ে এসে ভাত খেয়ে আমায় খোলসা করে দিয়ে যত ইচ্ছে রাগিণী শেখো—

বেলা পড়ে গেল। ঘরের তালকাঠের আড়াতে কলাবাদুর ঝুলচে যেন শরৎ আবাল্য দেখে এসেচে। কেদার ও গোপেশ্বর আহারাদি সেরে অন্তর্হিত হয়েচেন, মধ্যরাত্রে যদি ফেরেন তবে শরতের সৌভাগ্য। রাজলক্ষ্মীর জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকে সে। তবুও দুজনে গল্প করে সময় কাটে। রোজ রোজ বাবার এই কাণ্ড। ভালও লাগে!'

এমন সময় কে বাইরে থেকে ডাকলে—ও শরৎ, শরৎ—

শরৎ বাড়ীর দাওয়ায় উঁকি মেরে দেখে বললে—কে? ও বটুক-দা, ভাল আছেন? আসুন—

বটুককে শরৎ কোনো কালেই ভাল চোখে দেখতো না। সেই বটুক, যে এক সময়ে শরতের প্রতি অনেক অসম্মানজনক ব্যবহার করেছিল, রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে যে বটুকের সম্বন্ধে সে যুগে কলকাতায় যাবার পূর্ব্বে শরৎ আলচনা করেছিল এক বার।

বটুক একটু ইতস্ততঃ করে বললে—শুনলাম তোমরা এসেচ—কাকা এসেচেন, তাই একবার দেখা করতে—

শরৎ আগেকার মত নেই—জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে অনেক সাহসী ও সহিষ্ণু করে দিয়েচে। আগেকার দিন হোলে শরৎ বটুকের সঙ্গে

বেশিক্ষণ কথাও বলতো না এ নিশ্চয়। আজ শরৎ দাওয়ায় একখানা পিঁড়ি পেতে বটুককে বসতে বললে।

বটুক একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল, শরতের কাছ থেকে এ আদর সে আশা করে আসেনি এখানে। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে অবশেষে বসলো। শরৎ তাকে চা করে খাওয়ালে। বললে—দুটি মুড়ি খাবে বটুক-দা? আর তো কিছু নেই ঘরে। তুমি এলে এত দিন পরে—

—থাক্, থাক্ সে জন্যে কিছু নয়। আমি দেখতে এলাম, বলি দেখা হয়নি কত দিন। আচ্ছা, শুনলাম নাকি কত দেশ-বিদেশে বেড়িয়ে এলে?

—তা বেড়ালাম বই কি। রাজগির, কাশী—

—কাকা নিয়ে গিয়েছিলেন বুঝি?

জ্যাঠামহাশয়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম—ঐ যিনি আমাদের এখানে আছেন—

—তা বেশ, বেশ।

এই সময় দূরে রাজলক্ষ্মীকে আসতে দেখে বটুক তাড়াতাড়ি উঠে বিদায় নিলে। শরৎ বললে—আর এক দিন এসো, বাবার সঙ্গে তো দেখা হোল না। বাবা থাকতে এসো একদিন—

রাজলক্ষ্মী চেয়ে বললে—ও এখানে কি জন্যে এসেছিল? বটুক-দা তো লোক ভাল না—

—কি মতলব নিয়ে এসেছিল কি করে বলব বল? এলো—বসতে দিলাম, চা করে দিলাম—

—না—না শরৎদি, জানো তো—ওসব লোকের সঙ্গে কোনো মেলামেশা না করাই ভালো। তুমি তো জানো না ওর কাণ্ড। তোমরা চলে যাওয়ার পর ও গাঁয়ে যে-সব কাণ্ড করেচে, সে শুনলে তুমি কানে আঙুল দেবে। অতি বদ লোক। কি মতলব নিয়ে এসেছিল কে জানে?

—তা তো বুঝলাম, কিন্তু আমার বাড়ী এলো, আমি কি বল্লে না বসাই? তা তো হয় না। আমায় আমার কাজ করতেই হবে।

—সেই যে প্রভাস কামার তোমাদের মোটরে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল, সে লোকটাও ভাল না, পরে শুনলাম। বটুক-দা প্রভাসের খুব বন্ধু ছিল আগে—তবে এখন অনেক দিন আর তাকে এ গাঁয়ে দেখি নি। তোমরা চলে গেলে একবার এসেছিল যেন।

শরতের মুখ হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল, সে তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়লে একথা চাপা দিয়ে। বললে—চল্। দীঘির পাড় থেকে গোটাকতক ধুঁধুল পেড়ে আনি—কিছু তরকারি নেই, বাবাকে বলা না বলা দুই সমান—

রাজলক্ষ্মী বললে, আর কোথাও যেওনা শরৎদি, দুটি বোনে এই গাঁয়ে কাটিয়ে দিই জীবনটা। আমারও যা হবে, সে বেশ দেখতেই পাচ্চি। তুমি থাকলে বেশ লাগে।

—খারাপ কি বল্ না? আমি কত জায়গায় গেলাম, কিন্তু তোকে ছেড়ে—কালোপায়রার দীঘি ছেড়ে—

—যা বলেচ শরৎদি। তুমি এসেচ, আমি আর কোথাও যেতে চাই নে, স্বর্গেও না। দুজনে পা ছড়িয়ে বসে গল্প করি—

—আর চাল-ছোলা ভাজা খাই—না রে? ভাজি দুটো চাল-ছোলা?

—না না শরৎদি। ঐ তোমার পাগলামি—

—পাগলামি নিয়েই জীবন। আয় আমার সঙ্গে রান্নাঘরে, তার পর আবার দু'জনে এসে বসবো।

রাজলক্ষ্মী আজকাল সর্ব্বদা শরতের সঙ্গে থাকতে ভালবাসে। সন্ধ্যার আগে একাই বাড়ী চলে যায়, শরৎদিদির মুখে বাইরের জগতের কথা শুনতে ওর বড় আগ্রহ, যে একঘেয়ে জীবন আবাল্য সে কাটাচ্চে গড়শিবপুরে, যার জন্যে তার মনে হয় এ একঘেয়েমির চেয়ে যে কোনো

জীবন বান্ধবীয়, যে কোনো ধরণের—শরৎদিদি আজ কিছু দিন হোল বিদেশ থেকে ফিরে সেই একঘেয়ে আবেষ্টনীর মধ্যে যেন আগ্রহ ও নতুনত্বের সঞ্চার করেচে। তা ছাড়া জীবনে শরৎদিদিই তার একমাত্র ভালবাসার লোক, ও দূরে চলে যাওয়াতে রাজলক্ষ্মীর জীবন শূন্য হয়ে পড়েছিল, এখন আবার গড়বাড়ীতে এসে, ওর সঙ্গে বসে গল্প করে, ওর সামান্য কাজকর্মে সাহায্য করে রাজলক্ষ্মীর অবসরক্ষণ ভরে ওঠে।

শরৎ বললে, রেণুকার চিঠির জবাব দিলাম অনেক দিন, উত্তর তো এল না?

—আসবে। অত ব্যস্ত কেন? দিন দশেক হোল মোটে জবাব গিয়েচে? ঠিকানা লেখা ঠিক হয়েছিল তো?

—ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন জ্যাঠামশায়। উনি কি আর ভুল করবেন? আমার মন বড় কেমন করে খোকনমণির জন্যে। সে যদি চিঠি লিখতে পারতো আমায় নিজের হাতে—

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে, একেই বলে মায়া। কোথাকার কে তার ঠিক নেই—

শরৎ ব্যথা-কাতর কণ্ঠে বললে, অমন বলিস নে রাজি। তুই জানিসনে, সে আমার কি। কেন তাকে ভুলতে পারিনে তাই ভাবি। কখনো অমন হয় নি আমার, কাশীতে থাকবার শেষ একটা মাস যা হয়েছিল। খোকাকে না দেখলে পাগলের মত হয়ে যেতাম, বুঝলি? কষ্টও যা গিয়েচে! আচ্ছা বল তো, সত্যিই সে আমার কে? অথচ মনে হোত কত জন্মের আপনার লোক সে, তার মুখ দিনান্তে একবার না দেখলে—ভালই হয়েচে রাজি, সেখানে বিশিদিন থাকলে মায়ায় বড্ড জড়িয়ে পড়তাম। আর তেমনি ছিল মিনুর মা!

—সে কে শরৎদি?

—যাদের বাড়ী ছিলাম, সে বাড়ীর গিন্নি। বলবো তোকে সব কথা একদিন। এখন না—

—কাশীর কথা শুনতে বড্ড ভাল লাগে তোমার মুখে—কখনো কিছু দেখিনি—যেন মনে হয় এখানে বসে দেখচি সব—আজ একটু ঠাণ্ডা পড়েচে না শরৎদি?

—তা হেমন্তকাল এসে পড়েচে, একটু শীত পড়বার কথা। একটা নারকেল কুরতে হবে—দা'খানা খুঁজে গ্যাখ ততক্ষণ—আমি ছোলাগুলো ততক্ষণ ভেজে ফেলি—

—কেন অত হাঙ্গামা করচো শরৎদি? দাঁড়াও, আমি নারকোল কুরে দিই—

শরৎ বললে দুজনে পা ছড়িয়ে বসে গল্প করবো আর চালভাজা—কি বলিস?

ছেলেমানুষের মত উৎসাহ ও আগ্রহভরা কণ্ঠস্বর তার। এই জন্যই শরৎদিদিকে রাজলক্ষ্মীর এত ভাল লাগে। এই পাড়াগাঁয়ে সব লোক যেন ঘুমুচ্চে, তাদের না আছে কোনো বিষয়ে আগ্রহ, না শোনা যায় তাদের মুখে একটা ভাল কথা। অল্প বয়সে বুড়িয়ে যেতে হয় ওদের মধ্যে থাকলে। শরৎদিদি এসে বাঁচিয়েচে।

রাজলক্ষ্মী হঠাৎ মনে পড়বার সুরে বললে, ভাল কথা, বলতে মনে নেই শরৎদি, টুণ্ডি-মাজদে থেকে তোমার নামে একখানা চিটি এসেছিল একবার—

শরৎ চমকে উঠে বললে—টুণ্ডি-মাজদে? কই সে চিঠি?

—আছে বোধ হয়, বাড়ীতে খুঁজে দেখবো। তোমরা তখন এখানে ছিলে না—আমি রেখে দিয়েছিলাম—

—কতদিন আগে?

তা ছ' সাত মাস কি তার বেশীও হবে। গত বোশেখ মাসে বোধ হয়। আচ্ছা শরৎদি, ওখানে তোমার শ্বশুরবাড়ী—নয়?

শরৎ অন্যমনস্কভাবে বললে, হাঁ।

একটুখানি চুপ ক'রে কি ভেবে বললে, কে দিয়েছিল জানিস?

—খামের চিঠি। আমি খুলে দেখিনি—কে আছে তোমার সেখানে?

শরৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, নিয়ে আসিস্ চিঠিখানা দেখবো।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপর রাজলক্ষ্মী বললে, খাও শরৎদি, সন্দে হয়ে আসচে—

—হুঁ—

—নারকোল কেটে দেবো আর একটু?

—না, তুই খেয়ে নে। উত্তর-দেউলে সন্দে দেখিয়ে আসতে হবে—

—এখনও রোদ রয়েচে গাছের ডগায়, অনেক দেরি এখনো। খেয়ে নাও না—

—আমি আর খাবো না এখন।

—তুমি না খেলে আমারও এই রইল—

—না না, আচ্ছা খাচ্চি আমি—নে তুই। কাঁচা লঙ্কা একটা নিয়ে আসি—

উত্তর-দেউল থেকে সন্ধ্যা-প্রদীপ দিয়ে কিছুক্ষণ পরে ওরা ফিরছিল। কাজলাপায়রা দীঘির ও পাড়ের ঘন জঙ্গলে সেথায় ছাতিম ফুল ফুটে হেমন্ত সন্ধ্যার বাতাস সুবাসিত করে তুলেচে। শ্যামলতার লম্বা কালো ডাঁটায় কুচো কুচো সুগন্ধ ফুল প্রত্যেক বর্ষাপুষ্ট ঝোপের মাথায়। পায়ে চলার পথ গত বর্ষার ঘাসে ঢেকে আছে, ভাঙা ইঁটের স্তূপে শেওলা জমেচে, গড়ের জঙ্গল ঘন কালো দেখাচ্চে আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে।

রাজলক্ষ্মীকে বাড়ী ফিরতে হবে বলে ওরা সন্ধ্যা-প্রদীপ দেখানোর কাজ বেলা থাকতে সেরে এল।

শরৎ বললে, অনেক মেটে আলু হয়ে আছে বনে, আজ দু-বছর এদিকে আসিনি—

তুলবে একদিন শরৎদি? আমিও আসবো—

বাড়ী গিয়ে শরৎ বললে, চল তোকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি—গড়ের খাল পর্য্যন্ত যাই। জল নেই তো খালে?

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে, কোথায় বর্ষায় সামান্য জল হয়েছিল, শুকিয়ে গেছে।

—থাক না কেন আজ রাতটা? একা থাকবো?

—বাড়ীতে বলে আসিনি যে শরৎদি—নইলে আর কি। আচ্ছা কাল রাত্রে বরং থাকবো। বাড়ীতে বলে আসতে হবে কিনা?

রাজলক্ষ্মীকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসবার পথে শরৎ একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসলো। হেমন্তের সান্ধ্য বাতাস কত কি বন্য পুষ্প, বিশেষতঃ বন-মরচে ও শ্যামলতার পুষ্পের সুবাসে ভারাক্রান্ত দেউড়ির ভাঙ্গা ইঁটের ঢিবির সর্ব্বত্র এ সময় বন-মরচে লতায় ছেয়ে গিয়েচে, পুরোনো রাজবাড়ীর লক্ষ্মীছাড়া দৈন্য তাদের শ্যামশোভায় আবৃত করে রেখেচে। রাজকন্যার সম্মান রেখেচে ওরা সেভাবে।

কি হবে এখুনি ঘরে ফিরে? বেশ লাগে বাইরের বাতাস। ভয় নেই ওর মনে, যা ছিল তাও চলে গিয়েচে। তা ছাড়া ভয় কিসের? সবাই বলে ভূত আছে, অপদেবতা আছে। তার পূর্ব্বপুরুষের অভ্যুদয়ের দিনের শত পুণ্য অনুষ্ঠানে এ বাড়ীর মাটি পবিত্র, এ বাড়ীর সে মেয়ে, আবাল্য যে এ সব এইখানেই দেখে এসেচে—তার ভয় কিসের?

উত্তর-দেউলের দেবী বারাহী তাদের মঙ্গল করবেন।

সে ঘরে ফিরে ডুমুরের চচ্চড়ি রান্না করবে বাবা আর জ্যাঠামশায়ের জন্যে। জ্যাঠামশায় অনেক ডুমুর পেড়ে এনেচেন আজ কোথা থেকে। জ্যাঠামশায় বেশ লোক। ওঁকে সে আর কোথাও যেতে দেবে না। উনি না থাকলে কে তাকে আনতো কাশী থেকে? বাবার সঙ্গে কে আবার দেখা করিয়ে দিত? যতদিন উনি বাঁচেন, সে ওঁর সেবা-যত্ন করবে মেয়ের মত।

শরতের হঠাৎ মনে পড়লো, রাজলক্ষ্মীকে তার শ্বশুরবাড়ীর সে পুরোনো চিঠিখানা আনবার জন্যে মনে করিয়ে দেওয়া হয়নি আর একবার। টুঙি-মাজদিয়া! কত দিন সেখানে যাওয়া হয়নি। কেই বা আছে আর সেখানে? চিঠি লিখেচেন বোধ হয় খুড়শাশুড়ী। তাই হবে—তা ছাড়া আর কে? সেখানকার সব কিছু যখন শেষ হয়ে গিয়েচে, তখন ভাল জ্ঞানই হয়নি শরতের। এক উৎসব-রজনীর চাঁপাফুলের সুগন্ধ আজও যেন নাকে লেগে আছে। কত কাল আগের বিস্মৃত মুহূর্তগুলির আবেদন—আজও তাদের ক্ষীণ বাণী অস্পষ্ট হয়ে যায় নি তো? বিস্মৃতির উপলেপন দিয়ে রেখেচে চলমান কাল, সেই মুহূর্ত-গুলির ওপর। তবে সে ভালবাসেনি, ভালবাসলে কেউ ভোলে না। এখনও বুঝবার, জানবার বয়স হয়নি তার।

টুঙি-মাজদে তার শ্বশুর বাড়ী। ওখানকার ভাদুড়িরা তার শ্বশুর-বংশ—এক সময়ে নাকি ভাদুড়িদের অবস্থা খুব ভাল ছিল। এখন তাদেরই মত।

টুঙি-মাজদে! নামটা সে ভুলেই গিয়েছিল। রাজলক্ষ্মী আবার মনে করিয়ে দিলে।

বনের মধ্যে কোথায় গম্ভীর স্বরে হুতুম প্যাঁচা ডাকচে, শুনলে ভয় করে—যেন রাত্রিচর কোনো অপদেবতার কুস্বর। শরৎ অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে ঘরে গিয়ে রান্নাঘরে খিল দিয়ে রান্না চড়িয়ে দিলে।

অনেক রাত্রে কেদার এসে ডাকাডাকি করেন—ও মা শরৎ, দোর খোলো —ওঠো—

দিন দশেক পরে একদিন রাজলক্ষ্মী এসে বললে, চললাম শরৎদি—

শরৎ বিস্ময়ের সুরে বললে, কি রে? কোথায় চললি?

—সব ঠিক। আমার বিয়ে হচ্চে সতেরোই অঘ্রাণ—জানো না?

—তোর? সত্যি?

—সত্যি না তো মিথ্যে?

—বল্ শুনি—সত্যি? কোথায়?

রাজলক্ষ্মী বেশি কিছু জানে না বোঝা গেল। এখান থেকে মাইল দশেক দূরে দশঘরা বলে অজ এক পাড়াগাঁয়ে। যার সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েচে, তার বয়েস নাকি তত বেশি নয়, বিশেষ কিছু করে না বাড়ীতেই থাকে।

শরৎ বললে, তোর পছন্দ হয়েচে?

—পছন্দ হোলেও হয়েচে, না হোলেও হয়েচে—

—তার মানে?

—তার মানে বাবার যখন পয়সা নেই, আমি যদি বলি আমার বর হাকিম হোক, হুকুম হোক, দারোগা হোক, তা হোলে তো হবে না। যা জোটে তাই সই।

—এখন যা হয় হোলে বাঁচি, না কি?

—তোমার মুণ্ডু।

তার পর ওরা বনের মধ্যে মেটে আলু তুলতে গিয়ে অনেক বেলা পর্য্যন্ত রইল। বনের মধ্যে এক জায়গায় একটা পাথরের থামের ভাঙা মুণ্ডুটা মাটিতে অর্দ্ধেক পুঁতে আছে। রাজলক্ষ্মী সেটার ওপরে গিয়ে

বসলো। পাথরের গায়ে সামুদ্রিক কড়ির মত বিট কাটা, মাঝে মাঝে পদ্মফুল এবং একটা দাঁড়ি। আবার কড়ি, পদ্ম ও দাঁড়ি—মালার আকারে সারা থামটা ঘুরে এসেচে। নীচের দিকে একরাশ কেঁচোর মাটি বাকি অংশটুকু ঢেকে রেখেচে।

রাজলক্ষ্মী চেয়ে চেয়ে বললে, এই নক্সাটা কেমন চমৎকার শরৎদি? বুনলে ভাল হয়—দেখে নাও।

শরৎ বললে, এর চেয়েও ভাল নক্সা আছে ওই অশথ গাছটার তলায় -একটা থিলেন ভেঙে পড়ে আছে তার ইঁটের গায়ে। কিন্তু বড্ড বন ওখানে—আর কাঁটা গাছ।

—তোমাদেরই সব তো—একদিন শুনেচি গড়বাড়ীর চেহারা অন্য রকম ছিল। না?

—কি জানি ভাই, ও-সবের খবর আমি রাখি নে। আজকাল যা দেখচি, তাই দেখচি। তেল জোটে তো নুন জোটে না, নুন জোটে তো চাল জোটে না।

তার পর শরৎ কি ভেবে আনন্দপূর্ণ কণ্ঠে বললে, সত্যি রাজি, খুব খুসি হয়েচি তোর বিয়ের কথা শুনে। কত যে ভেবেচি, কাশীতে থাকতে কতবার ভাবতাম, ভাল সম্বন্ধ পাই তো রাজির জন্যে দেখি। একবার দশাশ্বমেধ ঘাটে একটা চমৎকার ছেলে দেখে ভাবলাম, এর সঙ্গে যদি রাজির বিয়ে দিতে পারতাম, তবে—

রাজলক্ষ্মী চুপ করে রইল। সে যেন কি ভাবচে।

শরৎ বললে, প্রভাস-দা'র দেওয়া সেই মখমলের বাক্সটা আছে রে?

—হুঁ। মোটা সব খরচ হয়ে গেছে—আর সব আছে। ত্যাখো শরৎদি, সত্যি সত্যি একটা কথা বলি, আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না তোমায় ছেড়ে আমি একবার বলেচি, আবার বলচি। মনের কথা আমার।

তার পর রাজলক্ষ্মী উঠে ধীরে ধীরে শরতের গলা জড়িয়ে ধরে বললে,—শরৎদি, তুমি আমায় ভালবাসো ?

শরৎ তাকে ঠেলে দিয়ে হেসে বললে,—যাঃ—

রাজলক্ষ্মীর চোখ দিয়ে হঠাৎ ঝর ঝর ক'রে জল পড়লো। সে অশ্রুসিক্ত স্বরে বললে,—তুমি ভালবাসো বলেই বেঁচে আছি শরৎদি। তুমি গরীব হতে পারো, আমার কাছে তুমি গড়বাড়ীর রাজার মেয়ে, এই দেউল, মন্দির, দীঘি, গড়, ঠাকুর-দেবতার মূর্ত্তি সব তোমাদের, আমি তোমাদের প্রজার মেয়ে, একপাশে পড়ে থাকি—তুমি সুনজরে দেখো বলে বার বার আসি—

শরৎ কৌতুকের সুরে বললে,—খেপলি নাকি, রাজি? কি হয়েচে আজ তোর ?

রাজলক্ষ্মী চলে যাবার কিছু পরে বটুক এসে ডাকলে,—ও শরৎ—বাড়ী আছ ?

শরৎ তখন স্নান করতে যাবার জন্যে তৈরি হয়েচে, বটুককে দেখে একটু বিব্রত হয়ে পড়লো।

মুখে বললে,—এসো বটুকদা—

হ্যাঁ, এলাম। তুমি বুঝি—

—নাইতে বেরিয়েচি বটুকদা। রাজির সঙ্গে বন থেকে মেটে আলু তুলতে গিয়েছিলাম কি না। না ডুব দিয়ে ঘরে দোরে ঢুকবো না—

—ও, তা আমি না হয় অন্য সময়—

—কোনো কথা ছিল ?

—হাঁ, না—কথা—তা একটু ছিল—তা—

বটুকের অবস্থা দেখে শরতের হাসি পেল। মনে মনে বললে,—কি বলবি বল্ না—বলে চলে যা—কাণ্ড ছাখো একবার!

মুখে বললে,—কি বটুকদা? কি কথা?

বটুক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ইতস্ততঃ করে তারপর মরিয়ার স্থরে বললে,—প্রভাস এসেছিল কাল কলকাতা থেকে।

বলে সে শরতের মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল।

শরতের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল এক মুহূর্ত্তে। তার সমস্ত শরীর কেমন ঝিম-ঝিম করে উঠলো। কিন্তু তখনি সামলে নিয়ে বললে—তা আমায় এ কথা কেন? আমি কি করবো?

বটুক মাথা চুলকে বললে,—না—তা—এমন কিছু নয়, এমন কিছু নয়। প্রভাসের সঙ্গে গিরীন বাবু বলে এক ভদ্রলোক ছিল। এই গিয়ে তারা বলছিল—

এই পর্য্যন্ত বলে বটুক একবার চারি দিকে চেয়ে দেখলে।

শরৎ দাওয়ার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে নিজেকে যেন টলে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে বললে,—কি বলছিল?

—বলছিল যে—

—বলো না কি বলছিল?

—মানে, ওরা—তোমার সঙ্গে একবার লুকিয়ে দেখা করতে চায়। নইলে গাঁয়ে সব কথা নাকি প্রকাশ করে দেবে।

—হুঁ—তোমাকে তারা চর করে পাঠিয়েছে বুঝি?

শরতের অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে বটুক ভয় খেয়ে গেল। স্থর নরম করে বললে—আমার ওপরে অনর্থক রাগ করচো তুমি। আমায় তারা বললে, তোমাকে কথাটা বলতে—কেউ টের পাবে না, গড়ের জঙ্গলের ওদিকে হোক, কি রাণীদীঘির পাড়ে হোক্—কি তারা বলবে তোমায়।

শরৎ চুপ ক'রে রইল কিছুক্ষণ। কোনো কথা নেই তার মুখে. তার মূর্ত্তি দেখে বটুকের ভয় হোল। সে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় শরৎ স্থির গলায় বললে, বটুকদা, তোমার বন্ধুদের বোলো আমি লুকিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা কোনোদিন করবো না। তাদের সাহস থাকে বাবা আর জ্যাঠামশায়ের সামনে এসে যেন দেখা করে। আমরা গরীব আছি তাই কি? আমাদেরও মান আছে। না হয় তারা বড়লোকই আছে।

বটুক বললে, না—এর মধ্যে আর গরীব বড়লোকের কথা কি?

—আর একটা কথা বটুকদা? তুমি না গাঁয়ের ছেলে? তোমার উচিত কলকাতার সেই সব বখাটে বদমাইসদের তরফ থেকে আমায় এ-সব কথা বলা? আমি না তোমার ছোট বোনের মত? তোমায় না দাদা বলে ডাকি? তুমি এসেচ চর সেজে?

বটুক আমতা আমতা করে বললে, আমি কি করবো, আমি কি করবো—তোমার ভালোর জন্যেই—

শরৎ পূর্ব্ববৎ স্থির কণ্ঠেই বললে, আমার বাড়ী তুমি এসেচ—আমার বলতে বাধে, তবুও আমি বলছি আমার এখানে তুমি আর এসো না—আমার ভালো তোমায় করতে হবে না।

বটুক ততক্ষণ ভগ্ন দেউড়ির পথে অদৃশ্য হয়েচে।

পনের

শরৎ কাঠের পুতুলের মত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কতক্ষণ—এখন সে কি করবে? গড়শিবপুরের রাজবংশে সে কি অভিশাপ বহন করে এনেচে, তার বংশের নাম, বাবার নাম ডুবতে বসেচে আজ তার জন্যে।

মানুষ এত খারাপও হয়!

এই পল্লীগ্রামের বনে বনে হেমন্তকালের কত বনকুসুম, লম্বা লতার মাথায় থোবা থোবা মুকুল ধরেচে বন্য মাখম সিম ফুলের, শিউলির তলায় খই-ছড়ানো শুভ্র পুষ্পের সমারোহ, সুমুখ জ্যোৎস্না রাতের প্রথম প্রহরে ছাতিমবনের নিবিড়তায় চাঁদের আলোর জাল-বুনুনি। ছাতিম ফুলের সুবাস—এ সবের আড়ালে লুকিয়ে আছে প্রভাসের মত, বটুকের মত ভয়ানক প্রকৃতির লোক, যাদের অসাধ্য কাজ নেই, যাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নেই। এত কষ্ট দিয়েও ওদের মনোবাঞ্ছা মিটলো না? এত দিন পরে আবার এখানেও এসে জুটলো তার জীবনে আগুন জ্বালাতে?

আচ্ছা, সে কি করেচে যার জন্যে তার এত শাস্তি?

সে কি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কিছু করেচে? সে কি স্বেচ্ছায় কমলাদের পাপপুরীর মধ্যে ঢুকেছিল? হতে পারে সে নির্ব্বোধ, কিছু বুঝতে পারে নি, অত খারাপ কাউকে ভাবতে পারে নি বলেই তার মনে কোনো সন্দেহ জাগে নি, যখন সন্দেহ সত্যই জাগলো—তখন ওরা তো তাকে বেরুতে দিলে না। সে যদি সব কথা খুলে বলে গ্রামে, কেউ তাকে বিশ্বাস করবে না।

প্রভাসের ও গিরিনের বদমাইসির কথা শুনে ওদের কেউ শাস্তি দেবে না? ভগবান সত্যের দিকে দাঁড়াবেন না?

না হয়—সে কালোপায়রা দীঘির জলে ডুবে মরে বাবার ও বংশের মুখ রক্ষা করবে। তা সে এখুনি করতে পারে—এই দণ্ডে।

শুধু পারে না বাবার মুখের দিকে চেয়ে।

আচ্ছা, সে শ্বশুরবাড়ী দু'দিনের জন্যে চলে যাবে? টুঙি-মাজদে গ্রামে খুড়শাশুড়ীর আশ্রয়ে এখন থাকবে গিয়ে কিছুদিন? কার সঙ্গে পরামর্শ করা যায়? জ্যাঠামশায় বা বাবাকে এ সব কথা বলতে বাধে।

তার চেয়ে জলে ডুবে মরা সহজ।

সকলে মিলে অমন ভাবে তাকে যদি জ্বালাতন করে, বনের মেটে আলু, বুনো সিম-ভাতে-ভাত এক বেলা খেয়েও যদি শান্তিতে থাকতে না দেয় তবে মায়ের মুখে শোনা তারই বংশের কোন্ পুরোনো আমলের রাণীর মত—তারই কোন্ অতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহীর মত নিজের মান বাঁচাবার জন্যে কালোপায়রা দীঘির শীতল জলের তলায় আশ্রয় নিয়ে সব জ্বালা জুড়ুতে হবে, যদি তাতে হতভাগারা শান্তিতে থাকতে দেয়!...চোখের জলে শরতের গালের দু' পাশ ভেসে গেল।

কতক্ষণ পড়ে তার যেন হুঁস হোলো—কত বেলা হয়েচে! রান্না চড়ানো হয় নি—বাবা জ্যাঠামশায় এসে ভাত চাইবেন এখুনি।

উঠে সে স্নান করে এল—তেল আগেই মেখে বসে ছিল। বটুক আসবার আগেই।

রান্না চড়িয়ে দিয়ে আবার সে ভাবতে বসলো। সব সময়েই ভাবচে, বটুক চলে যাবার পর থেকে। কত বার চোখের জল গড়িয়ে পড়েচে, কতবার আঁচল দিয়ে মুছেচে। কি সে করে এখন?

তার কি কেউ নেই সংসারে?

কেউ তার দিকে দাঁড়িয়ে, তার হয়ে দুটো কথা বলবে না? প্রভাস ও গিরিন যদি তার নামে কুৎসা রটিয়ে দেয় গ্রামে, তবে তাদের কথাই সবাই সত্য বলে মেনে নেবে? তার কথা কেউ শুনবে না?

এমন সময় কেদার ও গোপেশ্বর এসে পৌঁছে গেলেন।

তাঁরা মুখুয্যে-বাড়ীর জামাই সোমেশ্বরের কাছে নতুন রাগিণীর সন্ধানে গিয়েছিলেন, বোধ হয় খানিকটা কৃতকার্য্যও হয়েচেন, তাঁদের মুখ দেখলে সেটা বোঝা যায়।

গোঁপেশ্বর খেতে খেতে বললেন—গলাটা ভাল লোকটার।

—বেশ। ভৈরবীখানা গাইলে, বড় চমৎকার—অবরোহীতে একবার যেন ধৈবৎ ছুঁয়ে নামলো—

—না না। আমার কানে তো শুনলাম না। কোমল ধৈবৎ তো লাগবেই অবরোহীতে—

—সেটা আমার খুব ভাল জানা আছে—শুনবে? এই শোনো না —আচ্ছা খেয়ে উঠি। অবরোহীতে কোমল নিখাদ, তার পরেই কোমল ধৈবৎ আসচে। যেমন—

শরৎ বললে, বাবা খেয়ে নাও দিকি। এর পর ওর অনেক সময় পাবে।

—এটা কিসের চচ্চড়ি মা?

—মেটে আলু। রাজলক্ষ্মী আর আমি তুলে এনেছিলাম আজ ওই বনের দিকে থেকে—

—রাজলক্ষ্মী এসেছিল নাকি?

—কতক্ষণ ছিল। এই তো খানিকটা আগে গেল—

—ওর বিয়ের কথা শুনে এলাম কিনা—তাই বলচি—

—আমার সঙ্গে অত ভাব, ও চলে গেলে গাঁয়ের আর কেউ এদিক মাড়াবে না। ওকে একটা কিছু দিতে হবে বাবা—

—কি দিবি?

—তুমি বলো বাবা—

আমায় বললে, বলে এসো। তারা কলকাতায় চলে গিয়েচে, আবার আসবে। নয় তো কলকাতায় কি হয়েছিল না হয়েছিল, সব গাঁয়ে প্রকাশ করে দিয়ে যাবে—

—আমি ও সব বুঝি নে। যা বলবি, কিনে এনে দেবো—ও সব মেয়েলি কাণ্ডকারখানায় আমি কোনো খবর রাখি নে—

আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে দুজনে হাটে চলে গেলেন। আজ পাশের গ্রামের হাট। পূর্ব্বে হাট ছিল না, দুই জমিদারে বাদাবাদির ফলে আজ বছরখানেক নতুন হাট বসেচে। হাটের খাজনা লাগে না বলে কাপালীরা তরিতরকারি নিয়ে জমা হয়—সস্তায় বিক্রি করে।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহ শেষ হয়ে দ্বিতীয় সপ্তাহ পড়েচে। অথচ এবার শীত এখনও তেমন পড়ে নি। বাবা ও জ্যাঠামশায় চলে গেলে শরৎ রোদে পিঠ দিয়ে বসে আবার সেই একই কথা ভাবতে লাগলো।

গড়ের খাল পার হয়ে দেখা গেল রাজলক্ষ্মী আসচে। ওর জীবনে যদি কেউ সত্যিকার বন্ধু থাকে তবে সে এই রাজলক্ষ্মী, ও এলে যেন বাঁচা যায়, দিন কাটে ভাল।

রাজলক্ষ্মী আসতে আসতে বললে, আজ একটু শীত পড়েচে শরৎদি —না?

—আয় আয়, তোর কথাই ভাবচি—

—কেন—

—তুই চলে গেলে যেন সব ফাঁকা হয়ে যায়, আয় বোস্—

শরৎ ভাবছিল বটুকের কথাটা বলা উচিত হবে কি না। কিন্তু তা হোলে অনেক কথাই ওকে এখন বলতে হয়—রাজলক্ষ্মী তাকে কিছু যদি মনে করে সব শুনে? শরৎ তা হোলে মরে যাবে—জীবনের মধ্যে ছুটিমাত্র

বন্ধু সে পেয়েচে—অন্ধ রেণুকা আর এই রাজলক্ষ্মী। এদের কাউকে সে হারাতে প্রস্তুত নয়।

আর একটি মেয়ের কথা মনে হয়—হতভাগিনী কমলার কথা—কে জানে সেই পাপপুরীর মধ্যে কি ভাবে সে দিন কাটাচ্চে?

সরলা শরৎ জানতো না—পাপে যারা পাকা হয়ে গিয়েচে, তাদের পাপপুণ্য বলে জ্ঞান অল্প দিনেই তারা হারিয়ে ফেলে, পাপে ও বিলাসে মত্ত হয়ে বিবেক বিসর্জ্জন দেয়। কোনো অসুবিধাতে আছে বলে নিজেকে মনে করে না। পুণ্যের পথই কণ্টকসঙ্কুল, মহাদুঃখময়—পাপের পথে গ্যাসের আলো জ্বলে, বেলফুলের গড়ে মালা বিক্রি হয়, গোলাপ জলের ও এসেন্সের সুগন্ধ মন মাতিয়ে তোলে। এতটুকু ধুলো কাদা থাকে না পথে। ফুলের পাপড়ির মত কোঁচা পকেটে গুঁজে দিব্যি চলে যাও।

রাজলক্ষ্মী বললে, দিন ঘুনিয়ে এল তাই তো তোমায় ছাড়তে পারি নে—

—হুঁ—

—কি ভাবচো শরৎদি?

শরৎ চমক ভেঙে উঠে বললে—কই না—কিছু না। হ্যাঁ রে, তুই আশাদিদির বরের গান শুনেচিস্? খুব নাকি ভাল গায়। বাবা আর জ্যাঠামশায় সেখানে ধন্না দিয়ে পড়ে আছেন আজ ক'দিন থেকে। দিন দশেক থেকে দেখচি—

—ও। তাই শরৎদি! মুখুয্যে-বাড়ীর দিকে যেতে দেখেছি বটে ওঁদের আজ সকালে—

—রোজ সেখানে পড়ে আছেন দুজনে—কি সকাল, কি বিকেল—কেমন গান গায় রে লোকটা?

দুল—ও আমায় বড় ভালবাসে, আমার ছোট বোনের মত। আমার বড় সাধ—

—তা দেবো মা। কখনো তোর কাউকে কিছু হাতে করে দেওয়া হয় না—তুই হাতে করে দিয়ে আসিস্—হরি সেকরাকে আজই দুলের কথা বলে দিই—

বিবাহের দু-তিন দিন আগে কেদার শাড়ী ও দুল এনে দিলেন। শরৎ কাপড়ের পাড় পছন্দ না করাতে দুবার তাঁকে ও গোপেশ্বরকে ভাজনঘাটের বাজারে ছুটোছুটি করতে হোল। শরৎ নিজে ওদের বাড়ী গিয়ে রাজলক্ষ্মীকে আইবুড়ো ভাতের নিমন্ত্রণ করে এল। সকাল থেকে শাক, সুক্তুনি, ডালনা, ঘণ্ট অনেক কিছু রান্না করলে। গোপেশ্বর চাটুয্যে এ সব ব্যাপারে শরৎকে কুটনো কোটা ফাইফরমাস খাটা—নানা রকম সাহায্য করলেন।

শরৎ বললে, জ্যাঠামশায়কে বড় খাটিয়ে নিচ্চি—

—তা নেও মা। আমি ইচ্ছে করে খাটি। আমার বড় ভাল লাগে—এ বাড়ী হয়ে গিয়েচে নিজের বাড়ীর মত। নিজে যা খুসি করি—

ইতিমধ্যে দুবার গোপেশ্বর চাটুয্যে চলে যাবার ঝোঁক ধরেছিলেন, দুবার শরৎ মহা আপত্তি তুলে সে প্রস্তাব না-মঞ্জুর করে।

শরৎ বললে, সেই জন্যেই তো বলি জ্যাঠামশায়, যত দিন বাঁচবেন, থাকুন এখানে। এখান থেকে যেতে দেবো না।

—সেই মায়াতেই তো যেতে পারি নে—সত্যি কথা বলতে গেলে যেতে ভালও লাগে না। সেখানে বৌমারা আছেন বটে, কিন্তু আমার দিকে তাকাবার লোক নেই মা—তার চেয়ে আমার পর ভাল—তুমি আমার কে মা? কিন্তু তুমি আমার যে সেবা যে যত্ন করো তা কখনো

নিজের লোকের কাছ থেকে পাই নি—বা রাজামশায় আমায় যে চোখে দেখেন—

শরৎ ধমকের সুরে বললে, ও সব কথা কেন জ্যাঠামশায়? ওতে পর ক'রে দেওয়া হয়। সত্যিই তো আপনি পর নন? .

রাজলক্ষ্মী খেতে এল।

শরৎ বললে, দাঁড়া কাপড় ছাড়তে হবে—

রাজলক্ষ্মী বিস্ময়ের সুরে বললে, কেন শরৎদি?

—কারণ আছে। ঘরের মধ্যে চল্—

পরে কাগজের ভাঁজ খুলে শাড়ী দেখিয়ে বললে—পর এখানা—পছন্দ হয়েচে?—তোর কান মলে দেবো—কান নিয়ে আয় এ দিকে—দেখি—

—দুল? এ সব কি করেচ শরৎদি?

—কি করলাম। ছোট বোনকে দেবো না? সাধ হয় না?

রাজলক্ষ্মী গরীবের মেয়ে, তাকে এমন জিনিস কেউ কোনোদিন দেয় নি। সে অবাক হয়ে বললে, এই সব জিনিস আমায় দিলে শরৎদি। সোনার দুল—

শরৎ ধমক দিয়ে বললে, চুপ। বলি নি আমাদের রাজারাজড়ার কাণ্ড, হাত বাড়ালে পর্ব্বত—

রাজলক্ষ্মীর চোখের জল গড়িয়ে পড়লো। নীরবে সে শরতের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিলে। বললে, তা আজ দিলে কেন? বুঝেচি শরৎদি—তুমি যাবে না বিয়ের রাতে।

—যাবো না কেন—তা যাবো—তবে পাড়াগাঁ জায়গা বুঝিস তো—

—তোমার মত মানুষ আমার বিয়েতে গিয়ে দাঁড়ালে আমার অকল্যাণ হবে না শরৎদি। এ তোমায় ভাল করেই জানিয়ে দিচ্ছি,

তুমি না গেলে আমার মনে বড্ড কষ্ট হবে। আর তুমি গেলে যদি অকল্যাণ হয়, তবে আমার অকল্যাণই সই—

—ছিঃ ছিঃ—ও সব কথা বলতে নেই মুখে—আয়, চল্ রান্নাঘরে—কেমন গোটা দিয়ে শুক্তুনি রেঁধেছি খেয়ে বলবি চল্—

বিকেলের দিকে শরৎ পুকুর থেকে গা ধুয়ে বাড়ী গিয়ে দেখলে রান্নাঘরের দাওয়ায় ইটচাপা একখানা কাগজের কোণ বেরিয়ে রয়েচে। একটু অবাক হয়ে কাগজটা টেনে নিয়ে দেখলে, তাতে লেখা আছে :—

"আজ সন্ধ্যার পরে রাণীদিঘির পাড়ে ডুমুর তলায় আমাদের সঙ্গে দেখা করিবা। নতুবা কলিকাতায় কি হইয়াছিল প্রকাশ করিয়া দিব। হেনাবিবি আমাদের সঙ্গে আছে ভাজনঘাটের কুঠীর বাংলায়। সেও তোমার সঙ্গে দেখা করিতে চায়। দেখা করিলে তোমার ভাল হইবে। এ চিঠির কথা কাহাকেও বলিও না। বলিলে যাহা হইবে দেখিতেই পাইবে। সাবধান।"

শরৎ টলে পড়ে যেতে যেতে কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিলে। মাথাটা যেন ঘুরে উঠলো। আবার সেই হেনাবিবি, সেই পাপপুরীর কথা—যা মনে করলে শরতের গা ঘিন্ ঘিন্ করে! এ চিঠিখানা ছুঁয়েচে, তাতেই তাকে নাইতে হবে এই অবেলায়।

এরা তাকে রেহাই দেবে না? তাদের গড়বাড়ীতে কলকাতার লোকের জোর কিসের?

সব সমস্যার সে সমাধান করে দিতে পারে এখুনি, এই মুহূর্ত্তেই, কালোপায়রা দীঘির অতল জলতলে।

কিন্তু বাবার মুখের অসহায় ভাব মনে এসে তাকে দুর্ব্বল করে দেয়। নইলে সে প্রভাসেরও ধার ধারতো না, গিরিনেরও না। নিজের পথ

করে নিতো নিজেই। তাদেরই বংশের কোন রাণী ঐ দীঘির জলে আত্মবিসর্জ্জন দিয়েছিলেন মান বাঁচাতে। সেও ঐ বংশেরই মেয়ে। তার ঠাকুরমারা যা করেছিলেন. সে তা পারে।

বাবাকে এ চিঠি দেখাবে না। বাবার ওপর মায়া হয়, দিব্যি গানবাজনা নিয়ে আছেন, ব্যস্ত হয়ে উঠবেন এখুনি। গোপেশ্বর জ্যাঠা-মশায়কে দেখাতে লজ্জা করে। থাকৃগে, আজ সে এখুনি রাজলক্ষ্মীদের বাড়ী গিয়ে কাটিয়ে আসবে অনেক রাত পর্য্যন্ত। উত্তর দেউলে পিদিম আজ সকাল সকাল দেখাবে

রাজলক্ষ্মীর মা ওকে দেখে বললেন, এসো এসো মা—শরৎ, আচ্ছা পাগলী মেয়ে, অত পয়সাকড়ি খরচ করে রাজিকে দুল আর শাড়ী না দিলে চলতো না?

রাজলক্ষ্মীর কাকীমা বললেন, গরীবের ওপর ওদের চিরকাল দয়া অমনি—কত বড় বংশ দেখতে হবে তো? বংশের নজর যাবে কোথায় দিদি?

শরৎ সলজ্জ সুরে বললে—ও সব কথা কেন খুড়ীমা? কি এমন জিনিস দিয়েচি—কিছু না—ভারি তো জিনিস—রাজি কোথায়?

রাজলক্ষ্মীর মা বললেন, এই এতক্ষণ তোমার কথাই বলছিল, তোমার দেওয়া কাপড় আর দুল দেখতে চেয়েচেন গাঙ্গুলিদের বড়বৌ, তাই নিয়ে গিয়েচে দেখাতে। শরৎদি বলতে মেয়ে অজ্ঞান, তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলে, মা—শরৎদি'কে ছেড়ে কোথায় গিয়ে সুখ পাবো না। বসো, এলো বলে—

একটু পরে গাঙ্গুলী-বৌকে সঙ্গে নিয়ে রাজলক্ষ্মী ফিরলো, সঙ্গে জগন্নাথ চাটুয্যের পুত্রবধূ নীরদা। নীরদা শরতের চেয়ে ছোট, শ্যামবর্ণ, একহারা গড়নের মেয়ে, খুব শ্রান্ত প্রকৃতির বৌ বলে গাঁয়ে তার সুখ্যাতি আছে।

গাঙ্গুলী-বৌ বললেন, এই যে মা-শরৎ তোমার কথাই হচ্ছিল। তুমি যে শাড়ী দিয়েচ, দেখতে নিয়েছিলাম—ক' টাকা নিলে? ভাজনঘাটের বাজার থেকে আনানো? বট্‌ঠাকুর কিনেচেন বুঝি?

শরৎ বললে, দাম জানিনে খুড়ীমা, বাবা ভাজনঘাট থেকেই এনেচেন। দুবার ফিরিয়ে দিয়ে তবে ঐ পাড় পছন্দ—

নীরজা বললে, দিদির পছন্দ আছে। চলুন দিদি, ও ঘরে একটু তাস খেলি আপনি আমি রাজলক্ষ্মী আর ছোট খুড়ীমা—

রাজলক্ষ্মীর মা শরৎকে পাশের ঘরে নিয়ে বললেন, মা, কাল তুমি আসতে পারো আর না পারো আজ সন্দের পর এখান থেকে দুখানা লুচি খেয়ে যেও—রাজলক্ষ্মী আমায় বার বার করে বলেচে—

সবাই মিলে আমোদ স্ফুর্ত্তিতে অনেকক্ষণ কাটলো—বেলা পড়ে সন্ধ্যা হয়ে গেল। বিয়ে বাড়ীর ভিড়, গ্রামের অনেক ঝি-বৌ সেজেগুঁজে বিকেলের দিকে বেড়িয়ে দেখতে এল। মুখুয্যে-বাড়ীর মেজবৌ পেতলের রেকাবে ছিরি গড়িয়ে নিয়ে এলেন। রাজলক্ষ্মীর মা বললেন, বরণ-পিঁড়ির আলপনাখানা তুমি দিয়ে দ্যাও দিদি—তুমি ভিন্ন এ সব কাজ হবে না—এক হৈম-দিদি আর তুমি—তারকের মা তো স্বর্গে গেছেন—আলপনা দেবার মানুষ আর নেই পাড়ায়—তারকের মা কি আলপনাই দিতেন!

শরৎ বললে, বাবাকে একটু খবর দিন খুড়ীমা কালীকান্ত কাকার চণ্ডীমণ্ডপে গানের আড্ডায় আছেন। যাবার সময় আমাকে যেন সঙ্গে নিয়ে যান এখান থেকে। অন্ধকার রাত, ভয় করে একা থাকতে।

পরদিন সকাল আটটার সময় শরৎকে আবার রাজলক্ষ্মীদের বাড়ী থেকে ডাকতে এল। নিরামিষ দিকের রান্না তাকে রাঁধতে হবে, গাঙ্গুলিদের বড়বৌয়ের জ্বর কাল রাত্রি থেকে। তিনিই রান্না করে থাকেন পাড়ার ক্রিয়াকর্ম্মে।

রাজলক্ষ্মী প্রায়ই রান্নাঘরে এসে শরতের কাছে বসে রইল।

শরৎ ধমক দিয়ে বলে—যা রাজি, দধিমঙ্গলের পরে হুটর্ হুটর্ করে বেড়ায় না। এখানে ধোঁয়া লাগবে চোখে মুখে—অন্য ঘরে বসগে যা—

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে, কারো ধমকে ভয় খাইনে। এই বসলাম পিঁড়ি পেতে—দেখি তুমি কি করো।

নীরদা এসে বললে, শরৎ-দি, একটা অর্থ বলে দাও তো?

আকাশ গম গম পাথর ঘাটা
সাতশো ডালে দুটি পাতা—

শরৎ তাকে খুন্তি উঁচিয়ে মারতে গিয়ে বললে, ননদের কাছে চালাকি—না? দশ বছরের খুকিদের ও সব জিগ্যেস্ করগে যা ছুঁড়ি—

গরীবের বিয়ে-বাড়ী, ধূমধাম নেই, হাঙ্গামা আছে। সব পাড়ার বৌঝি ভেঙে পড়লো সেজেগুজে। প্রথম প্রহরের প্রথম লগ্নে বিবাহ। শরৎ সারাদিন খাটুনির পরে বিকেলের দিকে নীরোদাকে বললে, গা হাত পা ধুয়ে আসবো এখন। বাড়ী যাই—কাউকে বলিস নে—

বাড়ী ফিরে সে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখাতে গেল। শীতের বেলা অনেকক্ষণ পড়ে গিয়েচে, রাঙা রোদ উঠে গিয়েচে ছাতিমবনের মাথায়, ঈষৎ নীলাভ সাদা রঙের পুঞ্জ পুঞ্জ ছোট এড়াঞ্চির ফুল শীতের দিনে এই সব বন-ঝোপকে এক নির্জ্জন, ছন্নছাড়া মূর্ত্তি দান করেচে। শুকনো বাদুড়-নখী ফল তাদের বাঁকানো নখ দিয়ে কাপড় টেনে ধরে। থমথমে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর অন্ধকার রাত্রি।

এক জায়গায় গিয়ে হঠাৎ সে ভয়ে ও বিস্ময়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। একটি লোক উপুড় হয়ে পড়ে আছে উত্তর-দেউলের পথ থেকে সামান্য

ঘুরে বাদুড়নখীর জঙ্গলের মধ্যে। শরৎ কাছে দেখতে গিয়ে চমকে উঠলো—কলকাতার সেই গিরিনবাবু!

মরে কাঠ হয়ে গিয়েচে অনেকক্ষণ। ওর ঘাড়টা যেন শক্ত হাতে কে মুচড়ে দিয়েচে পিঠের দিকে, সেই মুণ্ডুটা ধড়ের সঙ্গে এক অস্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করেচে। গিরিনের দেহটা যেখানে পড়ে, তার পাশেই মাটিতে ভারি ভারি গোল গোল কিসের দাগ, হাতীর পায়ের দাগের মত।...শরতের মাথা ঘুরে উঠলো, সে চীৎকার করে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে গেল। হাত থেকে সন্ধ্যাপ্রদীপ ছিট্‌কে পড়লো বাদুড়-নখীর জঙ্গলে।

*   *   *   *   *

এই অবস্থায় অনেক রাত্রে কেদার ও গোপেশ্বর তাকে বিয়ে বাড়ী থেকে ডাকতে এসে দেখতে পেলেন। ধরাধরি করে তাকে নিয়ে বাড়ী যাওয়া হোল।

লোকজনের হৈ হৈ হোল পরদিন। পুলিশ এল, রাণীদীঘির জঙ্গলে এক চালকবিহীন মোটর গাড়ী পাওয়া গেল। কি ব্যাপার কেউ বুঝতে পারলে না। সবাই বললে, গড়বাড়ীর সবাই সারা রাত বিয়ে বাড়ীতে ছিল। মৃতদেহের ঘাড়ে শক্ত, কঠিন পাঁচটা আঙুলের দাগ যেন লোহার আঙুলের দাগের মত ঘাড়ের মাংস কেটে বসে গিয়েচে। গোল গোল হাতীর পায়ের মত দাগগুলোই বা কিসের কেউ বুঝতে পারলে না।

*   *   *   *   *

গড়ের জঙ্গলে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকচে। সন্ধ্যাবেলা। কেদার ঘোর নাস্তিক, কি মনে করে তিনি হস্তপদভগ্ন বারাহী দেবীর পাষাণ মূর্ত্তির কাছে মাথা নীচু করে দণ্ডবৎ করে বললেন, গড়ের রাজবাড়ী যখন

সত্যিকার রাজবাড়ী ছিল, তখন শুনেচি তুমি আমাদের বংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলে। আমাদের অবস্থা পড়ে গিয়েচে, অনেক অপরাধ করেছি তোমার কাছে, কিন্তু তুমি আমাদের ভোল নি। এমনি পায়ে রেখো চিরকাল মা—অনেক পূজো আগে খেয়েচ: সে কথা ভুলে যেও না যেন।

সমাপ্ত

—বেশ ভালই হোল—তুই খেতে পাবি এখন—

—বোসো গরম গরম আনি—

পরম তৃপ্তির সহিত প্রায় বিশ-বাইশখানা লুচি অনর্গল খেয়ে যাওয়ার পরে কেদারের মনে পড়লো, আর বেশি খাওয়া ঠিক হবে না—মেয়ের লুচিতে টান পড়বে।

শরৎ আবার যখন দিতে এল, বললে, নাঃ, আর না থাক্।

—কেন দিই, এই দু-খানা গরম গরম,

—তোমার জন্যে আছে তো?

—ওমা, সে কি? প্রায় আধসেরের ওপর আটা—এক পোয়া আটার লুচি আমি খেতে পারি না, তুমি পারো?

—খুব পারি। ওকথা বলো না মা—এক সময়ে···

—তোমার তো বাবা কেবল এক সময়ে আর এক সময়ে। এখন পারো না তো আর?

—খুব পারি—

—পারলেও আর দেবো না। খেয়ে ওঠো—বিদেশে-বিভুঁই জায়গা—দাঁড়াও দইটা নিয়ে এসে দিই—দই আছে, মিষ্টি আছে—

আহারাদি সেরে পরিতৃপ্তির সহিত তামাক টানতে টানতে কেদার মেয়েকে বললেন, প্রভাস ছোকরা ভালো। বেশ যোগাড় আয়োজন করেচে খাওয়ার—কি বলিস মা?

—চমৎকার, আবার কি করবে?

···ফলগুলো কেটেছিস নাকি?

—না বাবা, কাল সকালে কাটবো। তোমায় দেবো। আজ তো লুচি ছিল, তাই খেলাম।

—বড্ড নির্জ্জন বাগানটা—না?

—গড়ের জঙ্গলের চেয়ে নির্জ্জন নয় তা বলে। ওই তো রাস্তা দিয়ে

মটোর গাড়ী যাচ্ছে, আর গড়ের জঙ্গলে যে এ সময়ে শেয়াল ডাকে, বাঘ বের হয়!

—তা যা বলিস বাপু, সেখানে যতই জঙ্গল হোক, জন্মভূমি তো বটে। সেখানে ভয় হয়? তুই সত্যি করে বল তো?

—ভয় হোলে কি থাকতে পারতাম বাবা? ছেলেবেলা থেকে কাটালাম কি করে তবে?

—কিন্তু এখানে কেমন যেন ভয় ভয় করে মা। কলকাতা সহর বড় যেমন, তেমন গুণ্ডা বদমাইসের জায়গা।

সারাদিন মোটর ভ্রমণের ক্লান্তির ফলে রাত যেন কোথা দিয়ে কেটে গেল।

পরদিন সকালে শরৎ বাথরুমে ঢুকে স্নান সেরে নিয়ে বাবার জন্যে চা আর খাবার করতে বসলো। অনেক দিন পরে সে বাবাকে ভাল করে খাওয়ানোর সচ্ছল উপকরণ হাতের কাছে পেয়ে তার সদ্ব্যবহার করতে ব্যগ্র হয়ে পড়েচে।

কেদার বললেন, প্রভাস আর অরুণের জন্যে খাবার করে রাখো মা, যদি ওরা সকালে এসে পড়ে?

কিন্তু তারা সকালের দিকে এল না।

দুপুরের পর কেদার একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর দিবানিদ্রা অভ্যাস নেই—অথচ রাস্তাঘাট না চেনার দরুণ কোথাও যেতেও পারেন না। এই বাগান বাড়ীর চতুঃসীমায় বন্দীজীবন যাপন করার মত লোক নন তিনি।

শরৎ ডেকে বললেন, হ্যাঁ মা, গঙ্গা কোন্‌দিকে ঝিকে জিজ্ঞেস কর তো?

শরৎ ঘুরে এসে বলল, গঙ্গা নাকি এখান থেকে দু-কোশ পথ, বাবা। কেন, গঙ্গা কি হবে?

—না, একটু বেড়িয়ে আসতাম গঙ্গার ধারে।

বেলা তিনটার পর প্রভাস একা মোটর হাঁকিয়ে এল।

বললে, ওবেলা কাজ ছিল জরুরী—আসতে পারলাম না। কোনো অসুবিধে হয় নি কাকাবাবু?

—নাঃ অসুবিধে কি হবে? অরুণ এল না?

—তার সঙ্গে দেখাই হয় নি আজ সারাদিন। তবে সেও কাজে ব্যস্ত আছে মনে হচ্চে। নইলে নিশ্চয় আসতো।

—তুমি চা খেয়ে নাও, শরৎ মা তোমার প্রভাস দাকে—

আধ ঘন্টার মধ্যে কেদার চা পান শেষ করে মেয়েকে নিয়ে মোটরে উঠলেন। বললেন, কলকাতার দিকে না গিয়ে এবার চলো না বেশ গঙ্গার ধারে নির্জ্জন জায়গায়—

…পেনেটিতে দ্বাদশ শিবের মন্দিরে যাবেন?

শরৎ আগ্রহের সুরে বললে, তাই চলো প্রভাস-দা, দেখিনি কখনো। যদিও কেদার শিবমন্দির দেখবার কোনো আগ্রহ দেখালেন না—তীর্থ দর্শনে পুণ্য অর্জ্জন করবার ওপর লোভ জীবনে তাঁর কোনো দিনই দেখা যায় নি।

বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে পড়ে মোটর তীরবেগে পেনিটির দিকে ছুটলো। রাস্তার দুধারে কত বিচিত্র উদ্যানরাজি, কত সুন্দর বাড়ী—কলকাতার বড় লোকেদের ব্যাপার। পেনিটির দ্বাদশ শিবের মন্দির দেখে শরৎ খুব খুসি। সামনে গঙ্গা, ওপারে কত কলকারখানা, মন্দি, ঘরবাড়ী। এপারে সারি সারি বাগানবাড়ী—বিকেলের নীল আকাশ গঙ্গার বিলাশবক্ষে যেন ঝুঁকে পড়েচে—নৌকো ষ্টীমারের ভিড়।

শরৎ অবাক হয়ে গঙ্গার বাঁধাঘাটে রানার ওপর দাঁড়িয়ে দেখে দেখে বললে—এমন কথনো দেখিনি বাবা, ওপারের দিকটা কি চমৎকার।

—প্রভাস বললে, ভাল লাগচে, শরৎ-দি ?

—উঃ, ইচ্ছে করে এখানেই সব সময় থাকি আর গঙ্গা স্নান করি—ভাল কথা, প্রভাস-দা, কাল গঙ্গা নাওয়াও না কেন ?

—বেশ ভালই তো। কোন সময় আসবো বলো—কোথায় নাইবে ?

—এখানেই এসো। এ জায়গা আমার ভারি ভালো লেগেচে—

—এখানেই আসবে না কালীঘাটে ? কাকাবাবু কি বলেন ?

—তুমি যেখানে ভাল বোঝো। বাবার কথা ছেড়ে দাও—উনি ওসব পছন্দ করেন না।

সন্ধ্যার আগে অস্ত-দিগন্তের চিত্রবিচিত্র রঙীন আকাশের ছায়া গঙ্গার জলে পড়ে যে মায়ালোক সৃষ্টি করলে শরৎ সে রকম দৃশ্য জীবনে কোনোদিন দেখেনি। গড়শিবপুর জলের দেশ নয়—এত বড় নদী, জলের বুকে এমন রঙীন মেঘের প্রতিচ্ছায়া সে এই প্রথম দেখলে। রাজলক্ষ্মীর জন্যে মনটা কেমন করে উঠলো শরতের—সে বেচারী কিছু দেখতে পেলে না জীবনে, আজ সে সঙ্গে থাকলে আনন্দ অনেক বেশী হোত।

বাড়ী ফিরে শরৎ রান্নাঘরে ঢুকলো—প্রভাস কিছুক্ষণ বসে কেদারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে লাগলো।

কথায় কথায় কেদার বললে, হ্যাঁ হে, এখানে কোথাও গান টান হয় না ?

আসলে কেদারের এসব খুব ভাল লাগছিল না—সহর, দেবমন্দির, গঙ্গা, দোকান, ট্রাম—এ সব খুব ভাল জিনিস। কিন্তু তিনি একটু গান-বাজনা চান, চিরকাল যা করে এসেচেন। শরৎ ছেলেমানুষ, তার ওপর মেয়েমানুষ—ও সহর বাজার, ঠাকুর দেবতা দেখে খুসী থাকতে পারে—কেদারের এখন সে বয়েস নেই। মেয়ে মানুষও নন যে পুণ্যের লোভ থাকবে।

প্রভাস বললে, কি রকম গান-বজনা বলুন ?

—এই ধরো কোনো গান-বাজনার আড্ডা—শুনেচি তো কলকাতায় অনেক বড় বড় গানের মজলিস বসে বড় লোকের বাড়ী। একদিন সে রকম কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারো?

প্রভাস একটু ভেবে বললে, তা বোধ হয় পারবো—দেখি সন্ধান নিয়ে। কাল বোলবো আপনাকে—

—অনেক শুনেচি বড় বড় ওস্তাদ আছে কলকাতায়। কোথায় থাকে জানো? তাদের গান শোনাবার সুবিধে হয়?

—আমি দেখবো কাকাবাবু। অরুণকে জিগ্যেস করি কাল—ও অনেক খোঁজ রাখে—

প্রভাস মোটর নিয়ে চলে যাচ্চে, এমন সময় শরৎ এসে বললে—ও প্রভাস-দা, যাবেন না—

—কেন শরৎ-দি?

—আপনার জন্যে একটা জিনিস তৈরি করচি—

—কি বলো না?

—এখন বলচি নে—আসুন, খাবার সময় দেবো—

—খুব দেরী হয়ে যাবে শরৎ-দি—

—কিছু দেরী হবে না, হয়ে গেল—গরম গরম ভেজে দেবো—

কিছুক্ষণ পরে শরৎ একখানা রেকাবিতে খানকতক মাছের কচুরী এনে বললে—খেয়ে দেখুন কেমন হয়েচে। এবেলা ঝি ভাল পোনা মাছ এনেচে প্রায় আধসের। অত মাছ রান্না করে কে খাবে? তাই ভাবলাম বাবার জন্যে খান কতক কচুরী ভাজি—

প্রভাস বললে, কাকাবাবুকে দিলে না?

—তাঁকে এখন না। এখন খেলে রাত্রে আর খেতে পারবেন না। তখন একেবারে দেবো—

প্রভাস খাওয়া শেষ করে বিদায় নেওয়ার আগে বললে—কাল

শরৎ-দি, গঙ্গা নাওয়াবো তোমায়। ভেবে রেখো কালীঘাট না পেনেটি কোথায় যাবে।

কেদার বললেন, আমার কথাটা যেন মনে থাকে, প্রভাস। ভাল গান-বাজনার সন্ধান পেলেই খবর দেবে—

—সে আমার মনে আছে কাকাবাবু।

পর দিন সকালে উঠে কেদার দেখলেন মেয়ে তাঁর আগেই উঠে বাগানে ফুল তুলে বেড়াচ্ছে। বাবাকে দেখে বললে—ওঠো বাবা, আমি আজ পুজো করব ভেবে ফুল তুলছি। কি চমৎকার চমৎকার ফুল ফুটে আছে পুকুরের ওপাড়ে। তুমি চেন ফুল? বিলিতি না কি ফুল —দেখিই নি কখনো—

কেদার বললেন, বেশ বাগান-বাড়ীটা না মা শরৎ? কিন্তু—

—কিন্তু কি বাবা?

—এখানে বেশি দিন মন টেকে না। আমাদের গড়শিবপুরের সেই জঙ্গলা ভালো—না মা?

—যা বলেছ বাবা। বাগানের পুকুরটা দেখে আমার এইমাত্র কালো পায়রার দীঘির কথা মনে পড়ছিল—

—আর কত দিন থাকবে এখানে? প্রভাস কিছু বলেচে?

—তুমি যে কদিন বলো বাবা। এখনও কালীঘাট দেখিনি, বায়স্কোপ দেখি নি—দেখি সেগুলো? আর কি কি আছে দেখবার বাবা?

—চিড়িয়াখানাটা আমার সেবারও দেখা হয় নি—এবার দেখবো।

—সেবার মানে কি বাবা? হয় তো ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগেকার কথা। আমার জন্মাবার অনেক আগে—না?

—হ্যাঁ—তা হবে। তোর মায়ের জন্যে একখানা শাড়ী, বেশ ভাল ডুরে শাড়ী কিনে নিয়ে যাই, মনে আছে।

তুমি হাত মুখ ধুয়ে নাও বাবা, আমি চা করে আনি—খাবার কি খাবে?

এমন সময় গেটের পথে মোটরের শব্দ শোনা গেল—সঙ্গে সঙ্গে প্রভাসের মোটর এসে বারান্দার সামনের লাল কাঁকরের পথের ওপর এরিকাপাম কুঞ্জের ছায়ায় দাঁড়িয়ে গেল। প্রভাস নেমে এসে বললে, চলুন কাকাবাবু, কালীঘাটে নিয়ে যাই—শরৎ-দি তৈরী হয়ে নাও।

শরৎ খুসীতে উৎফুল্ল হয়ে বললে, সে বেশ হবে প্রভাসদা, চলো বাবা, চা করে নিয়ে এলাম বলে, বসো সব।

সত্যিই একদিন অদ্ভুত উত্তেজনা ও আনন্দের মধ্যে শরতের দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। কেদার বৃদ্ধ হয়েছেন, নতুন জায়গা এখন আর তাঁর মনে তেমন ধাক্কা দেয় না, জীবনের সমস্ত আকাশটা জুড়ে গড়শিবপুরের ভাঙা রাজ-দেউড়ি ও বনজঙ্গলে ঘেরা গড়খাই সেখানে পূর্ণ অধিকারের আসন পেতেছে, আর আছে ছিবাস মুদির দোকান, ওপাড়ার কৃষ্ণযাত্রার আখড়াইয়ের আসর—তার সঙ্গে হয় তো সতীশ কলুর দোকান—তাদের ছোট্ট খড়ের বাড়ীখানা। এ বয়সে নতুন কোন জিনিস জীবনে স্থান দখল করতে পারে না। জীবনের বৃত্ত পরিধিতে শেষ করে ওদিকের বিন্দুতে মিলবার চেষ্টায় রয়েছে—নব অনুভূতিরাজির সঞ্চার এ বয়সে সম্ভব কবি ও বৈজ্ঞানিকের পক্ষে, প্রতিভাবান শিল্পীর পক্ষে, কেদার সে দলে পড়েন না।

প্রভাসের মোটর এবার ষ্ট্রাণ্ড রোড ধরে চললো, হ্যারিশন রোড দিয়ে পড়ে। প্রভাস বললে, ইডেন গার্ডেনটা একবার দেখিয়ে নিয়ে যাই আপনাদের।

কেদার বললেন, সেটা কি বাবাজি?

—আজ্ঞে একটা বাগান, বেশ ভাল, সবাই বেড়াতে আসে।

—ও বাগান-টাগান আমরা আর কি দেখবো, বন বাগান দেখেই আসছি, তুমি বরং আমাদের কালীঘাটটা নিয়ে চল।

কালীঘাটে কালী মন্দিরের সামনের চত্বরে অরুণ দাঁড়াইয়া আছে

দেখিতে পাইয়া শরৎ খুসির সুরে বলিল—বাবা, ওই অরুণ বাবু, ডাকুন না প্রভাসদা ?

প্রভাস বললে, এখানে আমাদের সঙ্গে মিশবার কথা ছিল ওর। ও অরুণ—এই যে।

শরৎ কালী-গঙ্গায় স্নান সেরে মন্দিরে দেবী দর্শন করে এল। সঙ্গে রইল প্রভাস। কেদার মোটরে বসে চারিপাশের ভিড় দেখিতে লাগিলেন। অরুণ একটা ছোট ঘর ভাড়ার চেষ্টায় গেল, কারণ প্রভাস ও অরুণ দুজনে শরৎকে বিশেষ করে ধরেছে, এখানে চড়ুইভাতি করতে হবে।

শরতের বড় অস্বস্তি বোধ করে একটা ব্যাপারে। এখানকার লোকে এমন ভাবে তার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে কেন? সহরের লোকের এমন খারাপ অভ্যাস কেন? আজ ক'দিন থেকেই সে লক্ষ্য করেছে। অপরিচিতা মেয়েদের দিকে অমন ভাবে চেয়ে থাকা বুঝি ভদ্রতা? শরতের জানা ছিল কলকাতার লোকে শিক্ষিত, তাদের ধরণধারণ খুব ভদ্র হবে, তাদের দেখে গড়শিবপুরের মত পাড়াগাঁয়ের লোকেরা শিখবে। এখন দেখা যাচ্ছে তার উল্টো।

অরুণ বাড়ী ঠিক করে এসে কেদারকে বললে—এরা কই? চলুন এবার, সব ঠিক করে এলাম।

একটু পরে প্রভাসের সঙ্গে শরৎ মন্দির থেকে ফিরলো। ওরা সবাই মিলে ভাড়াটে ঘরে গিয়ে সতরঞ্চি পেতে বসলো। হোগলার ছাওয়া, দরমার বেড়া দেওয়া সারি সারি অনেকগুলো খুপরির মত ঘর। ছোট্ট একটুখানি নীচু দাওয়ায় মাটির উনুন। প্রভাস মোটরের ক্লিনারকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে প্রচুর বাজার করে নিয়ে এল, এমন কি প্রসাদী মাংস পর্য্যন্ত। কেদার খুব খুসি। মেয়েকে বললেন—ভাল করে মাংসটা রাঁধিস মা, একটু ঝাল দিস্।

—সে কি বাবা, ঝাল যে তুমি মোটে খেতো পারো না?

—তা হোক, কচি পাঁটার মাংস ঝাল না দিলে ভাল লাগে না।

রান্না খাওয়া মিটতে বেলা তিনটে বাজলো। অরুণদের আবার কে একজন বন্ধু এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিলে। লোকটি এসেই বলে উঠলো—এই যে প্রভাস, আরে অরুণ, এনেছিস তো জুত করে? ভাল চিজ বাবা, তোদের সাহস আছে বলতে হবে।

প্রভাস তাড়াতাড়ি তাকে চোখ টিপে দিলে, শরৎ দেখতে পেলে। সে কিছু বুঝতে পারলে না, লোকটা অমন কেন, এসেই চীৎকার করে কতকগুলো কথা বলে উঠলো যার কোন মানে হয় না। কলকাতা সহরে কত রকম মানুষই না থাকে!

কি জানি কেন, লোকটাকে শরতের মোটেই ভাল লাগলো না। মোটা মত লোকটা, নাম গিরিন, বয়সে প্রভাসের চেয়েও বড়, কারণ কাণের পাশের চুলে বেশ পাক ধরেছে।

তিনটের পরে ওখান থেকে বেরিয়ে কিছু দূর গিয়ে প্রভাস একটা বাগানের সামনের গাড়ী রেখে বললে—এই চিড়িয়াখানা কাকাবাবু, নেমে দেখুন এবার—

শরৎ সব দেখে শুনে সমস্ত দিনের কষ্ট ও শ্রম ভুলে গেল। কেদারও এমন এমন একটা জিনিস দেখলেন, যা তাঁর মনে হল না দেখলে জীবনে একটা অসম্পূর্ণতা থেকে যেত। পৃথিবীতে যে এত অদ্ভুত ধরণের জীবজন্তু থাকতে পারে, তার কল্পনা কে করেছিল? কেদার তো ভাবতেই পারেন না। পিতাপুত্রীতে মিলে সমবয়সী বালক-বালিকার মত আমোদ করে ওরা পশুপক্ষী দেখে বেড়ালে। এ ওকে দেখায়, ও ওকে দেখায়। কি ভীষণ ডাক সিংহের? জলহস্তী? এর নাম জলহস্তী? ছেলেবেলায় 'প্রাণি বৃত্তান্ত' বলে বইয়ে কেদার এর কথা পড়েছিলেন বটে। ওই দেখো শরৎ মা ওকে বলে উটপাখী। অতবড় ডিম, বাবা উটপাখীর। আচ্ছা ও খায়, প্রভাস দা? বিক্রী হয়?

—ফিরবার সময় গেটের কাছে এসে গিরীন, প্রভাস ও অরুণের সঙ্গে কি সব কথা বললে। প্রভাস এসে বললে, কাকাবাবু, এবার চলুন সিনেমা দেখে আসি, মানে বায়স্কোপ। কাছেই আছে—

কেদার বললেন, তা চলো, যা ভাল হয়।

বাইরে এসে ওরা একটা ফাঁকা মাঠের ধারে মোটর থামিয়ে রেখে কেদার ও শরতকে নেমে হাওয়া খেতে বললে। এরই নাম গড়ের মাঠ। সে দিনও নেমেছিল শরৎ। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে—রাস্তার ধারে গ্যাসের আলো এক-একটা করে জেলে দিচ্ছে। শরৎ জিজ্ঞাসা করলে—সে বায়স্কোপ কতক্ষণ দেখতে হবে? প্রভাস বললে, এই সাড়ে ন'টা পর্য্যন্ত।

শরৎ ভেবে দেখলে অত রাত্রে গিয়ে রান্না চড়ালে বাবা খাবেন কখন? তা ছাড়া বাবা আজ সারাদিন এখানে ওখানে বেড়িয়ে শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন—বুড়ো বয়েসে অত অনিয়ম করলে যদি শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে বিদেশে—তখন ভুগতে হবে তাকেই। সে বললে, আজ থাক প্রভাসদা, আজ আর বায়স্কোপ দেখে দরকার নেই। বাবার খেতে দেরী হয়ে যাবে।

গিরীন তবুও নাছোড়বান্দা। সে বললে, কিছু ক্ষতি হবে না—মোটরে যেতে আর কতটুকু লাগবে? আজই দেখা যাক।

শরতকে অত সহজে ভোলানো যাবে তেমন প্রকৃতির মেয়ে নয় সে। নিজের বুদ্ধিতে সে যা ঠিক করে, ভাল হোক, মন্দ হোক, তা সে সঙ্কল্প থেকে নড়ানো গিরীনের কর্ম্ম নয়—গিরীন শীঘ্রই তার পরিচয় পেলে। প্রভাসকে সে ইংরেজীতে কি একটা কথা বললে, প্রভাস ও অরুণ দুজনে অনুচ্চস্বরে কি বলাবলি করলে।

প্রভাস বললে, কাকাবাবু কি বলেন?

কেদার নিজের মত অনুসারে চলবার সাহস পান গড়শিবপুরে,

এখানে মেয়ের মতের বিরুদ্ধে যেতে তাঁর সাহসে কুলায় না। সুতরাং তিনি বললেন, ও যখন বলছে, তখন আজ না হয় ওটা থাকগে প্রভাস, কাল যা হয় হবে।

অগত্যা প্রভাস ওদের নিয়ে মোটরে উঠলো—কিন্তু বেশ বোঝা গেল ওদের দল তাতে বিরক্ত হইয়াছে।

পাঁচ

পরদিন প্রভাসের দলের কেউই বাগানবাড়ীতে এল না। শরৎ সন্ধ্যার দিকে বাগানে আপন মনে খানিকটা বেড়িয়ে বাবাকে ডেকে বললে, বাবা খাবে নাকি?

কেদার বললেন, আজ এরা কেউ এল না কেন রে শরৎ?

—তা কি জানি বাবা। বোধ হয় কোনো কাজ পড়েচে—

—তা তো বুঝলাম, কিন্তু যা দেখবার দেখে নিতে পারলে হোত ভাল। আবার বাড়ী ফিরতে হবে সংক্রান্তির আগেই—

কেদারের আর তেমন ভাল লাগছিল না বটে, কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন মেয়ের এত তাড়াতাড়ি দেশে ফিরবার ইচ্ছে নেই—তার এখন দেখবার বয়েস, কখনো কিছু দেখে নি, আছে আজীবন গড়শিবপুরের জঙ্গলে পড়ে। দেখতে চায় দেখুক—তিনি বাধা দিতে চান না।

শরৎ বললে, পেঁপে খাবে বাবা? বাগানের গাছ থেকে পেড়েচি, চমৎকার গাছ-পাকা। নিয়ে আসি দাঁড়াও—

কেদার বললেন, আশপাশের বাগানবাড়ীতে লোক থাকে কি না জানিস কিছু মা?

—চলো না তুমি পেঁপে খেয়ে নাও—দেখে আসি।

মিনিট পনেরো পরে দু'জনে পাশের একটা অন্ধকার বাগানবাড়ীর

ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই একজন খোট্টা দারোয়ান ফটকের পাশের ছোট্ট একটা গুম্‌টি ঘর থেকে বার হয়ে বললে, কেয়া মাংতা বাবুজি?

কেদার হিন্দী বলতে পারেন না। উত্তর দিলেন, এ বাগানে কি আছে দারোয়ানজি?

—বাবুলোক হ্যায়—মাইজি ভি হ্যায়—যাইয়ে গা?

—হ্যাঁ, আমার এই মেয়ে একবারটি বাগান দেখতে এসেচে—

—যাইয়ে—

বেশ বাগান। প্রভাসদের বাগানের চেয়ে বড় না হোলেও, নিতান্ত ছোট নয়। অনেক রকম ফুলের গাছ, ফুল ফুটেও আছে অনেক গাছে—সানবাঁধানো পুকুরের ঘাট, খানিকটা জায়গা তার দিয়ে ঘেরা তার মধ্যে হাঁস এবং মুরগী আটকানো। খুব খানিকটা এদিক-ওদিক লিচুতলা ও আমতলার অন্ধকারে বেড়ানোর পরে ওরা একেবারে বাগানবাড়ীর সামনের সুরকি বিছানো পথে গিয়ে উঠলো। বাড়ীর বারান্দা থেকে কে একজন প্রৌঢ়কণ্ঠে হাঁক দিয়ে বললে, কে ওখানে?

কেদার বললেন, এই আমরা। বাগান দেখতে এসেছিলাম—

একটি পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের বৃদ্ধ ভদ্রলোক ধপধপে সাদা কোঁচানো কাপড় পরে খালি গায়ে রোয়াকে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন আসুন সঙ্গে মা রয়েচেন, তা উনি বাড়ীর মধ্যে যান না? আমার স্ত্রী আছেন—

শরৎ পাশ পাঁচীলের সরু দরজা দিয়ে অন্দরে ঢুকলো। কেদার রোয়াকে উঠতেই ভদ্রলোক তাঁকে নিয়ে উপরে চেয়ারে বসালেন। বললেন, কোন্ বাগানে আছেন আপনারা?

—এই ছুইখানা বাগানের পাশে। প্রভাসকে চেনেন কি বাবু?

—না আমি নতুন এ বাগান কিনেচি, কারুর সঙ্গে চেনা হয় নি এখনও। তামাক খান কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ তা খাই—তবে আমার আবার হাঙ্গাম আছে—ব্রাহ্মণের হুঁকো না থাকলে—

—আপনি ব্রাহ্মণ বুঝি? ও, বেশ বেশ। আমিও তাই, আমার নাম শশিভূষণ চাটুয্যে—'এড়োদার' চাটুয্যে আমরা। ওরে ও নন্দে, তামাক নিয়ে আয়—

দু'জনে কিছুক্ষণ তামাক খাওয়ার পরে চাটুয্যে মশাই বললেন, আচ্ছা, মশাই—এখানে টেক্স এত বেশি কেন বলতে পারেন—আমার এই বাগানে কোয়ার্টারে আট টাকা টেক্স। আপনি কত দেন বলুন তো। না হয় আমি একবার লেখালেখি করে দেখি—কলকাতায় আপনারা থাকেন কোথায়?

কেদার অপ্রতিভ মুখে বললেন, আমার বাগান নয়—আমাদের বাড়ী ত কলকাতায় নয়। বেড়াতে এসেচি দু-দিনের জন্যে—কলকাতায় থাকি নে—

ও, আপনাদের দেশ কোথায়? গড়শিবপুর? সে কোন জেলা? ও, বেশ বেশ।

—বাবু কি এখানেই বাস করেন?

—না, আমার স্ত্রীর শরীর ভাল না, ডাক্তারে বলেচে কলকাতার বাইরে কিছুদিন থাকতে। তাই এলাম—যদি ভাল লাগে আর যদি শরীর সারে তবে থাকবো দু-তিন মাস। বেশ হ'ল মশায়ের সঙ্গে আলাপ হয়ে। আপনার গানটান আসে?

কেদার সলজ্জ বিনয়ের সুরে বললেন, ওই অল্প অল্প।

—তবে ভালই হ'ল—দু'জনে মিলে বেশ একটু গান-বাজনা করা যাবে। কাল এখানে এসে বিকেলে চা খাবেন। বলা রইলো কিন্তু—বাজাতে পারেন?

—আজ্ঞে, সামান্য।

সামান্য টামান্য না। গুণী লোক আপনি, দেখেই বুঝেচি। এখন খালি গলায় একখানা শুনিয়ে দিন না দয়া করে? তার পর কাল থেকে আমি সব যোগাড়যন্ত্র করে রাখবো এখন।

কেদার একখানা শ্যামা বিষয় গান ধরলেন, কিন্তু অপরিচিত জায়গায় তেমন সুবিধে করতে পারলেন না, কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকতে লাগলো—সতীশ কলুর দোকানে বসে গাইলে যেমনটি তেমনটি কোনো দিনই হয়নি। চাটুয্যে মশাই কিন্তু তাই শুনেই খুব খুসি হয়ে ওঠে বললে, বাঃ বাঃ, বেশ চমৎকার গলাটি আপনার। এ সব গান আজকাল বড় একটা শোনাই যায় না—সব থিয়েটারি গান শুনে শুনে কান পচে গেল, মশাই। বসুন একটু চায়ের ব্যবস্থা করে আসি—

কেদার ভদ্রলোককে নিরস্ত করে বললেন, চা খেয়ে বেরিয়েছি, আমি দুবার চা খাইনে সন্দের পর, রাতে ঘুম হয় না, বয়েস হয়েছে তো—এবার আপনি বরং একটা—

চাটুয্যে মশায়ও দেখা গেল বিনয়ের অবতার। তিনি গান গাইলেন না, কারণ তিনি বললেন, একে তিনি গান গান না, কারণ গানের গলা নেই তাঁর। যাও বা একটু আধটু হুঁ হুঁ করতেন, কেদারের মত গুণী লোকের সামনে তাঁর গলা দিয়ে কিছুই বেরুবে না। অবশেষে অনেক অনুরোধের পর চাটুয্যে মশায় একটা রামপ্রসাদী গেয়ে শোনালেন—কেদারের মনে হোল তাঁদের গ্রামের যাত্রাদলের তিনকড়ি কামার এর চেয়ে অনেক ভাল গায়।

এ সময় শরৎ বাড়ীর মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে বললে, চলো বাবা, রাত হয়ে গেল।

চাটুয্যে মশায় বললেন, এটি কে? মেয়ে বুঝি? তা মা যে আমার

জগদ্ধাত্রী প্রতিমারই মত ঘর আলো-করা মা দেখছি। বিয়ে দেন নি এখনও?

বিয়ে দিয়েছিলাম চাটুয্যে মশাই—কিন্তু বরাত ভাল নয়, বিয়ের দু'বছর পরেই হাতের শাঁখা ঘুচে গেল। চলো মা, উঠি আজ চাটুয্যে মশাই, নমস্কার। বড় আনন্দ হোলো মাঝে মাঝে আসবো কিন্তু।

—আসবেন বৈ কি, রোজ আসবেন আর এখানে চা খাবেন। মাকেও নিয়ে আসবেন, মায়ের কথা শুনে মনে বড় দুঃখ হোল—উনি আমার এখানে একটু মিষ্টিমুখ করবেন একদিন। নমস্কার।

পথে আসতে আসতে শরৎ বললে, গিন্নী বেশ লোক বাবা। আমায় কত আদর করলে, জল খাওয়ানোর জন্যে কত পীড়াপীড়ি আমি খেলাম না, পরের বাড়ী খেতে লজ্জা করে—চিনি নে শুনি নে। আমায় আবার যেতে বলেছে।

—আমারও ভাল হোল, কর্ত্তা গান-বাজনা ভালবাসে, সখ আছে—এখানে সন্দেটা কাটানো যাবে—

ওরা নিজেদের বাগান-বাড়ীতে ঢুকেই দেখলে বাড়ীর সামনে প্রভাসের মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার পর বাড়ী পৌছেই প্রভাসের সঙ্গে দেখা হোল। সে বাড়ীর সামনে গোল বারান্দায় বসে ছিল, বোধ হয় এদের প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষায়। কাছে এসে বললে, কোথায় গিয়েছিলেন কাকাবাবু! আমি অনেকক্ষণ এসে বসে আছি। কিন্তু আজ যে বড্ড দেরী করে ফেললেন—সিনেমা যাবার সময় চলে গেল। সাড়ে ন'টার সময় যাবেন? প্রায় বারোটায় ভাঙবে।

শরৎ বললে, না প্রভাস-দা, অত রাত্রে ফিরলে বাবার শরীর খারাপ হবে। থাক না আজ, আর একদিন হবে এখন—

কেদার বললেন, তাই হবে এখন প্রভাস, আজ বড্ড দেরী হয়ে যাবে। তুমি তো আজ ও-বেলা এলে না—এ-বেলাও আমারা সন্দে পর্য্যন্ত দেখে

তবে বেরিয়েছি। কাল বরং যাওয়া যাবে এখন। বসো, চা খাও।

—না কাকা বাবু, আজ আর বসবো না। কাল তৈরি থাকবেন, আসবো বেলা পাঁচটার মধ্যে। কোনো অসুবিধে হচ্চে না?

—না না অসুবিধে কিসের? তুমি সেজন্যে কিছু ভেবো না।

পরদিন একেবারে দুপুরের পরই প্রভাস মোটর নিয়ে এল। শরৎ চা করে খাওয়ালে প্রভাসকে—তারপর সবাই মিলে মোটরে গিয়ে উঠলো। অনেক বড় বড় রাস্তা ও গাড়ী মোটরের ভিড় পেরিয়ে ওদের গাড়ী এসে একটা বড় বাড়ীর সামনে দাঁড়ালো। প্রভাস বললে, এই হোল সিনেমা ঘর—আপনারা গাড়ীতে বসুন, আমি টিকিট করে আনি—

শরৎ বাড়ীটার মধ্যে ঢুকে চারি দিকে চেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। কত উঁচু ছাদ, ছাদের গায়ে বড় বড় আলোর ডুম, গদি-আঁটা চেয়ার বেঞ্চি ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে, কত সাহেব মেম বাঙালীর ভিড়!

কেদার বললে,এ জায়গাটার নাম কি হে প্রভাস?

—আজ্ঞে এ হোল এলফিনষ্টোন পিকচার প্যালেস—একটা পার্শি কোম্পানী।

—বেশ বেশ। চমৎকার বাড়ীটা—না মা শরৎ? থাকি জঙ্গলে পড়ে, এমন ধারাটি কখনো দেখি নি—আর দেখবোই বা কোথায়? ইচ্ছে হয় সতীশ কলু, ছিবাস এদের নিয়ে এসে দেখাই। কিছুই দেখলে না ওরা, শুধু তেল মেপে আর দাঁড়ি-পাল্লা ধরেই জীবনটা কাটালে।

সারা ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। কেদার বলে উঠলেন—ও প্রভাস, এ কি হোল? ওদের আলো খারাপ হয়ে গেল বুঝি?

প্রভাস নিম্নস্বরে বললে, চুপ করুন কাকাবাবু, এবার ছবি আরম্ভ হবে।

সামনে সাদা কাপড়ের পর্দ্দাটার ওপরে যেন যাদুকরের মন্ত্রবলে মায়া-

পুরীর সৃষ্টি হয়ে গেল, দিব্যি বাড়ীঘর, লোকজন কথা বলছে, রেলগাড়ী ছুটছে, সাহেব মেমের ছেলেমেয়েরা হাসি খেলা করছে, কাপড়ের পর্দার ওপরে যেন আর একটা কলকাতা সহর।

কিন্তু ছবিতে কি করে কথা বলে? কেদার অনেক বার ঠাউরে দেখবার চেষ্টা করেও কিছু মীমাংসা করতে পারলেন না। অবিশ্যি এর মধ্যে ফাঁকি আছে নিশ্চয়ই, মানুষের পেছন থেকে কথা বলছে কৌশল করে, মনে হচ্ছে যেন ছবির মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে—কিন্তু কেদার সেটা ধরে ফেলবার অনেক চেষ্টা করেও কৃতকার্য্য হতে পারলেন না। একবার একটা মোটর গাড়ীর আওয়াজ শুনে কেদার দস্তুর মত অবাক হয়ে গেলেন। মানুষে কি মোটর গাড়ীর আওয়াজ বের করছে মুখ দিয়ে? বোধ হয় কোন কলের সাহায্যে ওই আওয়াজ করা হচ্ছে। কলে কি না হয়?

হঠাৎ সব আলো এক সঙ্গে আবার জ্বলে উঠলো। কেদার বললেন, শেষ হয়ে গেল বুঝি?

প্রভাস বললে, না কাকাবাবু, এখন কিছুক্ষণ বন্ধ থাকবে তার পর আবার আরম্ভ হবে। চা খাবেন কি? বাহিরে আসুন তবে?

শরৎ বললে, প্রভাসদা, দোকানের চা আর ওঁকে খাওয়ানোর দরকার নেই—সত্যি কি জাতের এটো পেয়ালায় চুমুক দিতে হবে—থাকগে। ওমা, ওই যে অরুণবাবু—উনি এলেন কোথা থেকে?

অরুণ কেদারকে প্রণাম করে বললে, কেমন লাগছে আপনার, ওঁর লাগছে কেমন? চলুন আজ সিনেমা ভাঙলে দমদমা পর্য্যন্ত আমাদের পৌছে দিয়ে অসেবো—

কেদার বললেন, বেশ, তাহলে আমাদের ওখানেই আজ খেয়ে আসবে দু'জনে—

—না আজ আর না, আর একদিন হবে এখন বরং।

এই সময় গিরীন বলে সেই লোকটিও এসে ওদের কাছে এসে দাঁড়ালো। প্রভাসকে সে কি একটা কথা বললে ইংরিজীতে।

প্রভাস বললে, কাকাবাবু, শরৎ দিদিকে আমার এই বন্ধু ওঁর বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্যে বলছেন।

কেদার বললেন, বেশ তো। আজই?

—হ্যাঁ আজ, বায়োস্কোপের পরে।

ছবি ভাঙবার পরে সবাই মোটরে উঠলো। গিরীন ও প্রভাস বসেছে সামনে, কেদার, অরুণ আর শরৎ পেছনের সিটে। একটা গলির মধ্যে যায় এমন একটা ছোট বাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। গিরিন নেমে ডাক দিলে—ও রবি, রবি?

একটি ছেলে এসে দোর খুলে দিলে। গিরীন বললে তোমার এই পিসিমাকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যাও—আসুন কেদারবাবু, বাইরের ঘরে আলো দিয়ে গিয়েছে।

সে বাড়ীতে বেশিক্ষণ দেরী হোল না। বাড়ীর মধ্যে থেকে সেই ছেলেটাই সকলকে চা ও খাবার দিয়ে গেল বাইরের ঘরে। একটু পরে শরৎ এসে বললে, চলো বাবা।

আবার দমদমার বাগানবাড়ী। রাত তখন খুব বেশী হয় নি—কেদার সুতরাং ওদের সকলকেই থেকে খেয়ে যেতে বললেন। হাজার হোক, রাজবংশের ছেলে তিনি। নজরটা তাঁর কোন কালেই ছোট নয়। কিন্তু ওরা কেউ থাকতে রাজী হ'ল না—তবে এক পেয়েলা করে চা খেয়ে যেতে কেউ বিশেষ আপত্তি করলে না।

কেদার জিগ্যেস করলেন রাত্রে খেতে বসে—ওই ছেলেটির বাড়ীতে তোকে কিছু খেতে দেয় নি?

—দিয়েছিল, আমি খাই নি। তুমি?

—আমায় দিয়েছিল, আমি খেয়েওছিলাম।

—তা আর থাবে না কেন? তোমার কি জাতজন্মো কিছু আছে? বাচবিচের বলে জিনিস নেই তোমার শরীরে।

—কেন?

—কেন? ওরা জাতে কি তার ঠিক নেই। বামুন নয়, কায়েতও নয়। আমি পরের বাড়ী গিয়ে কি করে তোমাকে বারণ করে পাঠাই?

—কি করে জানলে?

—ও মা, সে যেন কেমন। দু-তিনটি বৌ বাড়ীতে। সবাই সেজে গুজে পান মুখে দিয়ে বসে আছে। যে ছেলেটা দোর খুলে দিলে, ও বাড়ীর চাকর বলে মনে হ'ল। কেমন যেন—ভাল জাত নয় বাবা। একটি বৌ আমায় বেশ আদর যত্ন করেচে। বেশ মিষ্টি কথা বলে। আবার যেতে বললে। আমার ইচ্ছে হয় মাথা খুড়ে মরি বাবা, তুমি কেন ওদের বাড়ী জল খেলে? আমায় পান সেজে দিতে এসেছিল, আমি বললাম, পান খাই নে।

—তাতে আর কি হয়েচে?

—তোমার তো কিছু হয় না—কিন্তু আমার যে গা কেমন করে। আচ্ছা, গিরীনবাবুর বাড়ী নাকি ওটা?

—হ্যাঁ, তাই বললে।

অনেক জিনিসপত্র আছে বাড়ীতে। ওরা বড় লোক বলে মনে হ'ল। হারমোনিয়ম, কলের গান, বাজনার জিনিস—বেশ বিছানা পাতা চৌকি. বালিশ, তাকিয়া—দেওয়ালে সব ছবি। সেদিক থেকে খুব সাজানো-গোজানো।

—তা হবে না কেন মা, কলকাতার বড়লোক সব। এ কি আর আমাদের গাঁয়ের জঙ্গল পেয়েছ?

—তুমি আমাদের গাঁয়ের নিন্দে কোরো না অমন করে।

কেদার বললেন, তোদের গাঁ বুঝি আমাদের গাঁ নয় পাগলী?

আচ্ছা, বল তো তোর এখানে থাকতে আর ভাল লাগছে না গ্রামে ফিরতে ইচ্ছে হচ্চে ?

—এখন দুদিন এখানে থেকে দেখতে ইচ্ছে হয় বই কি বাবা। আমার কথা যদি বলো—আমার ইচ্ছে এখানে এখন কিছু দিন থেকে সব দেখি শুনি—গাঁ তো আছেই, সে আর কে নিচ্চে বলো।

পরদিন সকালে চাটুয্যে মশায় কেদারকে ডেকে পাঠালেন। সেখানে গানের মজলিস্ হবে সন্ধ্যায়। কেদারকে আসবার জন্যে যথেষ্ট অনুরোধ করলেন তিনি। মজলিসে শুধু শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত থাকলে চলবে না, কেদারকে গানও গাইতে হবে।

কেদার বললেন, আজ্ঞে, আমি বাজাতে পারি কিছু কিছু বটে—কিন্তু মজলিসে গাইতে সাহস করি নে।

—খুব ভাল কথা। কি বাজান বলুন ?

—বেহালা যোগাড় করতে পারেন বাবু ?

—বেহালা ওবেলা পাবেন। আনিয়ে রাখবো। সে দিন তো বলেন নি, আপনি বেহালা বাজাতে পারেন ? আপনি দেখছি সত্যিই গুণী লোক। ওবেলা এখানে আহার করতে হবে কিন্তু। বাড়ীতে মাকে বলে আসবেন।

—আমার মেয়ে যেখানে সেখানে আমায় খেতে দেয় না, তবে আপনার বাড়ীতে সে নিশ্চয়ই কোনো আপত্তি করবে না। তাই হবে।

—আপত্তি ওঠালেও শুনবো না তো কেদারবাবু ? মার সঙ্গে নিজে গিয়ে ঝগড়া করে আসবো। আচ্ছা তাঁকে—

—সে কোথাও খায় না। তাকে আর বলার দরকার নেই।

—বিকেলে চা-ও এখানে খাবেন—

বৈকালে কেদার সবে চাটুয্যে মশায়ের বাগানবাড়ীতে যাবার জন্যে

বার হয়েছেন, এমন সময় প্রভাসের গাড়ী এসে ঢুকলো ফটকে। প্রভাস গাড়ী থেকে নেমে বললে, কাকাবাবু কোথায় যাচ্ছেন?

কেদারের উত্তর শুনে প্রভাস হতাশের সুরে বললে, তাই তো, তা হলে আর দেখছি হোল না—

—কি হোল না হে?

শরৎ দিদিকে আজ একবার অরুণের বাড়ী আর আমার বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে এসেছিলাম, ওখান থেকে একেবারে নিউ মার্কেট দেখিয়ে—

—চলো একটু কিছু মুখে দিয়ে যাবে—এসো—

শরৎ ছুটে বাইরে এসে বললে, প্রভাস-দা! আসুন, আসুন—অরুণবাবু এসেছেন নাকি? বসুন প্রভাস-দা, চা খাবেন।

কেদার বললেন, বড় মুস্কিল হয়েছে মা, প্রভাস নিতে এসেছিল, এদিকে আমি যাচ্ছি চাটুয্যেবাবুদের গানের আসরে। না গেলে ভদ্রতা থাকে না—ওবেলা বার বার বলে দিয়েছেন—

প্রভাসও দুঃখ প্রকাশ করলে। শরৎ-দিদিকে সে নিজের বাড়ী ও অরুণের বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে এসেছিলাম—কিন্তু কাকাবাবু বেরিয়ে যাচ্ছেন—

শরৎ বললে, বাবা আমি যাই নে কেন প্রভাস-দার সঙ্গে? যাবো বাবা?

কেদার খুসীর স্বরে বললে, তা বরং ভালো বাবা। তাই যাও প্রভাস—তুমি শরৎকে নিয়ে যাও—তবে একটু সকাল সকাল পৌঁছে দিয়ে যেও—

প্রভাস বললে, আজ্ঞে, তবে তাই। আমি খুব শিগগির দিয়ে যাবো। সে বিষয়ে ভাববেন না।

প্রভাসের গাড়ী একটা বাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। প্রভাস—নেমে দোর খুলে বললেন, আসুন শরৎ-দি, ভেতরে আসুন।

শরৎ বললে, এটা কাদের বাড়ী প্রভাস-দা?

—এটা? এটা অরুণদেরই বাড়ী ধরুন—তবে অরুণ এখন বোধ হয় বাড়ী নেই—এল বলে।

শরৎকে নিয়ে গিয়ে প্রভাস একটা সুসজ্জিত ঘরে বসিয়ে ডাক দিলে ও বৌদি, বৌদি, কে এসেচে ভাখো—

শরৎ চেয়ে দেখলে ঘরটার মেজেতে ফরাস বিছানা পাতা, দেওয়ালে বেশির ভাগ বিলিতি মেম-সাহেবদের ছবি, একদিকে একটা ছোট তক্ত-পোষের ওপর একটা গদি পাতা বিছানা—তাতে বালিশ নেই, গোটা দুই ডুগি-তবলা এবং একটা বেলো-খোলা বড় হারমনিয়াম বিছানার ওপর বসানো। একটা খোল-মোড়া তানপুরা, দেওয়ালের কোণের খাঁজে হেলান দেওয়ানো খুব বড় একটা কাঁসার পিকদানি তক্তপোষের পায়াটার কাছে। একদিকে বড় একটা কাঁচের আলমারি—তার মধ্যে টুকিটাকি সৌখীন কাঁচের ও মাটির জিনিস, গোটাকতক ছোট বড় বোতল আরও কি কি। একটা বড় দেওয়াল ঘড়ি।

শরৎ ভাবলে—এদের বাড়ীতে গান-বাজনার চর্চ্চা খুব আছে দেখচি। বাবাকে এখানে এনে ছেড়ে দিলে বাবার পোয়া বারো—

একটি সুবেশা মেয়ে এই সময় ঘরে ঢুকে হাসিমুখে বললে, এই যে এসো ভাই—তোমার কথা কত শুনেচি প্রভাসবাবু ও অরুণবাবুর কাছে; এসো এই খাটের ওপর ভাল হয়ে বোসো ভাই—

মেয়েটিকে দেখে বয়েস আন্দাজ করা কিছু কঠিন হ'ল শরতের। ত্রিশও হতে পারে, পঁয়ত্রিশও হতে পারে—কম হবে না, বরং বেশিই হবে। কিন্তু কি সাজগোজ! মা গো, এই বয়েসে অত সাজগোজ কি গিন্নিবান্নি মেয়েমানুষের মানায়? আর অত পান খাওয়ার ঘটা!… পেটো-পাড়া চুলে ফিরিঙ্গি খোঁপা, গায়ে গহনাও মন্দ নেই—বাড়ীতে রয়েছে বসে এদিকে পায়ে আবার চটিজুতো—মখমলের উপর জরির কাজ করা। কলকাতার লোকের কাণ্ডকারখানাই আলাদা।

শরৎ গিয়ে খাটের ওপর বসলো বটে ভদ্রতা রক্ষার জন্যে—কিন্তু তার গা কেমন ঘিন ঘিন করছিলো। পরের বিছানার সে পারৎ পক্ষে কখনো বসে না—বিছানার কাপড় না ছাড়লে সংসারের কোনো জিনিসে সে হাত দিতে পারবে না—জলটুকু পর্য্যন্ত মুখে দিতে পারবে না। কথায় কথায় বিছানায় বসা আবার কি, কলকাতার লোকের আচার-বিচার বলে জিনিস নেই।

বৌটি তেমনি হাসিমুখে বললে, পান সাজবো ভাই? পানে দোক্তা খাও নাকি?

শরৎ মৃদু হেসে জানালে যে সে পান খায় না।

—পান খাও না—ওমা, তাই তো—আচ্ছা, দাঁড়াও ভাজা মশলা আনি—

—না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আবার ওসব কিছু লাগবে না।

প্রভাস বললে, শরৎ-দি, বৌদি খুব ভাল গান করেন, শুনবেন একখানা?

শরৎ উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, শুনবো বই কি, ভাল গান শোনাই তো হয় না—উনি যদি গান দয়া করে—

বাবার গান ও বাজনা শরৎ শুনচে বাল্যকাল থেকেই, কিন্তু লণ্ঠনের তলাতেই অন্ধকার, বাবার গান বাজনা তার তেমন ভাল লাগে না। এমন কি বাবা ভাল গাইতে পারেন বলেও মনে হয়না শরতের। অপরে শুনে বাবার গানের বা বাজনার কেন অত প্রশংসা করে শরৎ তা বুঝতে পারে না।

মাঝে মাঝে কেদার বলতেন গড়শিবপুরের বাড়ীতে—শরৎ শোনো মা এই মালকোষখানা বেহালার সুরের মূর্চ্ছনায় রাগিনী পর্দায় পর্দায় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতো—বাবার ছড় ঘুরোনোর কত কায়দা, ঘাড় দুলুনির কত

তন্ময় ভঙ্গি—কিন্তু শরৎ মনে মনে ভাবতো বাবার এসব কিছুই হয় না। এ ভালই লাগে না, বাবা হয়তো বোঝেন না, লোকে শুনে হাসে···

প্রভাস ওর বৌদিদির দিকে চেয়ে হেসে বললে, শুনিয়ে দাও একটা—

মেয়েটি মৃদু হেসে হারমোনিয়মের কাছে গিয়ে বসলো—তারপরে নিজে বাজিয়ে সুকণ্ঠে গান ধরলে

"পাখী ওইযে গাহিলি গাছে,
কেন পিক্ দিয়ে ঝোপে ডুবে গেলি যেমন এসেছি কাছে।"

শরৎ মুগ্ধ হয়ে শুনলে, এমন কণ্ঠ এমন সুর জীবনে সে কখনও শুনে নি। গড়শিবপুরের জঙ্গলে এমন গান কে কবে গেয়েছে? আহা, রাজলক্ষ্মীটা যদি আজ এখানে থাকতো! রাজলক্ষ্মী কত দুঃখদিনের সঙ্গিনী, তাকে না শোনাতে পারলে যেন শরতের অর্দ্ধেক আমোদ বৃথা হয়ে যায়। সুখের দিনে তার কথা এত করে মনে পড়ে!

গান থেমে গেলে শরতের মুখ দিয়ে আপনা আপনি বেরিয়ে গেল—কি চমৎকার!

মেয়েটি ওর দিকে চেয়ে হেসে হেসে কি একটা বলতে যাবে—এমন সময় একটি উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে দোরের কাছে এসে বললে, আজ এত গানের আসর বসল এত সকালে কে এসেছে গো তোমাদের বাড়ী? আমি বলি তুমি—

শরতের দিকে চোখ পড়াতে মেয়েটি হঠাৎ থেমে গেল। তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। ঘরে না ঢুকে সে দোরের কাছে রইল দাঁড়িয়ে।

মেয়েটির পরনে লাল রঙের জরিপাড় শাড়ী, খোঁপায় জড়ির ফিতে জড়ানো, নিখুঁত সাজগোজ, মুখে পাউডার। শরৎ ভাবলে, মেয়েটি হয়তো কোথাও নিমন্ত্রণ খেতে যাবে কুটুম্ববাড়ী, তাই এমন সাজগোজ করেছে।

প্রভাসের বৌদি বললে, এই যে গানের আসল লোক এসে গিয়েচে। কমলা, একে তোমার গান শুনিয়ে দাও তো ভাল—

কমলা বিষণ্ণমুখে বললে, তাই তো, আমার ঘরে যে এদিকে হরিবাবু এসে বসে আছে—আজ আবার দিন বুঝে সকাল সকাল—

প্রভাস ওকে চোক টিপলে মেয়েটী চুপ করে গেল।

প্রভাসও বললে, না তোমার একখানা গান না শুনে আমরা ছাড়চিনে—এদিকে এসো কমলা—

কমলাও হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান ধরলে। থিয়েটারি গান ও হালকা সুর—কলকাতার লোকে বোধ হয় এই সব গান পছন্দ করে। অন্য ধরণের গান তারা তেমন জানে না, কিন্তু গড়শিবপুরে ঠাকুরদেবতা, ইহকাল পরকাল, ভবনদী পার হওয়া গৌরাঙ্গ ও নদীয়া ইত্যাদি সংক্রান্ত গানের প্রাদুর্ভাব বেশি। বাল্যকাল থেকে শরৎ বাবার মুখে, কৃষ্ণযাত্রার আসরে, ফকির-বোষ্টমের মুখে এই সব গান এত শুনে আসচে যে কলকাতায় প্রচলিত এই সব নূতন সুরের নূতন ধরণের গান তার ভারি সুন্দর লাগলো। জীবনটা যে শুধু শ্মশান নয়, সেখানে আশা আছে, প্রাণ আছে, আনন্দ আছে—এদের গান যেন সেই বাণী বহন করে আনে মনে। শুধুই হতাশার সুর বাজে না তাদের মধ্যে।

শরৎ বললে, বড় চমৎকার গলা আপনার, আর একটা গাইবেন ?

বিনা প্রতিবাদে মেয়েটি আর একটা গান ধরলে, গান ধরবার সময় ঘরের মেজেতে বসানো এক জোড়া বাঁয়াতবলার দিকে চেয়ে প্রভাসকে কি বলতে যাচ্ছিল, প্রভাস আবার চোক টিপে বারণ করলে। আগের চেয়েও এবার চড়া সুর, দু-একটা ছোটখাটো তান ওঠালে গলায় মেয়েটি, দ্রুত তালের গান, শিরায় শিরায় যেন রক্ত নেচে ওঠে সুরে ও তালের মিলিত আবেদনে।

গান শেষ হলে প্রভাত বললে, কেমন লাগলো শরৎদি ?

—ভারি চমৎকার প্রভাস-দা, এমন কখনও শুনিনি—

কমলা এতক্ষণ পরে প্রভাসের বৌদিদির দিকে চেয়ে বললে, ইনি কে জান ?

প্রভাসের বৌদিদি বললে, ইনি ? প্রভাস বাবুদের দেশের—

শরৎ একথায় একটু আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলে, প্রভাসদার বৌদিদি তাকে 'প্রভাসবাবু' বলচেন কেন, বা যেখানে 'আমার শ্বশুরবাড়ীর দেশের' বলা উচিত সেখানে 'প্রভাস বাবুদের দেশের'ই বা বলচেন কেন ? বোধ হয় আপন বৌদিদি নন উনি।

কমলা বললে, বেশ, আপনার নাম কি ভাই ?

শরৎ সলজ্জ সুরে বললে, শরৎ সুন্দরী—

—বেশ নামটি তো।

প্রভাস বললে, উনি এসেচেন কলকাতা সহর দেখতে। এর আগে কখনও আসেন নি—

কমলা আশ্চর্য্য হয়ে বললে, সত্যি ? এর আগে আসেন নি কখনও ?

শরৎ হেসে বললে, না।

—আপনাদের দেশ কেমন ?

—বেশ চমৎকার। চলুন না একবার আমাদের দেশে—

—যেতে খুব ইচ্ছে করে—নিয়ে চলুন না—

—বেশ তো, আপনি আসুন, উনি আসুন—

মেয়েটি আর একটি গান ধরলে। এই মেয়েটির গলার সুরে শরৎ সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেল—সে এমন সুকণ্ঠি গায়িকার গান জীবনে কখনও শোনেনি—প্রভাসের বৌদিদির বয়েস হয়েচে, যদিও তাঁর গলা ভালো তবুও এই অল্পবয়সী মেয়েটির নবীন, সুকুমার কণ্ঠস্বরের তুলনায় অনেক খারাপ। শরতের ইচ্ছে হোল কমলার সঙ্গে ভাল করে আলাপ করে।

গান শেষ করে কমলা বললে, আসুন না ভাই, আমাদের ঘরে যাবেন ?...

—চলুন না দেখে আসি—

প্রভাস তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—না উনি এখনই চলে যাবেন, বেশিক্ষণ থাকবেন না—এখন থাক্‌গে—

কিন্তু শরৎ তবুও বললে, আসি না দেখে প্রভাস-দা ? এখুনি আসচি—

প্রভাস বিব্রত হয়ে পড়লো যেন। সে জোর করে কিছু বলতেও পারে না অথচ কমলার সঙ্গে শরৎ যায় এ যেন তার ইচ্ছে নয়। এই সময় হঠাৎ একটা লোক ঘরে ঢুকে অস্পষ্ট ও জড়িত স্বরে বলে উঠলো—আর এই যে কমল বিবি এখানে বসে, আমি সব ঘর ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি বাবা—বলি—প্রভাসবাবুও যে আজ এত সকালে—

প্রভাস হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে উঠে তাকে কি একটা বলে তাড়াতাড়ি বাইরে নিয়ে গেল। লোকটার ভাবভঙ্গি দেখে শরৎ আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলে—লোকটা পাগল নাকি ? অমন কেন ?

সে প্রভাসের বৌদিদিকে বললে, উনি কে ?

—উনি—এই হোল—আমাদের বাড়ীর—বাইরের ঘরে থাকেন—

—কমলার সম্পর্কে কে ?

—সম্পর্কে—এই ঠাকুরপো—

কমলার ঠাকুর পো কি রকম শরৎ ভাল বুঝলে না। লোকটির বয়স চল্লিশের কম নয়—তাহলে কমলার দোজবরে কি তেজবরে স্বামীর সঙ্গে বিয়ে হয়েচে নাকি ? না হলে অত বড় ঠাকুরপো হয় কি ক'রে ? কমলার ওপর কেমন একটু করুণা হোল শরতের। আহা, এমন মেয়েটি ! কমলাও একটু অবাক হয়ে প্রভাসের বৌদিদির দিকে চাইলে। সে যেন অনেক কিছুই বুঝতে পারচে না।

শরৎ জিজ্ঞেস করলে, আপনি প্রভাসদা'র কে হন?

কমলা কিছু বলবার আগে প্রভাসের বৌদিদি উত্তর দিলে, ও আমার পিসতুতো বোন হয়। এখানে থেকে পড়ে।

হঠাৎ শরৎ কমলার সিঁথির দিকে চাইলে। সত্যই তো, ওর এখনও বিয়ে হয়নি। এতক্ষণ সে লক্ষ্য করেনি। তবে আবার ওর ঠাকুরপো কি রকম করে হোল। শরতের বড় ইচ্ছে হচ্ছিল এ সব গোলমেলে সম্পর্কের একটা মীমাংসা সে করে ফেলে এদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে। কিন্তু দরকার কি, পরের বাড়ীর খুঁটিনাটি কথা জিজ্ঞেস ক'রে।

একটু পরে প্রভাস বাইরে থেকে ডাকলে, কমলা, তোমায় ডাকচেন —শুনে যাও—

কমলা চলে যাবার আগে হাত তুলে ছোট্ট একটা নমস্কার করে শরৎকে বললে, আচ্ছা, আসি ভাই—

—কেন আপনি আর আসবেন না?

—কি জানি যদি কোন কাজ পড়ে—

—কাজ সেরে আসবেন। যাবার আগে দেখা করেই যাবেন—

—আপনি কতক্ষণ আছেন আর?

প্রভাসের বৌদিদি বললেন, উনি এখনও ঘণ্টাখানেক থাকবেন—

কমলা বললে, যদি পারি আসবো তার মধ্যে—

ও চলে গেলে শরৎ প্রভাসের বৌদিদির দিকে চেয়ে বললে, বেশ মেয়েটি—

—কমলা তো? হ্যাঁ ওকে সবাই পছন্দ করে—

—বড় চমৎকার গলা—

—গানের মাষ্টার এসে গান শিখিয়ে যায় যে! এখন বোধ হয় সেই জন্যই উঠে গেল। আপনি বসুন চায়ের দেখি কি হোল—

শরৎ ব্যস্ত হয়ে বললে, না না, আপনি যাবেন না। আমি চা খেয়ে বেরিয়েচি—

—বেরুলেন বা। তা কখনও হয়? একটু মিষ্টিমুখ—

—না না—আমি এসময় কিছুই খাইনে—

—বসুন আমি আসচি।

—বসচি কিন্তু খাওয়ার জোগাড় কিছু করবেন না যেন। আমি সত্যই কিছু খাব না।

প্রভাস বললে, থাক বরং বৌদি, উনি এসময় কিছু খান না। ব্যস্ত হতে হবে না।

এই সময় অরুণ ও গিরিন বলে সেই লোকটা ঘরে ঢুকলো। শরৎ হাসিমুখে বললে, এই যে অরুণবাবু আসুন—

—দেখুন মাথায় টনক আছে আমার। কি করে জানলুম বলুন আপনি এখানে এসেচেন—

গিরিন প্রভাসকে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, কি ব্যাপার?

প্রভাস বিরক্ত মুখে বললে, আরে ওই হরি সা না কি ওর নাম সব মাটি করে দিয়েছিল আর একটু হোলে—এমন বেফাঁস কথা হঠাৎ বলে ফেললে—আমি বাইরে নিয়ে গিয়ে ধমকে দিলাম আচ্ছা করে। ভাগ্যিস পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, কিছু বোঝে না তাই বাঁচোয়া। কমলা বিবি আবার ঘর দেখাতে নিয়ে যাচ্ছিল ওর, কত কষ্টে থামাই। দেখলেই সব বুঝে না ফেলুক, সন্দেহ করতো।

—তারপর।

—তারপর তোমরা তো এসেচ, এখন পথ বাৎলাও—

—লিমনেড্ খাওয়াতে পারবে না?

—চা পর্য্যন্ত খেতে চাইছে না—তা লিমনেড্।

—ও এখানে থাকুক—চলো আমরা সব এখান থেকে সরে পড়ি।

—মতলবটা বুঝলাম না।

—এখানে দু-দিন লুকিয়ে রাখো। তারপর ওর বাবা ওকে আর নেবে না—ওর গ্রামে রটিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে দাও যে কোথায় ওকে পাওয়া গিয়েচে। পাড়াগাঁয়ের লোক, সমাজের ভয়ে ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

—তাই করো—কিন্তু মেয়েটিকে তুমি জানো না। যত পাড়াগেঁয়ে ভীতু মেয়ে ভাবচো, অতটা নয় ও। বেশ তেজী আর একগুঁয়ে মেয়ে। তোমার যা মতলব, ও কতদূর গড়াবে আমি বুঝতে পারচিনে। চেষ্টা করে দেখতে পারো।

—তুমি আমার হাতে ছেড়ে দাও, দেখ আমি কি করি—টাকা কম খরচ করা হয়নি এজন্যে—মনে নেই?

—হেনাকে ডাকো একবার বাইরে। হেনার সঙ্গে পরামর্শ কর। তাকে সব বলা আছে সে একটা পথ খুঁজে বার করবেই। কমলাকেও বোলো।

ওর বৌদিদি শরৎকে পাশের ঘরের সাজসজ্জা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। একটা খুব বড় ড্রেসিং টেবিল দেখে শরৎ খুসি হয়ে বললে, বেশ জিনিসটা তো? আয়নাখানা বড় চমৎকার, এর দাম কত ভাই?

—একশো পঁচিশ টাকা—

—আর এই খাটখানা?

—ও বোধ হয় পড়েছিল সত্তর টাকা—আমার ধীরেনবাবু—মানে আমার গিয়ে বাপের বাড়ীর সম্পর্কে ভাই—সেই দিয়েছিল।

—বিয়ের সময় দিয়েছিলেন বুঝি? এসবই তাহোলে আপনার বিয়ের সময় বরের যৌতুক হিসেবে—

—হ্যাঁ তাই তো।

—আপনার স্বামী এখনো বাড়ী আসেননি, আফিসে কাজ করেন বুঝি?

—হ্যাঁ।

—আপনার শাশুড়ী বা আর সব—ওদের সঙ্গে আলাপ হোল না।

—এবাড়ীতে আর কেউ থাকেন না। এ শুধ্ মানে আমাদের—উনি আর আমি—

—আলাদা বাসা করেচেন বুঝি? তা বেশ।

—হ্যাঁ। আলাদা বাসা। আফিস কাছে হয় কিনা? এ অনেক সুবিধে।

—তা তো বটেই।

—আপনি এইবার কিছু মুখে না দিলে সত্যিই ভয়ানক দুঃখিত হব ভাই।

বারবার খাওয়ার কথা বলাতে শরৎ মনে মনে বিরক্ত হোল। সে যখন বলাতে খাবে না, তখন তাকে পীড়াপীড়ি করার দরকার কি এদের? সে যে বিধবা মানুষ, তা এরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেচে, বিধবা মানুষ সব জায়গায় সব সময় খায় না—বিশেষ করে সে পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা, তার অনেক কিছু বাচবিচার থাকতে পারে, সে জ্ঞান দেখা যাচ্চে কলকাতার লোকের একেবারেই নেই।

শরৎ এবার একটু দৃঢ়স্বরে বললে, না আমি এখন কিছু খাবো না, কিছু মনে করবেন না আপনি।

প্রভাসের বৌদিদি আর কিছু বললে না এবিষয়ে। শরৎ ভাবলে, এদের সঙ্গে ব্যবহারে হয়তো সে ভদ্রতা বজায় রেখে চলতে পারবে না, কিন্তু কি করবে সে, কেন এ নিয়ে পীড়াপীড়ি করা? খাবে না বলেচে ব্যস্ মিটে গেল ওদের বোঝা উচিৎ ছিল।

আরও দু-পাঁচ মিনিট শরৎকে এ ছবি, ও আলমারী দেখানোর পরে

প্রভাসের বৌদিদি ওর দিকে চেয়ে বললে, ভাল, একটা অনুরোধ রাখো না কেন—আজ এখান থেকে যাও রাতটা।

শরৎ আশ্চর্য্য হয়ে বললে, এখানে? কি করে থাকবো?

—কেন, এই আলাদা ঘর রয়েচে। উনি বোধ হয় আজ আর আসবেন না। এক একদিন রাত্রে কাজ পড়ে কিনা? সারারাত আসতে পারেন না। একলা থাকতে হবে, তার চেয়ে তুমি থাকো ভাই, দুজনে বেশ গল্পে গুজবে রাত কাটিয়ে দেবো, তোমাকে আমার বড় ভাল লেগেচে।

কথা শেষ করে প্রভাসের বৌদিদি শরতের হাত ধরে আবদারের সুরে বললে, কথা রাখো ভাই, কেমন তো? তাহোলে প্রভাস বাবুকে—ইয়ে ঠাকুরপোকে বলে দিন আজ গাড়ী নিয়ে চলে যাক—তাই করি, বলি ঠাকুরপোকে।

শরৎ বিষন্ন মনে বলে উঠলো—না না তা কি করে হবে? আমি থাকতে পারবো না। বাবার পাশের বাড়ীতে চাটুয্যে মহাশয়ের ওখানে আজ রাত্রে নেমন্তন্ন আছে, তাই রান্না নেই, এতক্ষণ আছি সেই জন্যে। নইলে কি এখনও থাকতে পারতাম। বাবা একলাটি থাকবেন, তা কখনো হয়? তা ছাড়া তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠবেন যে! আমি তো আর বলে আসিনি যে কারো বাড়ী থাকবো, ফিরবো না। আর সে এমনিই হয় না? আপনার স্বামী যদি এসেই পড়েন হঠাৎ—

প্রভাসের বৌদিদি বললে, এসে পড়লে কিছুই নয়। তিনটে ঘর রয়েচে এখানে, তোমাকে ভাই এই ঘরে আলাদা বিছানা করে দেবো, কোনো অসুবিধে হবে না—থাকো ভাই প্রভাসকে বলি গাড়ী নিয়ে চলে যাবার জন্যে। বোসো তুমি এখানে—

—না, সে হয় না! বাবাকে কিছু বলা হয়নি, তিনি ভীষণ ভাববেন—

—প্রভাস কেন গাড়ীতে করে গিয়ে বাবার কাছে খবর দিয়ে

আসুক না যে তুমি আমাদের এখানে থাকবে—তা হোলেই তো সব চেয়ে ভাল হয়—তাই বলি—এই বেশ সব দিক দিয়ে সুবিধা হোল—তোমার পায়ে পড়ি ভাই, এতে অমত করো না।

শরৎ পড়ে গেল বিপদে। একদিকে তার অনুপস্থিতিতে তার বাবার সুবিধে অসুবিধের ব্যাপার অন্যদিকে প্রভাসের বৌদিদির এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ কোন্ দিকে সে যায়? অবিশ্যি একটা রাত এখানে কাটানো আর তেমন কি, সম্ভবতঃ ওর স্বামী আজ আফিসের কাজের চাপে বাড়ী ফিরতে পারবেন না বলেই আজ সঙ্গে রাখবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন—শোয়ারও অসুবিধে কিছু নেই, থাকলেই হোল—কিন্তু একটা বড় কথা এই যে সে বাড়ী না ফিরলে বাবা কি ভাবনাতেই পড়ে যাবেন! তবে বাবাকে যদি প্রভাসদা এখুনি খবর দিয়ে দেন—তবে আলাদা কথা।

সে সাতপাঁচ ভেবে কি একটা বলতে যাচ্ছিল এমন সময়ে কমলা এসে ঘরে ঢুকে বললে, বারে, এখানে সব যে, আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি—

প্রভাসের বৌদিদি উৎফুল্ল হয়ে উঠে বললে, বেশ সময়ে এসে পড়েছ কমলা—আমি ওকে বোঝাচ্ছি ভাই যে আজ রাতটা এখানে থেকে যেতে। উনি আজ আফিস থেকে আসবেন না, জানোই তো—দু-জনে বেশ একসঙ্গে গল্পগুজবে—কি বলো?

প্রভাস এবং তার দলবল একটু আগে বাহিরে কমলার সঙ্গে কি কথা বলেছে। সেই জন্যই তার এখানে আসা, যতদূর মনে হয়।

সে বললে, আমিও তাই বলি ভাই, বেশ সবাই মিলে মিশে—একটা রাত আপনাকে নিয়ে আমোদ করা গেল—

প্রভাসের বৌদিদি বললে, আর বড্ড ভাল লেগেচে তোমাকে তাই বলছি। কি বলো কমলা?

—তা আর বলতে! আমি তো ভাবছি একটা কিছু সম্বন্ধ পাতাবো—

এই মেয়েটীকে সত্যিই শরতের খুব ভাল লেগেছিল—বয়সে এ তার

সঙ্গিনী রাজলক্ষ্মীর চেয়ে কিছু বড় হবে, দেখতে শুনতে রূপসী মেয়ে বটে। সকলের ওপরে ওর গান গাইবার গলা···অনেক জায়গায় গান শুনেচে শরৎ—কিন্তু এমন গলার স্বর—

শরৎ আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠলো, বেশ সম্বন্ধ পাতাও না ভাই—আমি ভারি সুখী হবো—

—কি সম্বন্ধ পাতাবেন বলুন?

—আপনি বলুন—

প্রভাসের বৌদি'দি বললে, গঙ্গাজল? পছন্দ হয়?

কমলা উৎসাহের সুরে ঘাড় নেড়ে বললে, বেশ পছন্দ হয়। আপনারও হয়েচে তো? ··তবে তাই—কিন্তু আজ রাত্রে—

শরৎ আপন মনেই বলে গেল—তোমাকে ভাই আমাদের দেশে নিয়ে যাবো, যাবে তো? তোমার বয়সী একটী মেয়ে আছে রাজলক্ষ্মী, বেশ মেয়ে। আলাপ করিয়ে দেবো। আমাদের বাড়ী গিয়ে থাকবে। তবে হয়তো অত অজ পাড়াগাঁ তোমার ভাল লাগবে না—

—কেন লাগবে না, খুব লাগবে—আপনাদের বাড়ী থাকবো—

—জানো না তাই বলচো। আমাদের বাড়ী তো গাঁয়ের মধ্যে নয়—গাঁয়ের বাইরে, জঙ্গলের মধ্যে—

কমলা আগ্রহের সুরে বললে, কেন, জঙ্গলের মধ্যে কেন?

—আগে বড় বাড়ী ছিল, এখন ভেঙে চুরে জঙ্গল হয়ে পড়েচে, যেমনটি হয়—

—বাঘ আছে সেখানে?

শরৎ হেসে বললে, সব আছে, বাঘ আছে, সাপ আছে, ভূতও আছে—

কমলা ও প্রভাসের বৌদি'দি একসঙ্গে বলে উঠলো—ভূত! দেখেচেন?

—না, কথনো দেখিনি, ওসব মিথ্যে কথা। কিংবা চলো তোমরা একদিন, ভূত দেখতে পাবে।

প্রভাসের বৌদিদি বললে, আচ্ছা সে জঙ্গলে না থেকে কলকাতায় এসে থাকো না কেন ভাই। এখানে কত আমোদ-আহ্লাদ—তুমি এখানে থাকলে কত মজা করবো আমরা—তোমাকে নিয়ে মাসে মাসে আমরা থিয়েটারে যাবো, বায়স্কোপে যাবো—খাবো দাবো—কত আমোদ ফুর্ত্তি করা যাবে। গঙ্গায় ইষ্টিমার বেড়াতে যাবো, যাওনি কখনো বোধ হয়? চমৎকার বাগান আছে ওই শিবপুরের দিকে, সেখানে কত গাছপালা—

শরতের হাসি পেলে। গাছপালা দেখতে ইষ্টিমারে চেপে গঙ্গা বেয়ে কোথায় যেন যেতে হবে, কতদূর কলকাতায় এসে—তবে সে গাছপালা দেখতে পাবে। হায়রে গড়শিবপুরের জঙ্গল—এরা তোমাকে দেখেনি কখনো তাই এমন বলচে। সেখানে গাছ দেখতে রেলেও যেতে হয় না, ইষ্টিমারেও যেতে হয় না—ঘুম ভেঙে উঠে চোখ মুছে জানালা দিয়ে চাইলে দেখতে পাবে জঙ্গলের ঠ্যালা।

কমলাও বললে, তাই করুন—কলকাতায় চলে আসুন, কেমন থাকা যাবে—

প্রভাসের বৌদিদি বললে, এই আমাদের বাড়ীতেই থাকবে ভাই। মানে—আমাদের বাড়ীর কাছেও বাসা করে দেওয়া যাবে এখন। এমনি সাজিয়ে গুজিয়ে বেশ চমৎকার করে দেওয়া যাবে। কি ভাই সেখানে পড়ে আছ জঙ্গলে, কলকাতায় এসে বাস করে দেখো ভাই আমোদ ফুর্ত্তি কাকে বলে বুঝতে পারবে। আমাদের সঙ্গে থাকবে, একসঙ্গে বেড়াবো, দেখবো শুনবো, সে কি রকম মজা হবে বল দিকি ভাই? তোমার মত মানুষ পেলে তো—

কমলাও উৎসাহের সুরে বললে, আপনাকে পেয়ে আর ছাড়তে ইচ্ছে করচে না বলেই তো—

শরতের খুব ভাল লাগছিল ওদের সঙ্গ। এমন মন খোলা, আমুদে, তরুণী মেয়েদের সঙ্গ পাড়াগাঁয়ে মেলে না, এক আছে রাজলক্ষ্মী, কিন্তু সেও এদের মত নয়—এদের যেমন সুশ্রী চেহারা, তেমনি গলার সুর, এদের সঙ্গে একত্র বাস করা একটা ভাগ্যের কথা। কিন্তু ওরা যা বলচে, তা সম্ভব হবে কি করে? এরা আসল ব্যাপারটা বোঝে না কেন?

সে বললে, ভাল তো আমারও লেগেচে আপনাদের। কিন্তু বুঝচেন না? কলকাতায় বাবা থাকবেন কি করে? তেমন অবস্থা নয় তো তাঁর? এই হোল আসল কথা।

প্রভাসের বৌদিদি হেসে বললে, এই! এজন্যে কোনো ভাবনা নেই তোমার ভাই। এখন দিনকতক আমাদের বাসাতে থাকো না—তারপর এর পর একটা দেখে শুনে নিলেই হবে এখন। আর তোমার বাবা? উনি যে আফিসে কাজ করেন, সেখানে একটা কাজটাজ—

—সে কাজ বাবা করতে পারেন না। ইংরিজি জানেন না—উনি জানেন গান-বাজনা, বেশ ভাল বেহালা বাজাতে পারেন—

প্রভাসের বৌদিদি কথাটা যেন লুফে নিয়ে বললে, বেশ, বেশ—তবে তো আরও ভাল। নরেশবাবু থিয়েটারেই তো কাজ করেন—তিনি ইচ্ছে করলে—

শরৎ বললে, নরেশবাবু কে?

—নরেশ বাবু!—এই গিয়ে—ওঁর একজন বন্ধু। আমাদের বাসায় প্রায়ই আসেন টাসেন কিনা?

শরৎ একটুখানি কি ভেবে বললে, কিন্তু বাবা কি গাঁ ছেড়ে থাকতে পারবেন? আমার সহর দেখা শেষ হয়নি বলে তিনি এখনও বাড়ী যাবার জন্যে পেড়াপীড়ি করচেন না—নইলে এতদিন উদ্বাস্ত করে তুলতেন না আমাকে। নিতান্ত চক্ষু লজ্জায় পড়ে কিছু বলতে পারচেন না। তিনি টিক্‌বেন সহরে? তবেই হয়েছে!

প্রভাসের বৌদিদি বললে, আচ্ছা, এক কাজ করো না কেন?

—কি?

—তুমিই কেন থাকো না এখন দিনকতক? এই আমাদের সঙ্গেই থাকো। তোমার বাবা ফিরে যান দেশে, এরপরে এসে তোমাকে নিয়ে যাবেন। আমাদের বাড়ীতে আমাদের বন্ধু হয়ে থাকবে, টাকা-কড়ির কোনো ব্যাপার নেই এর মধ্যে—তোমায় মাথায় করে রেখে দেবো ভাই। বড্ড ভাল লেগেচে তোমাকে, তাই বলচি। কি বলিস্ কমলা? তুই কথা বলচিস নে যে—বল্ না তোর গঙ্গাজলকে।

কমলা বললে, হ্যাঁ, সে তো বলচিই—

প্রভাসের বৌদিদি বললে, সে সব গেল ভবিষ্যতের কথা। আপাততঃ আজ রাত্রে তুমি এখানে থাকো। প্রভাস গিয়ে খবর দিয়ে আসুক তোমার বাবাকে। রাজি?

শরৎ দ্বিধার সঙ্গে বললে, আজ? তা—না ভাই আজ বরং আমায় ছেড়ে দাও—কাল বাবাকে বলে—

—তাতে কি ভাই! প্রভাস-ঠাকুরপো গিয়ে এখুনি বলে আসচে। যাবে আর আসবে—ডাকি প্রভাসবাবুকে—তুমি আর অমত কোরো না। বসো আমি আসচি—তুমি থাকলে কমলাকে দিয়ে সারারাত গান গাওয়াবো।

শরৎ এমন বিপদে কখনো পড়েনি।

কি সে করে এখন? এদের অনুরোধ এড়িয়ে চলে যাওয়াও অভদ্রতা—যখন এতটাই পীড়াপীড়ি করচে তার থাকার জন্যে, থাকলে মজাও হয় বেশ কমলার গান শুনতে পাওয়া যায়।

কিন্তু অন্যদিকে বাবাকে বলে আসা হয়নি, বাবা কি মনে করতে পারেন। তবে প্রভাস-দা যদি মোটরে করে গিয়ে বলে আসে, তবে অবিশ্যি বাবার ভাব্বার কারণ ঘটবে না। তবুও কি তার নিজের মন

তাতে শান্তি পাবে। কোথায় বাগানের মধ্যে নির্জ্জন বাড়ী, সেখানে একলাটি পড়ে থাকবেন বাবা, রাত্রে যদি কিছু দরকার পড়ে তখন কাকে ডাকবেন, কে তাঁকে দেখে?

সে ইতস্ততঃ করে বললে, না ভাই, আমার থাকবার যো নেই—আজ ছেড়ে দাও, বাবাকে বলে কাল আসবো।

হঠাৎ প্রভাসের বৌদিদি উঠে হাত বাড়িয়ে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে বললে, যাও দিকি কেমন করে যাবে ভাই? কক্ষণো যেতে দেবো না—কই, যাও তো কেমন করে যাবে? এমন আমোদটা আমাদের মাটি করে দিয়ে গেলেই হোল।

শরৎ তার কাণ্ড দেখে হেসে ফেললে।

এমন সময় বাইরে থেকে প্রভাসের গলা শুনতে পাওয়া গেল—ও বৌদিদি—

প্রভাসের বৌদিদি বললে, দাঁড়াও ভাই আসচি—ঠাকুরপো ডাকচে—বোধহয় চা চান, বন্ধু-বান্ধব এসেচে কিনা? ঘন ঘন চা—

সে বাইরে যেতেই প্রভাস তাকে বারান্দার ও প্রান্তে নিয়ে গিয়ে বললে, কি হোল?

তার সঙ্গে অরুণ ও গিরিনও ছিল। গিরিন ব্যস্তভাবে বললে, কতদূর কি করলে হেনা?

—বাবাঃ—সোজা একগুঁয়ে মেয়ে। কেবল বাবা আর বাবা। এত বোঝাচ্ছি, এত কাণ্ড করচি, এখনও মাথা হেলায় নি—কমলা আবার চোক মেরে চুপ করে রয়েচে। আমি একা বকে বকে মুখে বোধহয় ফেনা তুলে ফেল্লাম—ধন্যি মেয়ে যা হোক্। যদি পারি, আমায় একশো কিন্তু পুরিয়ে দিতে হবে। কমলা কিছুই করচে না—ওর টাকা—

গিরিন বিরক্তির সুরে বললে, আরে দূর্ টাকা আর টাকা। কাজ

উদ্ধার কর আগে—একটা পাড়াগেঁয়ে মেয়েকে সঙ্গে থেকে ভুলোতে পারলে না—তোমরা আবার বুদ্ধিমান, তোমরা আবার সহুরে—

প্রভাসের বৌদিদি মুখনাড়া দিয়ে বলে উঠলো—বেশ, তুমি তো বুদ্ধিমান, যাও না, ভজাও গে না, কি মুরোদ। তেমন মেয়ে নয় ও—আমি ওকে চিনেচি। মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মেচি, আমরা চিনি মেয়েমানুষ কে কি রকম। ও একেবারে বনবিছুটি—তবে পাড়াগাঁ থেকে এসেচে, আর কখনো কিছু দেখেনি—তাই এখনও কিছু সন্দেহ করেনি, নইলে ওকে কি যেমন তেমন মেয়ে পেয়েচ?

প্রভাস বিরক্ত হয়ে বললে, যাক্, আর এক কথা বার বার বলে কি হবে? সোজা কাজ হোলে তোমাকে বা আমরা টাকা দিতে যাবো কেন হেনা বিবি, সেটাও তো ভাবতে হয়—

হেনা বললে, এবার যেন একটু নিমরাজি গোছের হয়েচে—দেখি—

হেনা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল এবং মিনিট পাঁচেক পরেই হাসিমুখে বার হয়ে এসে বললে, কই ফেল তো দেখি টাকা?

ওরা সবাই ব্যস্ত ও ঔৎসুক ভাবে বলেউঠলো—কি হোল? রাজি হয়েচে?

হেনা হাসিমুখে ঘাড় দুলিয়ে বাহাদুরির সুরে বললে, এ কি যার তার কাজ? এই হেনা বিবি ছিল তাই হোল। দেখি টাকা? আমি যাকে বলে—সেই সেই পাতায় পাতায় বেড়াই—তাই—

গিরিন বিরক্তির সুরে বললে, আঃ কি হোল তাই বলো না? গেলে আর এলে তো?

—আমি গিয়েই বললাম, ভাই, প্রভাস ঠাকুরপোকে বলে এলাম তোমার বাবাকে খবর দিতে। সে গাড়ী নিয়ে এখুনি যাচ্ছে বললে। আমি জোর করে কথাটা বলতেই আর কোন কথা বলতে পারলে না। কেবল বললে, প্রভাসদা যাবার আগে আমার সঙ্গে যেন দেখা করে যায়—

বাবাকে কি বলতে হবে বলে দেবো—কমলা কিন্তু কিছু করচে না, মুখ বুঁজে গিন্নি শকুনির মত বসে আছে।

গিরিন বললে, না প্রভাস, তুমি এখান থেকে সরে পড়, হেনা গিয়ে বলুক তুমি চলে গিয়েচ—তুমি এসময় সামনে গেলে একথাও বলতে পারে যে আমিও ওই গাড়ীতে বাবার কাছে গিয়ে নিজেই বলে আসি। তা ছাড়া তোমার চোখমুখ দেখে সন্দেহ করতে পারে—হেনার মত তুমি পারবে না—ও হোল এ্যাক্‌ট্রেস্, ও যা পারবে, তা তুমি আমি পারতে—

হেনা বললে, বঙ্গরস থিয়েটারে আজ পাঁচটি বছর কেটে গেল কি মিথ্যে মিথ্যে? ম্যানেজার সেদিন বলচে, হেনাবিবি, তোমাকে এবার ভাবচি সীতার পার্ট দেবো—সেদিন আমার রাণীর পার্ট দেখে—ও কি ওই কম্‌লির কাজ? অনেক তোড়জোড় চাই—

গিরিন বললে, যাক্ ও সব কথা, কে কোথা দিয়ে শুনে ফেলবে। এত পরিশ্রম সব মাটি হবে। খসে পড়ো প্রভাস—তোমাকে আর না দেখতে পায়—মন আবার ঘুরে যেতে কতক্ষণ, যদি বলে বসে না, আমি প্রভাসদা'র মোটরে বাবার কাছে যাবো। আর কে যাচ্ছে এখন এত রাত্রে সেই পাগলা বুড়োটার কাছে?

প্রভাস ইতস্ততঃ করে বললে, তবে আমি যাই?

—যাও—তোমায় আর না দেখতে পায়—পায়ের বেশি শব্দ কোরো না।

—তোমরা? তোমাদেরও এখানে থাকা উচিত হবে না তা বুঝচ?

—আমরা যাচ্ছি। তুমি আগে যাও—কারণ তুমি চলে গেলে ওর হাতের তীর ছাড়া হয়ে যাবে, আর তো ও মত বদলাতে পারবে না?

হেনা বললে, আজ রাত্তিরটা কোনো রকম বেতাল না দেখে ও। তোমরা ওই হরি সা লোকটাকে আগলে রাখো—

অরুণ বললে, কোথায় সে?

প্রভাস বললে, আমি তাকে কমলির ঘরে বসিয়ে রেখে এসেচি। কিন্তু এখন যা আছে, আর দু-ঘণ্টা পরে ও তা থাকবে না। ওকে চেনো তো? চীনে বাজারের অত বড় দোকানটা ফেল করেচে এই করে। বোকা তাই রক্ষে। ওকে সরিয়ে দাও বাবা, আজ রাত্তিরের মত—

গিরিন বললে, যাও না তুমি? কেন দাঁড়িয়ে বক্‌বক্ করচো?

প্রভাস চলে যেতে উদ্যত হোলে গিরিন তাকে বললে, কোথায় থাকবে?

—আজ বাড়ী চলে যাই—বাবা সন্দেহ করবেন, বেশি রাত্তিরে বাড়ী ফিরলে—

—ভাল কথা, তোমার বাবার সঙ্গে তো ওর বাবার খুব আলাপ, সেখানে গিয়ে সন্ধান নেবে না তো বুড়ো?

প্রভাস হেসে বুড়ো আঙুল নেড়ে বললে—হুঁ হুঁ বাবা—সে গুড়ে বালি! অত কাঁচা ছেলে আমি নই। বাবা তো বাবা, বাড়ীর কেউই ঘুণাক্ষরেও কিছু জানে না। বাবাও কেদারকে ভুলে গিয়েচেন, দু-জনের দেখাশুনো নেই কতকাল। দেখলে কেউ হঠাৎ হয়তো চিনতে পারবে না। তার ওপর আমাদের বাড়ী কেদার বুড়ো জানবে কি করে? ঠিকানা জানে না, নম্বর জানে না—কোনোদিন শোনেও নি। আর এ কলকাতা সহর, বুড়ো না চেনে রাস্তাঘাট। সে দিকে ঠিক আছে।

প্রভাস সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে গেল।

অরুণ একটু দ্বিধাগ্রস্ত সুরে বললে, কাজটা তো এক রকম যা হয় এগুলো—শেষে পুলিশের কোনো হ্যাঙ্গামায় পড়বো না তো?

—কিসের পুলিশের হ্যাঙ্গামা? নাবালিকা তো নয়, ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের ধাড়ি—আমরা প্রমাণ করবো ও নিজের ইচ্ছেয় এসেচে।

ওকে এ জায়গায় কেন পাওয়া গেল—একথার কি জবাব দেবে ও? আমি বুঝিনি বললে, কেউ বিশ্বাস করবে? নেকু?

—তা ধরো ও পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, সত্যিই ওর বয়েস হয়েচে বটে, কিন্তু এসব কিছু জানে না বোঝে না। দেখতেই তো পেলে—একটু সন্দেহ জাগলে ওকে রাখতে পারতো হেনা? তা জানে নি। এমন জায়গাও কখনো দেখেনি, জানে না। যদি এই সব কথা প্রমাণ হয় আদালতে?

গিরিন আত্মম্ভরিতার সুরে বললে, শুধু দেখে যাও আমি কি করি। গিরিন কুণ্ডুকে তোমরা সোজা লোক ঠাউরো না—

অরুণ বললে, আর একটা কথা। সে না হয় বুঝলাম—কিন্তু ওসব ঘরের মেয়ে, যখন সব বুঝে ফেলবে, তখন আত্মহত্যা করে বসে যদি? ওরা তা পারে।

গিরিন তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, হাঁ—রেখে দাও ওসব। মরে সবাই—দেখা যাবে পরে—

—আজ চলো আমরা এখান থেকে যাই—

—এখন?

—আমার মনে হয় তাই উচিত। কোনো সন্দেহ না জাগে মনে—এটা যেন মনে থাকে।

হেনাকে সন্তর্পণে বাইরে আনিয়ে গিরিন বললে, আমরা চলে যাচ্ছি হেনাবিবি। রেখে গেলাম কিন্তু—

হেনা বললে, আমি বাবু পুলিশের হ্যাঙ্গামে যেতে পারবো না, তা বলে দিচ্ছি। কাল দুপুর পর্যান্ত ওকে এখানে রাখা চলবে। তারপর তোমরা কোথায় নিয়ে যাবে যেও—আমার টাকা চুকিয়ে দিয়ে।

গিরিন বললে, কেন, আবার নতুন কথা বলচো কেন? কি শিখিয়ে দিয়েছিলাম?

—সেবাপু' হবে না। ও বেজায় একগুঁয়ে মেয়ে। আগে যা ভেবেছিলাম তা নয়—ও শুধু বুঝতে পারেনি তাই এখানে রয়ে গেল। নইলে রসাতল বাধাতো এতক্ষণ। আর একটা কথা কি, কিছুতেই খাচ্ছে না, এত করে বলচি, নানারকম ছুতো করচে, পাড়াগাঁয়ের বিধবা মানুষ, ছুঁচিবাই গো ছুঁচিবাই। কেন খাচ্ছে না আমি আর ওসব বুঝিনে? আমি মানুষ চরিয়ে খাই—

অরুণ বললে, মানুষ চরাও নি কখনো হেনাবিবি, ভেড়া চরিয়েচ। এবার মানুষ পেয়েচ, চরাও না দেখি। বুঝলে?

ওরা দু-জনে নীচে নেমে গেল

চাটুয্যে মশায়ের বাড়ীর গানের আসর ভাঙলো রাত এগারোটায়। তারপরে খাওয়ার জায়গা হোল, প্রায় ত্রিশজন লোক নিমন্ত্রিত, আহারের ব্যবস্থাও চমৎকার। যেমন আয়োজন, তেমনি রান্না। কেদার এক সময়ে খেতে পারতেন ভালই, আজকাল বয়েস হয়ে আসচে, তেমন আর পারেন না—তবুও এখনও যা খান, তা একজন ওই বয়েসের কলকাতার ভদ্রলোকের বিস্ময় ও ঈর্ষ্যার বিষয়।

বাড়ীর কর্ত্তা চাটুয্যে মশায় কেদারের পাতের কাছে দাঁড়িয়ে তদারক করে তাঁকে খাওয়ালেন। আহারাদির পরে বিদায় চাইলে বললেন, আবার আসবেন কেদারবাবু, পাশেই আছি—আমরা তো প্রতিবেশী। আপনার বাজনার হাত ভারি মিঠে, আমার স্ত্রী বলছিলেন—উনি কে? আমি বললাম, আমাদের পাশের বাগানেই থাকেন—এসেচেন বেড়াতে। আহা আজ যদি আপনার মেয়েটিকে আনতেন—বড় ভাল হোত, আমার স্ত্রী বলছিলেন—

আজ্ঞে হ্যাঁ—তা তো বটেই। তার এক দাদা এসে তাকে নিয়ে

গেল বেড়াতে কিনা? মানে গ্রাম-সম্পর্কের দাদা হোলেও খুব আপনা-আপনি মত। কলকাতায় তাদের বাড়ী আছে—সেখানেই নিয়ে গেল। মটোর গাড়ী নিয়ে এসেছিল। তা আর একদিন নিয়ে আসবো—

—আনবেন বই কি, মাকে আনবেন বই কি—বলা রইল, নিশ্চয় আনবেন—আচ্ছা নমস্কার, কেদারবাবু—

কেদারের সঙ্গে চাটুয্যে মশায় একজন লোক দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কেদার তা নিতে চান নি। তিনি গানের আসরের শেষ দিকে একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, মেয়ে এসে একা থাকবে বাগানবাড়ীতে। গাঁয়ে গড়বাড়ীর বনের মধ্যে মেয়েকে ফেলে রেখে যেতেন প্রায় প্রতি রাত্রেই, সে কথা ভেবে এখন তাঁর কষ্ট হোল। তবুও সে নিজের গ্রাম, পূর্ব্বপুরুষের ভিটে, সেখানকার কথা স্বতন্ত্র।

গেট দিয়ে ঢুকবার সময় কেদার দেখলেন, কোন ঘরে আলো জ্বলচে না। শরৎ তা হোলে হয় তো সারাদিন ঘুরে ফিরে এসে ক্লান্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েচে। আহা, কত আর ওর বয়েস, কাল তো এতটুকু দেখলেম ওকে—দেখুক শুনুক আমোদ করুক না?

বাড়ীর রোয়াকে উঠে ডাকলেন, ও শরৎ—মা শরৎ উঠে দোরটা খোল, আলোটা জ্বালো—

সাড়া পাওয়া গেল না।

কেদার ভাবলেন—বেশ ঘুমিয়ে পড়েচে দেখচি—বড্ড ঘুম-কাতুরে, গড়শিবপুরে এক-একদিন এমন ঘুমিয়ে পড়তো—ছেলেমানুষ তো হাজার হোক্—হুঁ—

পুনরায় ডাক দিলেন—ও মা শরৎ, ওঠো, আলো জ্বালো—

ডাকাডাকিতে ঝি উঠে আলো জ্বেলে রান্না ঘরের বারান্দা থেকে এসে বললে, কে—বাবু? কই দিদিমণি তো আসেন নি এখনও—

কেদার বিস্ময়ের সুরে বললেন, আসে নি? বাড়ী আসে নি?

তুই ঘুমিয়ে পড়েছিলি, জানিস নে হয় তো—আর—সে হয় তো আর ডাকে নি—চল ঘরে, আলো জ্বাল—

ঝি বললে, চাবি দেওয়া রয়েচে যে বাবু, এই আমার কাছে চাবি। দোর খুলবে, আমার কাছ থেকে চাবি নেবে, তবে তো ঢুকবে ঘরে। কি যে বলো বাবু!

তাই তো, কেদার সে কথাটা ভেবে দেখেন নি। চাবি রয়েচে যখন ঝিয়ের কাছে তখন শরৎ দোর খুলবে কি করে।

ঝি বললে, আমি সন্দে থেকে বসে ছিনু এই রোয়াকে, এই আসে, এই আসে—বলি মেয়েমানুষ একা থাকবে? এসব জায়গা আবার ভাল না। বাগানবাড়ী, লোকজনের গতাগম্যি নেই—রাত্তির কাল। আমি শুয়ে থাকবো'খন দিদিমণির ঘরে—রান্নাঘরে আটা এনে রেখেচি, ঘি এনে রেখেচি, যদি এসে খাবার করে খায়—

কেদার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন—ঝিয়ের দীর্ঘ উক্তির খুব সামান্য অংশই তাঁর কর্ণগোচর হোল। ঝিয়ের কথার শেষের দিকে প্রশ্ন করলেন—কে খাবার করে খেয়েচে বললে?

—খাইনি গো খায়, 'যদি খায় তাই এনে রাখনু সব গুছিয়ে। আটা ঘি—

কেদার বললেন, তাই তো ঝি, এখনও এল না কেন বল দেখি? বারোটা বাজে—কি তার বেশীও হয়েচে—

—তা কি করে বলি বাবু।

—হাঁ। ঝি, থিয়েটার দেখতে যায়নি তো? তা হোলে কিন্তু অনেক রাত হবে। না?

—তা জানিনে বাবু।

রাত একটা বেজে গেল—দুটো। কেদারের ঘুম নেই, বিছানায় শুয়ে উৎকর্ণ হয়ে আছেন, বাগানবাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়েও অত

রাতেও দু-একখানা মোটর বা মাল লরীর যাতায়াতের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, কেদার অমনি বিছানার ওপর উঠে বসেন। এই এতক্ষণে এল প্রভাসের গাড়ী! কিছুই না।

আবার শুয়ে পড়েন।

নয়তো উঠে তামাক সাজেন বসে বসে, তবুও একটু সময় কাটে।

হলের ঘড়িতে টং টং করে তিনটে বাজলো।

কত রাত্রে কলকাতার থিয়েটার ভাঙ্গে! কারণ এতক্ষণে তিনি ঠিক করেই নিয়েছেন যে প্রভাস ওকে থিয়েটার দেখাতে নিয়ে গিয়েছে, প্রভাস এবং অরুণের বাড়ীর সবাই গিয়েছে, মানে মেয়েরা। তাদের সঙ্গেই—তা তো সব বুঝলেন তিনি, কিন্তু থিয়েটার ভাঙ্গে কত রাত্রে? কাকে জিজ্ঞেস করেন এত রাত্রে কথাটা! আবার শুয়ে পড়লেন। একবার ভাবলেন, গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কি দেখবেন? শেষ রাত্রে কখন ঘুম এসে গিয়েছিল চোখে তাঁর অজ্ঞাতসারে, যখন কেদার ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠলেন, উঃ এ দেখচি রোদ উঠে বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে।

ডাকলেন—ও ঝি—ঝি—

ঝি এসে বললে, আমি বাজারে চললু বাবু, এর পরে মাছ মিলবে না, ওই মুখপোড়া ইটের কলের বাবুগুনো হয়ে শেয়ালের মত—

—হাঁারে শরৎ আসে নি?

—না, বাবু, কই? এলে তো তখোনি উঠে দরজা খুলে দিতাম বাবু। আমার ঘুম বড্ড সজাগ ঘুম।

ঝি বাজারে চলে গেল। কেদারের মনে এখন আর ততটা উদ্বেগ নেই। তিনি এইবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। অনেক রাত্রে থিয়েটার ভেঙ্গে গেলে প্রভাসের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে শরৎ তাদের বাড়ীতে গিয়ে শুয়েছে—এ তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার। রাত্রের

অন্ধকারে মানুষের মনে ভয় ও উদ্বেগ আনে, দিনের আলোয় তাঁর মনের দুশ্চিন্তা কেটে গিয়েছে। মিছেমিছি ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই এর মধ্যে। কলকাতার জীবন-যাত্রা প্রণালী গড়শিবপুরের সঙ্গে এক নয়—এ তাঁর আগেই বোঝা উচিত ছিল।

কেদার নিজেই জল ফুটিয়ে চা করে খেলেন, ঝি দোকান থেকে খাবার নিয়ে এল—আটটা ন'টা, দশটা বাজলো, কেদার ঝিকে বলে দিয়েছিলেন কি কি আনতে হবে, মেয়ে এসে মাছ রাঁধবে বলে ভাল মাছও আনতে দিয়েছেন—ঝি বাজার থেকে ফিরে এল, অথচ এখনও শরতের সঙ্গে দেখা নাই। বাজার পড়ে রইল, ঝি জিজ্ঞেস করল—দিদিমণি তো এখনও এলো না, মাছ কি কুটে রাখবো।

—রেখে দে। হয় তো গঙ্গাচ্চান করে আসবে।

যখন বারোটা বেজে গেল, তখন ঝি এসে বললে, বাবু রান্নাটা আপনিই চড়িয়ে নিন না কেন? আমার বোধ হয় দিদিমণি এবেলা আর এলেন না। না খেয়ে কতক্ষণ বসে থাকবেন।

কিন্তু কেদার বড় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন।

আজ একটা ব্যাপার তাঁর কাছে আশ্চর্য্য ঠেকছিল, সেটা এই, শরৎ যত আমোদের মধ্যেই কেন থাকুক, বাবাকে ভুলে তাঁর জন্যে রান্নার কথা ভুলে সে কোথাও থাকবে না। জীবনে সে কথনও তা করেনি। যতই কালীঘাটেই যাক আর গঙ্গাস্নানই করুক—বাবার খাওয়া হবে না দুপুরে, এ চিন্তা তাকে বৈকুণ্ঠের দ্বার থেকেও ফিরিয়ে আনবে।

অথচ একি রকম হোল!

মহামুস্কিলে পড়ে গেলেন কেদার।

প্রভাসের বাড়ীর ঠিকানা জানেন না তিনি যে খোঁজ নেবেন। এমন তো হতে পারে কোনো অসুখ করেচে শরতের! কিন্তু প্রভাসও খবর দিতে এল না একবার, এই বা কেমন কথা।

ঝি এসে দাঁড়ালো, আবার ভাত চড়াবার কথাটা বলতে।

একটু ইতস্ততঃ করে বললে, বাবু একটা কথা বলবো কিছু মনে কোরোনি, দিদিমণি যেনার সঙ্গে গিয়েচেন, তিনি কি রকম দাদা!

ঝিয়ের কথার সুর ও বলবার ধরণে কেদারের মনের মধ্যে হঠাৎ যেন একটা ধারালো অস্ত্রের বিষম ও নিষ্ঠুর খোঁচা দিয়ে তাঁর সরল মনকে জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করলে।

তিনি পাংশুমুখে ঝিয়ের দিকে চেয়ে বললেন, কেন মেয়ে? কেন বলো তো?

—না বাবু, তাই বলছি। বলি, যেনার সঙ্গে তিনি গিয়েচেন, তিনি লোক ভালো তো? সহর-বাজার জায়গা এখানে মানুষ সব বদমাইস কিনা, দিদিমণি সোমত্ত মেয়ে তাই বলচি। তবে আপনি বলছিলে দাদার সঙ্গে গিয়েচে তবে আর ভয় কি। তা বাবু, ভাতটা চড়িয়ে—

কেদার রান্না চড়াবেন কি, ঝির কথা শুনে তাঁর কেমন একটা ভয়ে সমস্ত শরীর ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠলো, হাতে পায়ে যেন বল নেই! এসব কথা তাঁর মনেও আসেনি। ঝি নিতান্ত অন্যায় কথা বলেনি। প্রভাসকে তিনি কতটুকু জানেন? তার সঙ্গে মেয়েকে যেতে দেওয়া হয়তো তাঁর উচিত হয় নি।

হঠাৎ মনে পড়লো, পাশের বাগানে গিয়ে চাটুয্যে মশায়কে গিয়ে এ বিপদে তাঁর পরামর্শ নেওয়া দরকার—বিশাল কলকাতা সহরের মধ্যে তিনি আর কাউকে জানেন না, চেনেন না। ঝিকে বসিয়ে রেখে বাড়ীতে, তিনি চাটুয্যে মশায়ের বাগানবাড়ীতে গেলেন। চাটুয্যে মশায়কে সামনের চাতালেই চাকরে তেল মাখাচ্ছিল, কেদারকে এমন অসময়ে আসতে দেখে তিনি একটু বিস্মিত হয়ে কাপড় গুছিয়ে পরে

উঠে বসলেন। হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, আসুন, কেদার বাবু, ওরে বাবুকে টুলটা এগিয়ে দে—

কেদার বললেন, বড় বিপদে পড়ে এসেচি চাটুয্যে মশায়—আপনি ছাড়া আমি তো আর কাউকে জানি নে চিনিও নে—কার কাছেই বা যাবো—

চাটুয্যে মশায় সোজা হয়ে বসে বিস্ময়ের সুরে বললেন, কি বলুন দিকি? কি হয়েচে?

কেদার ব্যাপার সব খুলে বললেন।

চাটুয্যে মশাই শুনে একটু চুপ করে ভাবলেন। তারপর বললেন, আপনি ঠিকানা জানেন না?

—আজ্ঞে না—

—প্রভাস কি?—

—দাস—ওরা কর্ম্মকার।

—আহা দাঁড়ান, টেলিফোন গাইডটা দেখি কিন্তু আপনি তো বলচেন ঠিকানা জানেন না, তবে তাতে কি হবে? ওই নামে পঞ্চাশ জন মানুষ বেরুবে।

—আচ্ছা, আপনি দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন, আমি স্নানটা সেরে নি চট্ করে, বেলা হয়েচে। আপনাকে নিয়ে একবার থানায় যাবো কি না ভেবে দেখি। পুলিশের সঙ্গে একবার পরামর্শ ক[illegible] দরকার।

পুলিশের নাম শুনে নির্ব্বিরোধী কেদার ভয় পেয়ে গেলেন। পুলিশে যেতে হবে, ব্যাপারটা গুরুতর দাঁড়াবে কি? নাঃ। হয় তো মন্দির-টন্দির দেখতে বেরিয়েচে মেয়ে, ফিরে আসতে একটু বেলা হচ্চে। একেবারে পুলিশে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

কেদার বললেন, আহা, আপনি স্নানাহার সেরে নিন—আমি

ততক্ষণ একবার দেখে আসি এল কি না। আপনি খেয়ে একটু বিশ্রাম করুন। আমি আসচি—

বাগানবাড়ীতে ফিরে কেদার এঘর ওঘর খুঁজলেন, ঝিকে ডাকলেন, শরৎ আসেনি। ঘড়িতে বেলা দুটো। কিছুক্ষণ চুপ করে বিছানায় শুয়ে মন শান্ত করার চেষ্টা করলেন—পুলিশে খবর দেবার আগে বরং একটু দেরি করা ভাল। ঘড়িতে আড়াইটে বাজলো।

এমন সময় ফটকের কাছে মোটরের হর্ন শোনা গেল। কেদার উৎকর্ণ হয়ে রইলেন—সকাল থেকে তো একশো মোটর গাড়ীর বাঁশি শুনেচেন তিনি। কিন্তু মনে হোল—না, এই তো, গাড়ীর শব্দ একেবারে বাগানের লাল কাঁকরের পথে। বাবাঃ, বাঁচা গেল। সমস্ত শরীর দিয়ে যেন ঝাল বেরিয়ে গেল কেদারের।

ঝি ছুটে এসে বললে, বাবু মটোর ঢুকচে ফটক দিয়ে—দিদিমণি এসেচে—

কেদার প্রায় ছুটেই বাইরে গেলেন। মোটর সামনে এসে দাঁড়ালো—তা থেকে নামলো প্রভাস ও গিরিন। শরৎ তো গাড়ীতে নেই?

ওরা এগিয়ে এল।

কেদার ব্যস্ত ভাবে বললেন, এসো বাবা প্রভাস—শরৎ আসেনি? এত দেরি করলে, তাকে কি বাড়ীতে—

প্রভাস ও গিরিনের মুখ গম্ভীর। পাশেই ঝিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গিরিন বললে, আসুন, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে। ওদিকে চলুন—

ঝি হঠাৎ বলে উঠলো, হ্যাঁ গা বাবু, দিদিমণি ভাল আছে তো?

গিরিন নামতা মুখস্থ বলার মত বললে, হ্যাঁ, আছে—আছে—আসুন, চলুন ওই ওদিকে। তুই যা না কেন, হাঁ করে এখানে দাঁড়িয়ে কি?

এদের রকম-সকম দেখে কেদার উদ্বিগ্ন মুখে প্রশ্ন করলেন, কি —কি হয়েচে? শরৎ ভাল আছে তো?

প্রভাস বললে, হ্যাঁ, তা ভাল আছে। সেজন্য কিছু নয়, তবে একটা ব্যাপার হয়েচে, তাই আপনার কাছে—

কেদার জিনিসটা ভাল বুঝতে না পেরে বললেন, তা শরৎকে সঙ্গে নিয়ে। এলেই হোত বাবাজি—তাকে আর কেন বাড়ীতে রেখে এলে।

গিরিন বললে, আজ্ঞে না, তাঁকে নিয়েই তো ব্যাপার—সেই বলতেই তো—

কেদারের প্রাণ উড়ে গেল—শরতের নিশ্চয় অসুখ-বিসুখ হয়েছে, এরা গোপন করচে—তা ছাড়া আর কি হওয়া সম্ভব? তিনি অধীর ভাবে কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, গিরিন এগিয়ে এসে গম্ভীর মুখে বললে, আপনাকে বলতেই তো আমাদের আসা। কিন্তু কি করে যে বলি, তাই বুঝতে পারচি নে। আসল কথাটা কি জানেন, আপনার মেয়েকে কাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না—মানে এখন পাওয়া গিয়েচে। তবে—

এদের কথাবার্ত্তার গতি কেদার বুঝতে পারলেন না, একবার বলে মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না, আবার বলে পাওয়া গিয়েচে—গিয়ে যদি থাকে, তবে কি তাকে সাংঘাতিক আহত অবস্থায় পাওয়া গিয়েচে! নইলে এরা তার পরে আবার 'কিন্তু' বলে কেন? মুহূর্ত্তের মধ্যে কেদারের মনে এই কথাগুলো খেলে গেল—কিন্তু তাঁর হতবুদ্ধি ওষ্ঠাধর বাক্যে এর রূপ দেওয়ার পূর্ব্বেই গিরিন আবার বললে—হয়েছিল কি জানেন, আপনার মেয়ে—বল না হে প্রভাস?

প্রভাস বললে, বলবো কি, আমারও হাত-পা আসচে না। আপনার সামনে একথা বলতে, অরুণের সঙ্গে কাল থেকে শরৎদি কোথায় চলে

গিয়েছিল—কাল রাত্রে তারা সারারাত আসে নি। আজ সকালে—মানে—

গিরিন ওর কাছ থেকে কথা লুফে নিয়ে বললে, মানে আমরা কাল সারারাত খোজাখুঁজি করেচি—পাই নি। আপনার কাছেই বা কি বলি, কার কাছেই বা কি বলি—তারপর আজ সকালে একটা কুশ্রেণীর মেয়ের বাড়ীতে ওদের দু'জনকে পাওয়া গিয়েচে। এ সব কথা বলতে আমাদের মাথা কাটা যাচ্চে লজ্জায়। প্রভাস তো বলেছিল, আমি কাকাবাবুর কাছে গিয়ে এসব বলতে পারবো না। আমি বললাম—না চলো, বলতেই যখন হবে আমিই বলবো এখন। তিনিও তো ভাববেন। তাই ও এল, নইলে ও আসতে চাইছিল না।

কেদার নির্ব্বোধের মত ওদের মুখের দিকে চেয়ে সব কথা শুনছিলেন—কিন্তু কথাগুলোর অর্থ তাঁর তেমন বোধগম্য হয় নি বোধ হয়—কারণ কিছু মাত্র না ভেবেই তিনি প্রশ্ন করলেন, তাকে তোমরা আনলে না কেন? তার অসুখ বিসুখ হয় নি তো?

গিরিন হাত নেড়ে একটা হতাশাসূচক ভঙ্গি করে বললে, সে চেষ্টা করতে কি আর আমরা বাকি রেখে ছিলাম? আসতে চাইলেন না।

কেদার বিস্ময়ের সুরে বললেন, আসতে চাইলে না—

—তবে আর বলচি কি ছাই আপনাকে। আমি আর প্রভাস গিয়ে আজ সকাল থেকে কত খোসামোদ? তা বললেন, আমি যাবো না। এখানে বেশ আছি। কুশ্রেণীর দুটো মেয়ে আছে সে বাড়ীতে দিব্যি দেখলুম সাজিয়েচে। আমায় বললেন, দেশে আর সে জঙ্গলে ফিরবার আমার ইচ্ছে নেই। এই বেশ আছি। অরুণ তাঁকে সুখে রাখবে বলেচে। কলকাতা সহর ফেলে তিনি আর জঙ্গলে ফিরতে চান না এই গেল আসল কথা। বললেন, আমি সাবালিকা, আমার বয়েস হয়েচে, আমি এখন যা খুসি করতে পারি। আমি যাবো না। এখন

যেমন ব্যাপার বুঝচি অরুণের সঙ্গে ওর—মানে মনের মিল হয়ে গিয়েচে, বয়েসও তো এখনও—বুঝলাম যতদূর তাতে—

কেদার অধীর ভাবে বললেন, আমার কথা বলেছিলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এই জিগ্যেস করুন না প্রভাসকে। সকাল থেকে ঝুলোঝুলি করেচি আমরা। কিছু কি আর বাদ রেখেচি—কাল থেকে কলকাতা সহর তোলপাড় করে বেড়িয়েচি। ওদিকে অরুণের সঙ্গে ওখানে গিয়ে উঠেচেন তা কি করে জানবো? তা আপনার কথা বলতে বললেন, বাবাকে দেশে ফিরে যেতে বলুন। আমার এখন সেখানে যাবার ইচ্ছে নেই—এই জিগ্যেস করুন না প্রভাসকে?

প্রভাস বিষণ্ণ মুখে বললে, সে সব কথা আর কি বলি? কত রকম করে বোঝালুম। তা ওই এক বুলি মুখে? আমি আর ফিরবো না দেশে, বাবাকে গিয়ে বলো গে যাও। আমি এখানে বেশ আছি। এসব কথা কি আপনার কাছে বলবার কথা, লজ্জার মাথা কাটা যায়—কি করি বাধ্য হয়ে বলতে হচ্চে। আমি কি চেষ্টার ত্রুটি করেচি কাকাবাবু? এখন এক উপায় আছে পুলিশে খবর দেওয়া। আপনার সঙ্গে, সেই পরামর্শ করতেই আসা। আপনিও চলুন আমাদের সঙ্গে, জোড়াসাঁকো থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে এজাহার করে দেওয়া যাক—

গিরিন চিন্তিত মুখে বললে, তাতেই বা কি হবে? সেই ভাবচি ছেলেমানুষ নয়, বয়েস হয়েচে ছাব্বিশ-সাতাশ, বিধবা—সে মেয়ে যা খুসি করতে পারে। পুলিশ হস্তক্ষেপ করতে চাইবে না। তার ওপরে ওঁদের মানী বংশ, পুলিশে কেস্ করতে গেলেই এ নিয়ে খবরের কাগজে একটা লেখালেখি হবে, ওঁদের ছবি বেরুবে! একটা কেলেঙ্কারির কথা—ভাল কথা তো নয়? চারি দিকে ছি ছি পড়ে যাবে। এই সবই ভাবচি কি না? তা উনি যে রকম বলেন সে রকম করতে হবে। চলুন না

হয় এখুনি তবে পুলিশে যাই—পুলিশে খবর দিলেই এখুনি প্রথম তো ওঁর মেয়েকে বেঁধে চালান দেবে—যদি অবিশ্যি পুলিশে এ কেস্ নেয়। তাঁকেই আসামী করবে।

গিরিন ধীরে ধীরে যে চিত্রপট কেদারের সামনে খুলে ধরলে, নিরীহ কেদার তাতে শিউরে উঠলেন। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, না, না—পুলিশে যাওয়ার দরকার নেই।

গিরিন বললে, না কেন? আমার মনে হয় পুলিশে একবার যাওয়া উচিত। আমাদের মোটরে আসুন জোড়াসাঁকো থানায়। আপনি গিয়ে এজাহার করুন। আদালতে আপনাকে সব খুলে বলতে হবে এর পর। হয় কেস্ হোক্। আপনার মেয়ে যখন এ পথে গিয়ে পড়েচেন, তখন তাঁরও একটু শিক্ষা হয়ে যাক না? তিনটি বছর জেল ঠুকে দেবে এখন। ও অরুণকেও ছাড়বে না—আপনার মেয়েকেও ছাড়বে না। যা হয় হবে, আপনি আসুন আমাদের সঙ্গে জোড়াসাঁকো থানায়। চলুন—কি বলো প্রভাস?

প্রভাস বললে, হ্যাঁ তা যেতে হয় বই কি। যা থাকে কপালে। শরৎদিকে আসামী হয়ে ডকে দাঁড়াতে হবে বলে আর কি করা চলুন আপনি। আমার গ্রামের লোক আপনি। আমি এর একটা বিহিত না করে—

গিরিন বললে, না, বিহিত করাই উচিত। খারাপ পথে যখন পা দিয়েচে, তখন ওদের শাস্তি হয়ে যাওয়াই উচিত। জেল হোলেই বা আপনি করবেন কি? আসুন, উঠুন গাড়ীতে, আপনার আহারাদি হয়েচে?

কেদার যেন অকূলে কূল পেয়ে বললেন, না এখনও হয় নি। ভাত চড়াতে যাচ্ছিলাম—

—কি সর্ব্বনাশ! খাওয়া হয় নি এখনও? আপনি রান্না খাওয়া করে নিন—আমরা ততক্ষণ একটু অন্য কাজ সেরে আসি।

কেদার ব্যস্তভাবে বললেন, তোমরা যেন আমায় না বলে থানার যেও না বাবাজি?

গিরিন বললে, আপনি না থাকলে তো পুলিশে এজাহার করাই হবে না। আমরা কে? আপনিই তো ফরিয়াদী—আপনার মেয়ে। আমরা বাইরের লোক—আমাদের কথা নেবেই না পুলিশে। আপনাকে না নিয়ে গেলে তো কাজই হবে না। আপনি খাওয়া-দাওয়া করুন, আমরা বেলা চারটের মধ্যে আসব।

প্রভাস ও গিরিন মোটর নিয়ে চলে গেলে কেদার খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবলেন। ঠিকমত ভাববার শক্তিও তখন তাঁর নেই—মাথার মধ্যে কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গিয়েচে। জীবনে কখনো এ-ধরণের ভাবনা ভাবেন নি তিনি—নির্ব্বিরোধী নিরীহ মানুষ কেদার—সখের যাত্রাদলে গানের তালিম দিয়ে আর গ্রাম্য মুদির দোকানে বসে হাসিগল্প করেই চিরদিন কাটিয়ে এসেচেন। এমন জটিল ঘটনাজালের মধ্যে কখনো পড়েন নি, এমন ধরণের চিন্তায় তাঁর মস্তিষ্ক অভ্যস্ত নয়।

একটা কথাই শুধু বার বার তাঁর মাথায় খেলতে লাগলো—পুলিশে গেলে তাঁকে মেয়ের বিরুদ্ধে এজাহার করতে হবে, তাতে তাঁর মেয়ের জেল হয়ে যেতে পারে।

শরতের জেল হয়ে যেতে পারে!

আর এ মোকদ্দমায় তিনিই হবেন ফরিয়াদী। আদালতে দাঁড়িয়ে মেয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে হবে তাঁকে।

ঝি এসে বললে, বাবু ওনারা চলে গেল। দিদিমণির কথা কি বলে গেল বাবু? কখন আসবেন তিনি?

কেদারের চমক ভাঙলো ঝিয়ের কথায়। বললেন, হ্যাঁ—এই—কি বললে? ও শরৎ? না এখন আসবার দেরি আছে।

—তা আপনি আজ ভাত চড়াবেন না বাবু? দিদিমণির খবর তো পাওয়া গেল—এখন দুটো ভাতে ভাত যা হয় চড়িয়ে—

—না যেয়ে, এখন অবেলায় আর ভাত—দুটো চিঁড়ে এনে দেবে?

—ও মা, চিঁড়ে খেয়ে থাকবেন আপনি? তা দেও, পয়সা দাও নিয়ে আসি।

বাগানের পথে দিব্যি বাতাবীলেবু গাছের ছায়া পড়েচে, প্রায় বিকেল হোতে চললো।

ঘন্টা দুই পরে প্রভাস ও গিরিন মোটর নিয়ে ফিরে এসে দেখলে ঝি গাড়ী-বারান্দার সামনের রোয়াকে বসে। তাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল কেদার কোথায় চলে গিয়েচেন, বাজার থেকে চিঁড়ে কিনে নিয়ে এসে সে আর তাঁকে দেখতে পায় নি। কেদারের কাপড়-চোপড়ের পুঁটুলিটাও সেই সঙ্গে দেখা গেল নাই।

গিরিন বাগানের বাইরে এসে হো হো ক'রে হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি।

—কেমন বাবাঃ। বললাম সে সব আমার হাতে ছেড়ে দাও—গিরিন কুণ্ডুর মাথার দাম লাখটাকা বাবা। ও পাড়াগেঁয়ে বুড়োর কানে এমন মন্তর ঝেড়েছি যে, ও এ পথে আর কোনো দিন হাঁটবে না। বলিনি তোমায়?

—আচ্ছা, বুড়োটা গেল কোথায়?

—কোথায় আর যাবে? গিয়ে দেখ গে যাও তোমাদের সেই কি পুর বলে, তার জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে কাল সকাল নাগাৎ ঠেলে উঠেচে। লজ্জায় এ-কথা কারো কাছে এমনিই বলতে পারতো না—তার ওপর যে পুলিশের ভয় দিইচি ঢুকিয়ে বুড়োর মাথায়—দেখবে যে রা কাটবে না কারো কাছে। এক ঢিলে দুই পাখী সাবাড়।

দমদমার বাগানবাড়ী থেকে বার হয়ে কেদার পুঁটুলি হাতে হন্‌হন্‌ করে পথে চলতে লাগলেন। হাতে পয়সার সচ্ছলতা নেই—খরচের দরুন যা কিছু ছিল, তা নিতান্তই সামান্য। তা ছাড়া কেদার এখনও কোথায় যাবেন না যাবেন ঠিক করে উঠতে পারেন নি—এখন তাঁর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য, তাঁর ও কলকাতা সহরের মধ্যে অতি দ্রুত ও অতি বিস্তৃত একটি ব্যবধান সৃষ্টি করা। এই ব্যবধান যত বড় হবে, যত দূরে গিয়ে তিনি পড়তে পারবেন—তাঁর মেয়ে তত নিরাপদ।

সুতরাং পিছন ফিরে না চেয়ে এখন শুধু হেঁটেই যেতে হবে···হেঁটেই যেতে হবে। মেয়ের বিপদ না ঘটে···শুধু হাঁটতেই হবে। কিসের বিপদ মেয়ের, তা কেদারের ভাবার সময় বা অবসর নেই। মেয়ে যে খুব নিরাপদ আছে কি নেই—সে সব ভাবনারও সময় নেই এখন। শুধু হাঁটতে হবে, কলকাতা থেকে দূরে গিয়ে পড়তে হবে। প্রভাস ও গিরিন যেমন রেগে গিয়েচে, ওরা শোধ তুলে হয়তো ছাড়বে অরুণের ওপর। তাঁকে মোটরে করে এসে রাস্তা থেকে জোর করে ধ'রে নিয়ে না যায়।

ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই—ক্লান্তি নেই, পরিশ্রম নেই, শুধুই পথ বেয়ে চলা—যতদূর যাওয়া যায়।

সন্ধ্যার সময় দমদমা থেকে সাত মাইল দূর যশোর রোডের ধারে গাছতলায় বসে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে হাউ হাউ করে কাঁদতে দেখে দু' চারজন পথিকের ভিড় জমে গেল।

একজন বললে, কি হয়েছে মশায়?

আর একজন বললে, বাড়ী কোথায় আপনার? কি হয়েছে?

লোকজনের মধ্যে বেশির ভাগ চাষী লোক, দু'জন দমদমায় এইচ, এম, ভি গ্রামোফোন কোম্পানীর কারখানায় কাজ করে, ছুটির পর সাইকেলে গ্রামে ফিরছিল। তাদের একজন এগিয়ে এসে বললে—

কি হয়েচে মশাই? আমিও ব্রাহ্মণ, আসুন আমার বাড়ী—এই কাঁচা রাস্তা দিয়ে নেমে গিয়ে গরানহাটি কেশবপুরে আমার বাড়ী—

কেদার বললেন, না ও কিছুই না—আমি এখন হেঁটে যাবো—

—কাঁদচেন কেন কি হয়েছে আপনার বলতেই হবে—আসুন আপনি দয়া করে। এ অন্ধকার রাত্রে একা যাবেন কোথায়?

কেদার কাকুতি মিনতির সুরে বললেন, না বাবু, আমি যাবো না। আমার কিছুই হয় নি—এই গিয়ে মাঝে মাঝে পেটে ফিক্ ব্যথা ধরে কি না? ও কিছু নয়, এক্ষুনি সেরে যাবে—সেরে গিয়েচে অনেকটা।

কেদার পুঁটুলি নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে উঠে বারাসতের দিকে রওনা দিলেন পথ ধরে।

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে।

ওদের মধ্যে একজন মুচকি হেসে বললে, পাগল—পাগলও দেখেই চেনা যায়। পাগল—

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে পথে রাত এল। অন্ধকার রাত। কেদারের দৃকপাত নেই—কোথায় যাচ্ছেন তা তিনি এখনও জানেন না। মাঝে মাঝে মোটরের হর্ণ বাজে পেছন থেকে, আর মাল বোঝাই লরি যশোর রোড বেয়ে বারাসত কি বনগাঁয়ে মাল নিয়ে চলেচে—কেদার হর্ণ শুনলেই ধারের গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়েন, প্রভাসদের মোটর তাঁর সন্ধানে পুলিশ নিয়ে বেরিয়েছে কি না কে জানে। সারাদিন পেটে কিছু যায় নি, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কেদার এখন আহারের কোন প্রয়োজন পর্য্যন্ত অনুভব করচেন না। শরীর এবং মন যেন তাদের সমস্ত অনুভূতি হারিয়ে একটি মাত্র অনুভূতিতে পর্য্যবসিত হয়েচে, সেটা সময় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট হয়ে উঠচে। অন্য কিছু নয়—কন্যার উপর তাঁর গভীর স্নেহ ও একটা অদ্ভুত করুণা। শরৎ যেন ছাব্বিশ বছরের যুবতী নেই, তাঁর মনোরাজ্যে সে কখন শিশু মেয়েটি

হয়ে ফিরে এসেচে, সে গড় শিবপুরের বাড়ীতে জঙ্গলের ধারে কুঁচফল তুলে খেলা করতো—তার খেলাঘরে ধুলোর ভাত ও পাথরকুচি পাতা মাছ খেতে হয়েছে বসে বসে। তার এখনও কি বুদ্ধিই বা হয়েছিল, চিরকাল পাড়াগাঁয়ে কাটানোর ফলে সহরের ব্যাপার কি বা সে বোঝে!

একবার ভাবলেন, কলকাতায় ফিরে গিয়ে পাশের বাগানের বাঁড়ুযো মশায়ের কাছে সব কথা ভেঙ্গে বলে তাঁর সাহায্য চাইলে কেমন হয়। কিন্তু পুলিশের আইন বড় কড়া। সেখানে বাঁড়ুযো মশায় কতটুকু সাহায্য করতে পারবেন। বিশেষ করে এমন একটা কথা তিনি কি বাঁড়ুযো মশায়কে খুলে বলতে পারবেন? তবে কথা গোপন থাকবে না। ওই ঝিটা এতক্ষণ কথাটা পাড়াময় রাষ্ট্র করেচে—ঝি কি আর এতক্ষণ এ কথা না জেনেছে। ওই প্রভাস ও গিরিনই তাকে সব কথা প্রকাশ করে বলেচে এতক্ষণ। না, সেখানে আর ফিরবার উপায় নেই—এখন তো নয়ই, এর পরে—কত পরে তা তিনি এখনও জানেন না—যা হয় একটা কিছু করবেন তিনি।

বারাসাতের বাজারে পৌঁছে কেদারের ইচ্ছে হোল এখানে চা কিনে খান দোকান বেছে—রাস্তার ধারেই অনেকগুলো চায়ের দোকান। আজ শরৎ নেই সাথে—যে তাঁকে দোকানের চা খেতে বাধা দেবে, যে তাঁকে ইহকালের অনাচার থেকে সন্তর্পণে বাঁচিয়ে রেখে তাঁর পরকালের মুক্তির পথ খোলসা করবার জন্যে সচেষ্ট ছিল চিরদিন—আজ সে নি[illegible]-ভাবে সমস্ত আনাচারের স্বাধীনতা দিয়ে তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েচে—সুতরাং অনাচার তিনি করবেনই। যা হয় হবে, পরকাল তিনি মানেন না। আরও জোর করে, ইচ্ছে করে তিনি যা খুসী অনাচার করবেন। কে দেখবার আছে তাঁর?

রাস্তার ধারের চায়ের দোকান থেকে এক পেয়ালা চা খেয়ে কেদার

আবার হন্‌হন্‌ করে রাস্তা হাঁটতে লাগলেন—সারা রাত ধরে পথ চলে সকালের দিকে দত্তপুকুর থেকে কিছুদূরে একটা গ্রামে এসে পথের ধারেই বসে পড়লেন। আর তিনি ক্ষুধা ও পথশ্রম-ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে যেতে পারচেন না।

জনৈক গ্রাম্য লোক সকালে গাড়ু হাতে মাঠ থেকে ফিরে আসছিল, তাঁকে এ অবস্থায় দেখে বললে—কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

—আজ্ঞে বারাসাত থেকে।

কেদার একটু মিথ্যে কথার আমদানী করলেন, লোককে সন্ধান দেওয়ার দরকার কি তিনি কোথা থেকে আসচেন?

লোকটি আবার বললে, তা এখানে বসে এমন ভাবে?

—একটু বসে আছি, এইবার উঠি।

—আপনারা?

—ব্রাহ্মণ।

—আজ্ঞে, প্রাতঃপ্রণাম। আমার নাম হরিহর ঘোষ, কায়স্থ—আপনি যদি কিছু না মনে করেন, একটা কথা বলি! আমার বাড়ী এবেলা দয়া করে পায়ের ধুলো দিয়ে দুটি সেবা করে যান। আমরাও প্রসাদ পাবো এখন। চলুন উঠুন।

কেদার কিছুতেই প্রথমটা রাজি হন নি—কিন্তু তাঁর চেহারা দেখে লোকটার কেমন দয়া ও সহানুভূতির উদ্রেক হয়েছিল, সে পীড়াপীড়ি করে তাঁকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেল। কেদার দেখলেন লোকটি সম্পন্ন অবস্থার গ্রাম্য গৃহস্থ, বাইরে বড় চণ্ডীমণ্ডপ, অনেকগুলো ধানের মরাই, বাড়ীর সামনে একটা পানাভরা ডোবা। সেই ছোট পানাভরা ডোবার আবার একটা ঘাট বাঁধান দেখে দুঃখের মধ্যেও কেদার ভাবলেন—এদের দেশে এর নাম পুকুর, এর আবার বাঁধা ঘাট! এদের নিয়ে গিয়ে গড়ের কালো পায়রার দীঘিটা একবার দেখিয়ে দিতে হয়—

ভাল লাগলো জায়গাটা তবুও। কেদার সারাদিন রইলেন, সন্ধ্যার সময় বিদায় নিতে চাইলে গৃহস্বামী আপত্তি করে বললে—তা হবে না ঠাকুরমশায়। সামনে অন্ধকার রাত, আপনাকে কি ছেড়ে দিতে পারি এখন? থাকুন না এখানে দুদিন।

ইতিমধ্যে কেদার নিজের একটা মিথ্যা পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি গরীব ব্রাহ্মণ, গোবরডাঙার জমিদার বাড়ীতে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করতে চলেচেন।

লোকটা তাই বললে, দুদিন থাকুন, দেখি যদি আমাদের এখান থেকে আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারি! আমি দুপুরবেলা দু-একজনকে আপনার কথা বলেছি—সকলেই কিছু কিছু দিতে রাজী হয়েচে।

কেদার বিপদে পড়লেন। তিনি গড়শিবপুরের রাজবংশের লোক, কারো কাছে হাত পেতে কখনো কিছু নিতে পারবেন না ও ভাবে—যতই অভাব থাকুক। নিজেকে গরীব ব্রাহ্মণ বলে তিনি যে মহা মুস্কিলে পড়ে গেলেন।

রাত্রিটা অগত্যা থেকে যেতে হোল। পরদিন সকালে তিনি যখন আবার বিদায় চাইলেন, গৃহস্বামী তিনটি টাকা তাঁর হাতে দিতে গেল। বললে—এই উঠেচে ঠাকুর মশায়, মিত্তির মশায় দিয়েচেন একটাকা আর আমি সামান্য কিছু—এই নিয়ে যান—

কেদার বিনীত ভাবে বললেন, আমি ও নিতে পারবো না—

ঘোষ মশায় আশ্চর্য্য হয়ে বললে, নেবেন না? কেন?

—আজ্ঞে—ইয়ে—ও আমার দরকার নাই।

ঘোষ মশায় তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললে, এর চেয়ে বেশি উঠলো না যে ঠাকুর মশায়? না হয় আমি আর একটা টাকা—

কেদার বললেন, না—না—আপনি অতি মহৎ লোক যা করেচেন,

তা কেউ করে না। কিন্তু আমি—আমি নিতে পারবো না। আমি আপনাকে এমনিই আশীর্ব্বাদ করচি—আপনি ধনে পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর হোন—ভগবান আপনাদের সুখে রাখুন—

কেদারের চোখে জল দেখে গৃহস্বামী বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইল, তার পরে উঠে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললে—আচ্ছা আপনি ঠিক মত পরিচয় দেন নি বোধ হয়। এ বাজারে চার টাকা ছেড়ে দেয় এমন লোক আমি দেখি নি—বলুন আপনি কে—কি হয়েচে আপনার—

কেদার উদ্গত অশ্রু কোনো মতে চেপে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় উঠতে উঠতে বললেন—কিছু হয় নি, কিছু হয় নি। আমি আসি, আমার বিশেষ দরকার আছে—কিছু মনে করবেন না—

গৃহস্বামী টাকাটি হাতে করে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সেদিন সারাদিন অনবরত পায়ে হেঁটে সন্ধ্যার পর কেদার গড়-শিবপুর থেকে ছয় ক্রোশ দূরে হলুদপুরের বাজারে পৌছলেন। এখানে কেউ তাকে চিনতো না—চার ক্রোশ দূরের এ বাজারে তাঁর যাতায়াত বিশেষ ছিল না, না চেনে সে খুব ভালো। একটা পুকুরের বাঁধা ঘাটের চাতালে এসে বসলেন, এতদূর পর্য্যন্ত চলে এসেচেন কিসের ঝোঁকে, কিছু বিবেচনা না করেই, এই বার তাঁর মনে প্রশ্ন জাগলো—কোথায় যাবেন তিনি? গাঁয়ে ফেরা কি উচিত হবে? মেয়ের কথা লোকে জিগ্যেস করলে কি উত্তর দেবেন তিনি? কেদারের উদ্‌ভ্রান্ত মন এ দু'দিন এসব কথা ভাববার অবকাশ পায় নি।

ছয়

রাত্রে শরতের ভাল ঘুম হোল না, অচেনা জায়গা ভাল ঘুম হবার কথা নয়, দেশের বাড়ী ছেড়ে এসে পর্য্যন্তই তার ঘুম তেমন হয় না। কিন্তু কাল রাত্রে কি জানি কেমন হোল, বাবার কথা মনে হয়েই হোক্ বা অন্য যে কারণেই হোক্—শরৎ প্রথম দিকে তো চোখের পাতা একটুও বোজাতে পারে নি।

প্রভাসের বৌদিদি তার পাশেই শুয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়লে। এত শব্দ এত আওয়াজের মধ্যে মানুষ পারে ঘুমুতে? মোটর গাড়ী যাচ্চে, লোকজনের কথাবার্ত্তা চলেচে—ভাল রকম অন্ধকার হয় না, জানালা দিয়ে কোথা থেকে আলো এসে পড়েচে দেওয়ালের গায়ে—আর সারারাতই কি লোক চলাচল করবে আর গান-বাজনা চলবে? এখানে এতও গানবাজনা হয়। ডুগি-তবলার শব্দ, হার্ম্মোনিয়ামের আওয়াজ, মেয়ে-গলায় গান চলেচে আশপাশের সব বাড়ী থেকে। দমদমার বাগান-বাড়ীতে থাকতে সে বুঝতে পারে নি আসল কলকাতা শহর কি। এখন দেখা যাচ্চে এখানকার তুলনায় দমদমার বাগানবাড়ী তাদের গড়-শিবপুরের জঙ্গলের সমান।

ভোরে উঠে সে গঙ্গাস্নান করে আসবে—এখান থেকে গঙ্গা কতদূর কে জানে? প্রভাস-দা'কে বললে মোটরে নিয়ে যাবে এখন। সকালে প্রভাসের বৌদিদির ডাকে তার ঘুম ভাঙলো। জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েচে বিছানায়। অনেক বেলা পর্য্যন্ত ঘুমিয়েচে নাকি সে? ওর মুখে কেমন ধরণের ভয় ও উৎকণ্ঠার চিহ্ন প্রভাসের বৌদিদির চোখ এড়ালো না।

সে বললে, ভাবনা কি দিদি, দেরিতে উঠেচ তাই কি? তোমায় উঠে আপস করতে হচ্ছে না তো আর। মুখ ধুয়ে নাও, চা হয়ে গিয়েচে—

শরৎ লজ্জিত মুখে জানালে এত সকালে সে চা খায় না। তার চা খাওয়ায় কতকগুলো বাধা আছে—স্নান করতে হবে, কাপড় ছাড়তে হবে—সে সব হাঙ্গামায় এখন কোন দরকার নেই, থাক্ গে। গঙ্গা এখান থেকে কতদূর? এক বার গঙ্গায় নাইতে যাবার বড় ইচ্ছে তার। প্রভাস-দা কখন আসবে?

প্রভাসের বৌদি বললে, গঙ্গা নাইবে? চল না আমাদের—আচ্ছা, দেখি—বোসো। ওরা আসুক সব—

—কখন আসবে? আসতে বেশি দেরি করবে না তো প্রভাস-দা?

—কি জানি ভাই। তবে দেরি হওয়ার কথা নয় তো। এখুনি আসবে—

—গঙ্গা নেয়ে এসে আমি বাবার কাছে যাবো—আমায় রেখে আসুক—

—সে কি ভাই? এ-বেলাটা থাকবে না এখানে? থেকে খাওয়া-দাওয়া করে ওবেলা—

শরৎ চিন্তিত মুখে বললে, কাল রাতে গেলাম না, বাবা কত ভেবেচেন। আমার কি থাকবার যো আছে যে থাকবো?

প্রভাসের বৌদিদি বললে, ওবেলা চলো ভাই সিনেমা দেখে দুজনে—

—কি দেখে?

—সিনেমা—মানে বায়োস্কোপ—টকি—

—ও—

—দেখে চলো আমরা যশোর রোড দিয়ে মটোরে বেড়িয়ে আসবো। চাঁদের আলো আছে—

শরৎ হেসে বললে, মোটে একাদশী গেল বুধবারে, এরই মধ্যে চাঁদের আলো কোথায় পাবেন? আপনারা কলকাতার লোক, আপনাদের সে

খবরে কোনো দরকার নেই—এখানে সারারাতই গ্যাসের আলো—ইলেক্‌ট্রিক আলো—

ঈষৎ অপ্রতিভের সুরে প্রভাসের বৌদিদি বললে, তা বটে ভাই, যা বলেচ। ওসব খেয়াল থাকে না।

এমন সময় পাশে কমলাদের ঘর থেকে জড়িত স্বরে কে বলে উঠলো—আরে ও হেনাবিবি—এদিকে এসো না চাঁদ, আলোর সুইচটা যে খুঁজে পাচ্ছি নে—ও হেনাবিবি—

প্রভাসের বৌদিদি হঠাৎ খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে বললে, আ মরণ, বেলা সাড়ে সাতটা বাজে—উনি আলোর সুইচ্ খুঁজে বেড়াচ্চেন এখন—

শরৎ বললে, কি হয়েচে, কে উনি?

—কে জানে কে? মাতালের মরণ বত—পাশের বাড়ীর এক বুড়ো। রোজ ভাই অমনি করে—

শরৎও হেসে ফেললে মাতাল বুড়োটার কথা ভেবে। বললে, ডাকচে কাকে? ও যেন পাশের ঘর থেকে কথা বললে বলে মনে হোল—না?

—ওই পাশের বাড়ী, দোতলার জানালাটা খোলা রয়েচে দেখচো তো ওই ঘর। দাঁড়াও অসচি—

শরৎ শুনলে বুড়ো মাতালটা হঠাৎ "এই যে হেনাবিবি বলি ও যাই! বলি সাসি জানালা বন্ধ করে"—

এই পর্যান্ত চেঁচিয়ে বলে উঠেই চুপ করে গেল। কে যেন তার মুখে থাবা দিয়ে চুপ করিয়ে দিলে। কিছুক্ষণ পরে কমলাও ঘরে ঢুকলো। শরৎ হাসিমুখে বলে উঠলো—এসো ভাই গঙ্গাজল এসো—তোমাকেই খুঁজচি—গঙ্গা নাইতে চলো না কেন যাই সবাই মিলে?

কমলা সত্যই সুন্দরী মেয়ে। ঘুম ভেঙে সদ্য উঠে এসেচে, আলুথালু

চুলের রাশ খোঁপার বাঁধন ভেঙে ঘাড়ে পিঠে এলিয়ে পড়েচে, বড় বড় চোখে অলস দৃষ্টি, মুখের ভাবেও জড়তা কাটে নি—বেশ ফর্সা নিটোল হাত দুটি কেমন চমৎকার ভঙ্গিতে ঘাড়ের পেছনে তুলে ধরে এলোচুল বাঁধবার ছলে একটা কায়দা মাত্র, চুল বাঁধবার চেয়ে ওই ভঙ্গিটা দেখবার আগ্রহটাই ওখানে বেশি। শরতের হাসি পায়—ছেলেমানুষ কমলা!

শরৎ এসব বোঝে। সেও এক সময়ে সুন্দরী কিশোরী ছিল, ওই কমলার মত বয়েসে সে জানে, নিজেকে ভাল দেখানোর কত খুঁটিনাটি আগ্রহ অকারণে মেয়েদের মনে জাগে। তারও জাগতো। এসব শিখিয়ে দিতে হয় না, বলে দিতে হয় না মেয়েদের। আপনিই জাগে। শরতের কেমন স্নেহ হয় কমলার ওপর। স্নেহের সুরেই বলে—ভাই, চমৎকার দেখাচ্চে তোমায় গঙ্গাজল—

—সত্যি?

—সত্যি বলচি।

কমলার মুখে লজ্জার আভাস নেই, সে যে পথে পা দিয়েচে, সে পথের পথচারিণীরা লজ্জাবতী লতা নয়, বনচাঁড়ালের পাতা—টুসি দিলে নাচে। কমলা হেসে বললে, আপনার ভাল লাগে?

—খুব, ভাই। খুব—

—তবে-তো আমার ভবিষ্যতের পক্ষে ভালো—এদিকে আবার গঙ্গাজল পাতিয়েচি—

কমলার কথার নির্লজ্জ সুর শরতের কানে বাজলো। সে মনে মনে ভাবলে, মেয়েটি ভালো, কিন্তু অল্প বয়সে একটু বেশি ফাজিল হয়ে পড়েচে। আমি ওর চেয়ে কত বড়। মা না হোলেও কাকী খুড়ীর বয়সী—আমার সঙ্গে কেমন ধরণের কথা বলচে ছাখো—

কমলা বললে, আপনি চা খেয়েচেন?

শরৎ হেসে বললে, না ভাই, আমি বিধবা মানুষ, নাইনি ধুইনি—

এখুনি চা খাবো কি করে? চা খাওয়ার কোনো তাড়াতাড়ি নেই আমার। এখন গঙ্গা নাইবার কি ব্যবস্থা হয় বলো তো?

—চলুন না হেঁটে গিয়ে নেয়ে আসি। এই তো আহিরিটোলা দিয়ে গেলে সামনেই গঙ্গা—

প্রভাসের বৌদিদি ওদের ঘরের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে পেছন থেকে গিরিন ডাকলে—ও হেন্যবিবি—

হেনা দাঁড়িয়ে গিয়ে পেছন ফিরে বললে, কখন এলে? কি ব্যাপার? ওদিকে—

গিরিন চোখ টিপে বললে, আস্তে।

হেনা এবার গলার স্বর নীচু করে বললে, কি হোল?

এথনো হয় নি কিছু। আমরা এখনো বুড়োর কাছে যাইনি। বেশি বেলা হোলে যাবো। এদিকের খবর কি

হেনা রাগের সুরে বললে, তোমরা আমায় মজাবে দেখছি। এখনও সে কিছু খায় নি, এবাড়ী এসে পর্য্যন্ত দাঁতে কুটো কাটেনি। না খেয়ে ও কতক্ষণ থাকবে, ও আপদ যেখানে পারো বাপু তোমরা নিয়ে যাও। আমার টাকা আমায় চুকিয়ে দাও, মিটে গেল গোলমাল। না খেয়ে মরবে নাকি শেষটা—তারপর এদিকে হরি সা যা কাণ্ড বাধিয়েছিল! হেনাবিবি বলে ডাকাডাকি। সারারাত কমলির ঘরে বসে মদ খেয়েছে—এই একটু আগে কি চেঁচামেচি। মেয়েটা যাই একটু সরল গোছের, কোনোরকমে তাকে বুঝিয়ে দিলাম পাশের বাড়ীতে একটা মাতাল আছে তারই কাণ্ড, বিশ্বাস করেচে কিনা কে জানে—

গিরিন হাসিমুখে বললে, ভয় কি তোমার হেনাবিবি, রাত যখন এখানে কাটিয়েচে তখন ওর পরকাল ঝরঝরে হয়ে গিয়েচে। ওর সমাজ গিয়েচে, ধর্ম্ম গিয়েচে। ওর বাবার কাছে সে কথাই বলতে যাচ্ছি—

—কি বলবে?

—সে সব বুদ্ধি কি তোমাদের আছে? গিরিনের কাছ থেকে বুদ্ধি ধার করে চলতে হয় সব ব্যাটাকে।

—গালাগাল দিও না বলচি—

—গালাগাল তোমাকে তো দিই নি হেনাবিবি, চটো কেন? তারপর শোনো। সন্দে অবধি রেখে দাও। সন্দের আগে আবার আমরা অসবো।

—টাকা নিয়ে এসো যেন।

—অত অবিশ্বাস কিসের হেনাবিবি? নতুন খদ্দেরের কাছে তাগাদা কোরো, আমাদের কাছে নয়।

—আচ্ছা, কথায় দরকার নেই—যাও এখন। আমি দেখি গে কমলিটা ছেলেমানুষ—কি বলতে কি বলে বসে—ওকে সামলে নিয়ে চলতে হচ্ছে আবার—

হেনা ঘরে ঢুকে দেখলে শরৎ ও কমল চুল খুলে তেল মাখতে বসেচে। বললে—ও কি? নাইতে যাবে না কি ভাই?

কমল বললে, গঙ্গাজলকে নিয়ে নেয়ে আসি—

হেনা প্রশংসার দৃষ্টিতে শরতের সুদীর্ঘ কালো কেশপাশের দিকে চেয়ে বললে, কি সুন্দর চুল ভাই তোমার মাথায়? এমন চুল যদি আমাদের মাথায় থাকতো—

কমল বললে, আমিও তাই বলছিলাম গঙ্গাজলকে—

শরৎ সলজ্জ স্বরে বললে, যান কি যে সব বলেন! গঙ্গাজলের মাথায় চুল কি কম সুন্দর? দেখুন দিকি তাকিয়ে? তা ছাড়া আমার লম্বা চুলের কি দরকার আছে ভাই? বাবা কিছু পাছে মনে করেন তাই—নইলে ও চুল আমি এতদিন বঁটি দিয়ে কেটে ফেলতাম। শুধু বাবার মুখের দিকে চেয়ে পারি নে। তাঁর চোখ দিয়ে যাতে জল পড়ে, তাতে আমার ধর্ম্ম নেই।

হেনা এ পথের পুরাতন পথিক, তার মন কোমল হৃদয় বৃত্তির ধার ধারে না অনেক দিন থেকে—যা কিছু ছিল তাও পাষাণ হয়ে গিয়েচে চর্চ্চার অভাবে, শরতের কথায় তার মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত হোল না—কিন্তু কমল মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

হেনা বললে, কমলা, এঁকে গঙ্গায় নিয়ে যাবি? কেন বাড়ীতে চান কর না? বেলা হয়ে যাবে।

শরতের দিকে চেয়ে বললে, সে তুমি যেও না ভাই ও ছেলে মানুষ, পথ চেনে না—কোথায় যেতে কোথায় নিয়ে যাবে।

কমল বললে, বারে, আমি বুঝি আর—সেবার তো আমি—

হেনা কমলাকে চোখ টিপে বললে, থাম বাপু তুই। তুই ভারি জানিস্ রাস্তা ঘাট। তারপর দিদিকে নিয়ে যেতে একটা বিপদ হোক রাস্তায়! যে গুণ্ডা আর বদমাইসের ভিড়—

শরৎ বললে, সত্যি না কি ভাই, বলুন না?

—আমি কি আর মিথ্যে কথা বলচি—ও ছেলে মানুষ কি জানে?

এইবার কমল বললে, না—তা—হ্যাঁ আছে বটে।

—কি আছে ভাই গঙ্গাজল?

কমলকে উত্তর দেওয়ার সুযোগ না দিয়েই বললে, কি নেই কলকাতা সহরে বলতে পারেন? সব আছে। আজকাল আবার সোলজারগুলো ঘুরে বেড়ায় সর্ব্ব জায়গায়।

—সে আবার কি?

সোলজার মানে গোরা সৈন্য। এরা যে অঞ্চলে আছে, তার ত্রিসীমানায় মেয়েমানুষের যাওয়া উচিত নয়। না, তুমি যেও না ভাই। আমি তোমায় যেতে দিতে পারিনে। তোমার ভাল মন্দর জন্যে আমি দায়ী যখন। প্রভাস-ঠাকুরপো আমার হাতে তোমায় যখন সঁপে দিয়ে গিয়েচে।

কমলা বললে, আমরা তেল মাখলাম যে।

—তেল মেখে বাড়ীর বাথরুমে ওঁকে নিয়ে চান্ কর। মিছেমিছি কেন ওঁকে বিপদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া?

আড়ালে নিয়ে গিয়ে কমলাকে হেনা খুব বকলে। প্রভাসের কাছ থেকে সেও টাকা নেবে যখন, তখন এতটুকু বুদ্ধি নিয়ে কাজ করলে কি চলে না? বাড়ীর মধ্যেই ওকে ধরে রাখা যাচ্ছে না, একবার বাইরের রাস্তায় পা দিলে আর সামলানো যাবে না ওকে। এত কম বুদ্ধি কেন কমলার। হরি সা লোকটাকে কাল রাত্রে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলে কি কোম্পানীর রাজ্য অচল হোত? সামলে না নিলে সব কথা ফাঁস হয়ে যেতো যে আর একটু হোলে? ঘটে বুদ্ধি হবে কবে তার?... ইত্যাদি।

কমল গুরুজন কর্তৃক তিরস্কৃতা বালিকার ন্যায় চুপ করে রইল।

হেনা বললে, তুমি আর ও ঘরে যেও না। আমি করচি যা করবার —তুমি যাও। হরি সা যেন এখন আর না ঢোকে—

হেনা ঘরে ঢুকে শরৎকে বললে, গঙ্গায় যাওয়া হবে না ভাই। পথে আজকাল বড় গোলমাল, তুমি বাথরুমে নেয়ে নাও, আমি সব যোগাড় করে রেখে এলাম—

স্নান করে আসবার কিছু পরে হেনা শরৎকে বললে, তোমার খাওয়ার কি করবো ভাই? আমাদের রান্না চলবে না তো?

—আমার খাওয়ার জন্যে কি ভাই। দুটো আলো চাউল আনুন, ফুটিয়ে নেবো।

—মাছমাংস চলে না—না? গাঁ থেকে এসেচ, এখন চলুক না, কে আর দেখতে আসচে ভাই?

প্রভাসের বৌদিদির এ কথায় শরৎ বিস্মিত হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে নয় বটে, কিন্তু হিন্দু তো—সে

একজন ব্রাহ্মণের বিধবাকে একথা বলতে পারলে কি করে? অন্য জায়গায় এ ধরণের কথা বললে শরৎ নিজেকে অপমানিতা বিবেচনা করতো, তবে এরা কলকাতার লোক, এদের কথা স্বতন্ত্র।

শরৎ গম্ভীর মুখে বললে, না ও-সব চলে না। ও কথাই বলবেন না আর—

হেনা মনে মনে বললে, বাপরে, দেমাক ত্থাখো আবার! কথা বলেচি তো ওঁর গায়ে ফোস্কা পড়েচে। তোমার দেমাক আমি ভাঙবো, যদি দিন পাই—কত দেখলাম ওরকম, শেষ পর্য্যন্ত টিকলো না কোনটা।

শরৎ বিকেল থেকে কেবল দমদমায় ফিরবার জন্যে তাগাদা করতে লাগলো। হেনা ক্রমাগত বুঝিয়ে রাখে, ওরা এখনো আসচে না, এলেই পাঠিয়ে দেবে। শরৎ তো জলে পড়ে নেই—এর জন্যে ব্যস্ত কি?

কমলার দেখা নেই অনেকক্ষণ থেকে। শরৎ বললে, গঙ্গাজল কই, তাকে দেখচি নে—

হেনা কমলাকে সরিয়ে দিয়েছিল, কাঁচা লোক, কখন কি বলে বসবে, করে বসবে—সব মাটি হবে। তা ছাড়া কমলার ঘরে এমন সব জিনিসপত্র আছে, যা দেখলে শরতের মনে সন্দেহ হতে পারে। হরি সা'র একটা বিছানা, আলমারিতে তার দাড়ি কামানোর আসবাব, বড় নল লাগানো গড়গড়া ইত্যাদি। মদের বোতলগুলো না হয় পাড়াগাঁয়ের মেয়ে না বুঝতে পারলে—কিন্তু পুরুষের বাসের এ সব চিহ্নের জবাবদিহি দিয়ে মরতে হবে হেনাকে।

বিকেলের দিকে হেনা বললে, চলো ভাই টকি দেখে আসি—

—সে কোথায়?

—চৌরঙ্গীতে বলো, শ্যামবাজারে বলো—

—বাবার কাছে কখন যাবো? ওরা কখন আসবে?

—চলো, টকি দেখে দমদমায় তোমায় রেখে আসবো—

শরৎ তখুনি রাজি হয়ে গেল। টকি দেখবার লোভ যে তার না হয়েছিল তা নয়। বিশেষ করে টকি দেখেই যখন বাবার কাছে যাওয়া হচ্চে তখন আর গোলমাল নেই এর ভেতর।

কিন্তু হেনার আসল উদ্দেশ্য কোনো রকমে ওকে ভুলিয়ে রাখা। টকি দেখবার জন্যে গাড়ী ডাকতে গিয়েচে বলে দেরি করিয়ে সে প্রায় সন্ধ্যা করে ফেললে। শরৎ ব্যস্ত হয়ে কেবলই তাগাদা দিতে লাগলো—কখন গাড়ী আসবে, কখন যাওয়া হবে। হেনাও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো, এদের কারো দেখা নেই—পোড়ার মুখো গিরিনটা লম্বা লম্বা কথা বলে, তারও তো চুলের টিকি দেখা যাচ্চে না, গিয়েচে সেই সকাল বেলা। যা করবি করগে বাপু, টাকাটা মিটিয়ে দিয়ে এ আপদ তোরা যেখানে পারিস নিয়ে যা, তার এত ঝঞ্ঝাটে দরকার কি? এদিকে একে আর বুঝিয়ে রাখা যায় না।

সন্ধ্যার পরে গিরিন এসে নীচের তলায় হেনাকে ডেকে পাঠালে।

হেনা তাড়াতাড়ি নেমে এসে বললে, কি ব্যাপার জিগ্যেস করি তোমাদের? আমার ঘাড়ে যে চাপিয়ে দিয়ে গেলে এখন আমি করি কি? ও যে থাকতে চাইছে না মোটে। কোথায় নেবে নিয়ে যাও না, আমি কতকাল ভুলিয়ে রাখবো? আমার থিয়েটার আছে কাল। কাল ওকে কার কাছে রাখবো? ওদিকে কদ্দূর করলে?

গিরিন তুড়ি দিয়ে গর্ব্বের সুরে বললে, সব ঠিক।

—কি হোল?

—বুড়োকে ভাগিয়েচি। সে বলবো এখন পরে। সে পুঁটুলি নিয়ে বুঝলে—হি-হি-হি—

—কি বলো না?

—পুঁটুলি নিয়ে ভেগেচে হি-হি—ঝি চিড়ে আনতে গিয়েচে আর

সেই ফাঁকে হি-হি—পুলিশের আয়সা ভয় দেখিয়ে দিইচি, বুড়োটা আর এ মুখ হবে না।

—বেশ, এখন নিয়ে যাও—

—ছাখো, ওকে একটু ভুলোও-টুলোও। পাড়াগাঁয়ে গরীব ঘরে থাকতো, সুখ আমোদ আহ্লাদের মুখ দেখে নি। গয়না গাঁটি কাপড়-চোপড়ের লোভ দেখাবে—

—ওরে বাপরে, বলেচি তো ও মেয়ে তেমন না। একটুখানি মাছমাংস খাওয়ার কথা বলেছিলাম তো অমনি ফোঁস করে উঠলো—আর কেবল হা বাবা যো বাবা—

—তবে আর তোমার কাছে দিয়েচি কেন হেনা বিবি? পাকা লোকের কাছে রেখেচি, আজ রাতটা রেখে দাও, রেখে যা পারো করো। আজ আর নিয়ে যাই কোথায়? এখনো কিছু ঠিক করি নি। প্রভাসের বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েচেন, প্রভাস বাড়ী থেকে বেরুতে পারচে না। অরুণ আজ নাইট ডিউটি করবে আপিসে। আমি একা—

—কেন তুমি একাই একশো বলে বড্ড গোমর করো। লম্বা লম্বা কথা বলবার সময় হেন করেগা, তেন করেগা—এখন কাজের সময়ে হেনাবিবি তুমি করো। আরও টাকা চাই তা বলে দিচ্চি—

—যাহোক, যা বললাম আজকার রাতটা তো রাখো—

—ও টকি দেখতে যাবে বলছিল, নিয়ে যাবো?

—দরকার নেই। বাড়ীর বার করবার হাঙ্গামা অনেক। ভুলিয়ে রাখো—

—কাল সকালে এসো বাপু। কাল আমার থিয়েটার, আমার দ্বারা কাল কোনো কাজ হবে না বলে দিচ্চি।

হেনা মুখ চুণ ক'রে শরতের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে, বড় মুস্কিল।

প্রভাস-ঠাকুরপোর বাবার বড় অসুখ, এখন যান তখন যান। হঠাৎ অসুখ হয়ে পড়েচে। এই মাত্তর খবর দিয়ে পাঠিয়েচে।

শরৎ উদ্বেগের সুরে বললে, এমন অসুখ! তা বয়সও তো হয়েচে—বাবা বলেন, তাঁর চেয়ে দশ-বারো বছরের বড়।

—তা তো বুঝলুম। এদিকে এখন উপায়।

—আজ কি দমদমা যাওয়া হবে না?

কি করে আর যাওয়া হচ্চে বলো ভাই! প্রভাস-ঠাকুরপোর গাড়ী পাওয়া যাচ্চে না তো—

—কেন ভাড়াটে গাড়ী?

—কে নিয়ে যাবে? তুমি আমি দুই মেয়েমানুষ। ভাড়াটে গাড়ীতে ভরসা করে যাওয়া চলবে না। কাল সকালেই যা হয় ব্যবস্থা হবে।

শরৎ অগত্যা রাজি হোল। না হয়ে উপায় যখন নেই।

সন্ধ্যার পরে শরৎকে সঙ্গে নিয়ে হেনা গিয়ে ছাদে উঠলো। চারদিকে আলোর কুরকুট্টি, নীচের রাস্তা দিয়ে সারবন্দী গাড়ী ঘোড়া, মোটর, কর্ম্মব্যস্ত জনস্রোত, ফিরিওয়ালারা কত কি হেঁকে যাচ্চে, বেলফুলের মালাওয়ালা 'চাই বেলফুলের গোড়ে' বলে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে হাঁকচে, শরৎ মুগ্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখলে।

বললে, সত্যি, সহর বটে কলকাতা। জায়গার মত জায়গা একথা ঠিক। কি লোকজন, কি আলোর বাহার! আমাদের গাঁ এতক্ষণ অন্ধকার হয়ে ঝিঁঝি ডাকচে জঙ্গলে।

হেনা অবসর বুঝে অমনি বললে, আমিও তো তাই বলি, এখানেই কেন থেকে যাও না? সব বন্দোবস্ত করে দিচ্চি। সুখে থাকবে, খাও দাও, আমোদ-আহ্লাদ করে বেড়াও—

শরৎ হেসে বললে, তা তো বুঝলাম। আমার ইচ্ছে করে না যে তা নয়। কিন্তু চলবে কি করে? বাবা গরীব মানুষ—

হেনা উৎসাহের সুরে বললে, সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে এখন। তুমি রাজি হয়ে যাও ভাই—

—কি বন্দোবস্ত হবে? বাবার চাকুরী করে দিতে পারা যায় যদি, তবে সব হয়। গড়শিবপুরের জঙ্গলে থেকে আমার প্রাণও হাঁপিয়ে উঠেচে—দুদিন এখানে থেকে বাঁচি—

—বেশ কথা তো। কলকাতার মত জায়গা আছে ভাই? এখানে নিত্য আমোদ, লোকজন—ইচ্ছে হোল আজ শিবপুরে কোম্পানীর বাগানে বেড়াতে গেলাম—ইচ্ছে হোল আজ জু'তে গেলাম—

—সে আবার কি?

মানে চিড়িয়াখানা। যখন যেখানে যেতে চাও গেলে, যা খাবার ইচ্ছে হয় খেলে, এই তোমার বয়েস। হেসে খেলে যদি এখন না বেড়ালে তবে কবে আর কি করবে? মানব-জীবনে এ সবই তো আসল। জঙ্গলে থাকলাম আর আলো চাল খেলাম—এজন্য কি আসা জগতে?

—কি করব বলুন। অল্প বয়সে কপাল পুড়েচে যখন, তখন কি আর উপায় আছে—ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ের? বাবাও টাকার মানুষ নন যে কলকাতায় বাসা করে রাখবেন।

—তুমি ইচ্ছে করলেই সব হয়। কলকাতায় থাকতে চাও, বাসা কেন—খুব ভাল ভাবে থাকতে পারবে এখন—ষ্টাইলে থাকবে এখন। রেডিও রাখবে এখন বাড়ীতে—

—সে কি?

—বেতার। ওই শোনো বাজচে—ওই যে দোকানের সামনে লোক জমেচে? গান গাইচে না? তারপর গ্রামোফোন মানে কলের গান—

—জানি।

—সে কলের গান রাখো—মোটর পর্য্যন্ত হয়ে যাবে। আজ এখানে বেড়াও, কাল ওখানে বেড়াও। ইচ্ছে হোল আজ কাশী বেড়াতে যাবে, কাল এলাহাবাদ কি দার্জ্জিলিং বেড়াতে যাবে—গেলে।

শরৎ হি হি করে হেসে উঠে বললে, আপনি যে রূপকথার গল্প আরম্ভ করে দিলেন দেখচি। আমি মুখে বললেই সব হবে—এ যেন সেই আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের—যাক্ গে, সত্যি হোক না হোক—ভেবে তো নিলাম—বেশ লোক কিন্তু আপনি!

—আমি মোটেই গল্পকথা বলি নি ভাই। আপনি ইচ্ছে করলেই হয়—

—আমি কি আর ইচ্ছে করলে বাবার চাকরী করে দিতে পারি? অবিশ্যি আমিও বুঝতে পারি বাবার যদি থিয়েটারে চাকুরী হয়, তবে সব হয়। বাবা যে কি চমৎকার বেহালা বাজান, সে আপনি শোনেন নি—কলকাতার থিয়েটারে সে রকম পেলে লুফে নেয়। যেমনি বাজান, তেমনি গাইতে পারেন।

হেনার হাসি পাচ্ছিল। পাড়াগেঁয়ে একটা বুড়ো এমন বেহালা বাজায় যে তাকে কলকাতার বড় থিয়েটারে লুফে নিয়ে এত টাকা মাইনে দেবে যে তাতে ওদের বাড়ী, গাড়ী, জুড়ি, ঢাক, ঢোল সব হয়ে যাবে। শোনো কথা। বাঙাল কি আর গাছে ফলে?

হেনা চুপ করে ভাবলে। আর বেশি বলা কি উচিত হবে একদিনে? অনেকদূর সে এগিয়েচে—অনেক কথা বলে ফেলেচে। মাগী কি সত্যিই বোঝে না—না ঢং করচে? কিন্তু যদি সত্যি ও বুঝতে পেরে থাকে তার কথার মর্ম্ম—তবে আর না বলাই ভালো। ভয় করে বাবা, এমনি ফোঁস্ করে উঠে একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুলতে পারে। বাঙালীকে বিশ্বাস নেই।

শরৎ বললে, কই বললেন না আমি ইচ্ছে করলে কি করতে পারি?

এ কথার জবাবে হেনা খপ করে বলে ফেললে, তুমি বুঝতে পারচো না ভাই সত্যিই আমি কি বলচি ?

এই পর্য্যন্ত বলেই হেনার হঠাৎ বড় ভয় হোল। চোখ বুঁজে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার দরকার নেই—আপাততঃ সাহসও নেই তার। কথা সামলে নেবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে একই নিঃশ্বাসে সে কণ্ঠস্বরকে লঘু ও হাস্য তরল করে এনে বললে, বুঝলে এবার ? একটু ঠাট্টা করচি তোমায়। তাই কি কখনো হয় ? তুমি আমি বললে কি হবে বলো। এমনি বলছিলাম। চলো নীচে যাই—রাত্রে কি খাবে ?

—কিছু না। আমি কিছু খাইনে রাত্রে।

—বেশ, একটু দুধ একটু মিষ্টি খেতে আপত্তি আছে ?

—আমি কিছুই খাবো না, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

হেনা মনে মনে বললে, তুমি না খেয়ে মরো না, আমার কি ? এমন একগুঁয়ে বালাই যদি আর কখনো দেখে থাকি। যা বলবে তাই। 'না' বললে আর 'হাঁ' করবার যো নেই।

এই সময় নীচের তলায় খুব একটা চেঁচামেচি শোনা গেল। কে জড়িত স্বরে চীৎকার করচে, কে গালাগালি করচে।

শরৎ ভীতমুখে বললে, ওকি ভাই ? কে চেঁচাচ্ছে ? আমাদের বাড়ীতে না ?

হেনা পাংশু মুখে বললে, না, ও আমাদের বাড়ী নয়।

হরি সা মদ খেয়ে কমলার ঘরে ঢুকে নিত্যকার মত উপদ্রব সুরু করেচে। সর্ব্বনাশ।

এই সময় নীচে মারধরের শব্দ শোনা গেল। এও নতুন নয়, হরি সা মদ খেয়ে এসে কমলাকে ঠেঙায় মাঝে মাঝে—পয়সার খাতিরে গায়ের কালশিরে ঢেকে আবার হাসতে হয় কমলাকে। কিন্তু—

শরৎ ব্যস্ত হয়ে বললে, না দেখুন, আমাদের বাড়ীতে নীচের ঘরেই।

কমলার ঘরের দিকে মনে হচ্ছে। যান, যান, আপনি শীগগির যান—দেখুন—চলুন যাই আমরা। কে হয়তো বদমাইস ঘরে ঢুকেচে—

চেঁচামেচি বাড়লো। আর রক্ষা হয় না। হরি সা গর্দ্দভের মত চেঁচানি জুড়েছে। হরি সা যে একদিন মাটি করে দেবে সব, হেনা তা জানতো। সেই লম্বা কথাওয়ালা গিরিন এই সময় আসুক না দেখেন যাক।

কমলার গলার কান্না মেশানো আর্ত্ত স্বর শোনা গেল—ও দিদি—তোমরা এসো, আজ আমায় মেরে ফেললে মুখপোড়া—আর পারি নে দিদি—উঃ আর রক্ষা হয় না। তবুও এ্যাকট্রেস্ হেনা মরীয়া হয়ে শেষ চাল চাললে। মুখে দিব্যি শান্ত হাসি এনে বললে···ও আমাদের বাড়ী না, পাশের বাড়ীর সেই বুড়ো মাতালটা। ছাদ থেকে মনে হয় যেন আমাদের বাড়ী। রোজই শুনচি। যাবেন না নীচে—জানলা দিয়ে ওদের ঘরটা দেখা যায় কি না? আমাদের দেখলে আবার গালাগাল করবে। আমি তো এ সময় সিঁড়ি দিয়ে নামি নে—

সাত

ওদিকে কমলার চীৎকার তখনও শোনা যাচ্চে।

শরৎ বললে, ও তো পষ্ট গঙ্গাজলের গলা—আপনি কি বলচেন?

তারপর সে নিজে এগিয়ে গিয়ে কমলার ঘরে ঢুকলো। গিয়ে যা দেখলে তাতে সে অবাক হয়ে গেল। কমলা মেঝেতে পড়ে কাঁদচে, একটা কালো মোটামত লোক তক্তপোষের ওপর বসে, তার হাতে একখানা পাখা। পাখার বাঁটের দিকটা উঁচিয়ে বোধ হয় কিছুক্ষণ আগে সে কমলাকে মেরেচে, কারণ পাখাখানা উল্টো করে ধরা রয়েচে লোকটার হাতে।

শরৎকে দেখে কমলা দিশাহারা ভাবে বললে, আমায় মারচে গঙ্গাজ- —আমায় বাঁচাও—

শরৎ কমলার হাত ধরে বললে, তুমি চলে এসো আমার সঙ্গে—

মোটামত লোকটা গর্জ্জন করে বলে উঠলো, ও কোথায় যাবে?

পরক্ষণেই সে শরতের দিকে ভাল করে চেয়ে বললে, সুর নরম করে তরের মত রসিকতার সুরে বললে, তুমি কে চাঁদ?

শরৎ সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে কমলার হাত ধরে তাকে ঘরের বাইরে আনতে গেল।

বুড়ো লোকটা বললে, ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্চ চাঁদ? ওকে আমার দরকার আছে—তুমিও এখানে বসো না একটু—কোন্ ঘরে থাকো?

পরে কমলার দিকে চাহিয়া কড়া সুরে বলল, এই যাবি নে। বোস বলচি?

শরৎ বললে, আপনি একে মারচেন কেন?

—আমার ইচ্ছে—তুমি কে হে আমার কাজের কফিয়ৎ নিতে এসো? আমার নাম হরি সা। বৌবাজারে আমার দোকানে ছাপ্পান্ন হাজার টাকার জল বিক্রী হয় মাসে—শুধু জল, বুঝলে চাঁদ। বোতলভরা জল—

শরৎ ততক্ষণ কমলার হাত ধরে ঘরের বাইরে এনেচে। কমলার পিঠের কাপড় তুলে দেখলে, পিঠের অনেক জায়গায় লম্বা লম্বা ...রের দাগ। হেনা কখন এসে নিঃশব্দে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছে। শরৎ তার দিকে চেয়ে বললে—দেখুন, ওই কে একজন লোক কি রকম মার মেরেচে —কে ভাই উনি তোমার?

কমলা চুপ করে রইল, তখনও সে নিঃশব্দে কাঁদচে।

এ কথার উত্তর দিলে স্বয়ং হরি সা। কমলার পিছনে পিছনেই সে ঘরের বাইরে এসে বললে—আমি কে ওর? শুধু ওকে জিজ্ঞেস করো

ওর পেছনে কত টাকা খরচ করেচি আমি। হাড়কাটা গলির দোকানখানাই উড়িয়ে দিয়েচি ওর পেছনে—আমার—আচ্ছা আমি বসচি গিয়ে ঘরের মধ্যে। ও পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘরে আসুক—

শরৎ এতক্ষণও খুব খারাপ কোনো সন্দেহ করে নি। কমলার কোনো গুরুজন হবে এতক্ষণ ভেবেছিল—যদিও লোকটার কথাবার্ত্তার ধরণে সে রাগ করেছিল খুব। কিন্তু এবার তার বুকের মধ্যেটা যেন হঠাৎ ধক্ করে উঠলো, এ কোন সমাজে সে এসে পড়েচে যেখানে দাদামশায়ের বয়সী বৃদ্ধ নাৎনীর বয়সী মেয়ের সম্বন্ধে এ ধরণের কথাবার্ত্তা বলে? সে কোথায় এসে পড়েচে! বুড়ো লোকটার সঙ্গে কমলার সম্পর্কে কি?

প্রভাসের বৌদিদিই বা তাকে এত মিথ্যে কথা বলতে গেল কেন?

সে হেনার দিকে তীব্রদৃষ্টিতে চেয়ে বললে, আপনি জেনেশুনে আমায় কি সব কথা বলছিলেন এতক্ষণ? আমার আপনারা কোথায় এনেচেন? এ সব কি কাণ্ড!

হেনা ঠোঁট উল্টে বললে, নেও নেও গো রাইমণি। অমন সতীপনা অনেককে করতে দেখেচি—প্রথম প্রথম যারা আসে, সবাই সতী থাকে কত দেখলুম, কত হোল আমাদের এ চক্ষের সামনে—

শরৎ রাগের সুরে বললে, তার মানে? কি বলচেন আপনি?

—যা বলচি তা বলচি, ভেবে দ্যাখো। আর ঢং দেখাতে হবে না তোমাকে। বেরিয়ে এসেচ তো প্রভাসের আর গিরিনের সঙ্গে—কোথায় এসে পড়েচ বুঝতে পারচ না? তোমার এ কূল ও কূল দুকূল গিয়েচে। এখন যেখানে এসে উঠেচ যেখানেই থাকো—সুখে থাকবে। তোমার বাবা এখানে নেই—চলে গিয়েচে কাল। তুমি এখানে ওদের সঙ্গে পালিয়ে এসে উঠেচ শুনে—

শরতের মুখ থেকে হঠাৎ সব রক্ত চলে গিয়ে সমস্ত মুখখানা ফ্যাকাসে

হয়ে গেল। সে হাঁ ক'রে হেনার মুখের দিকে চেয়ে রইল। মুখ দিয়ে কোনো কথা বার হোল না, শুধু তার ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগলো।

ওর অবস্থা দেখে হেনার ভয় হোল।

বাঙালনীর ঢং দ্যাখো আবার! ফিট টিট হবে নাকি রে বাবা! আ: কি ঝঞ্ঝাটেই তাকে ফেলে গেল ওই কথার ঝুড়ি গিরিনটা। এসে সামলাক এখন তাল।

সে কাছে এসে বললে, ভাই ভাই তুমি তো আর জলে নেই? ভয় কিসের? আমি তো বলছিলাম তোমার সব হবে। থাকো না এখানে আমাদের এই বাড়ীতে। তোমায় মাথায় করে রেখে দেবে এখন ওরা। মটোর বলো, কালই মটোর হবে। রেডিও হবে, কলের গান হবে—যা আমি বলেচি। আপাদমস্তক জড়োয়া দিয়ে মুড়ে দেবে—ভয় কিসের তোমার? চাকর-চাকরাণীর মাথায় পা দিয়ে বেড়াও। মুখের কথা খসাও, কাল থেকে সব ঠিক করে দেবো—কি হবে সেই ধাবধাড়া গোবিন্দপুরের জঙ্গলে—

শরৎ এতক্ষণে যেন সম্বিৎ ফিরে পেল।

—বললে এমন লোক আপনারা—তা আমি ভাবি নি। মাথার ওপর ভগবান আছেন, আমি জানতাম না। সরল বিশ্বাস করেছিলাম প্রভাস-দাদার ওপর। ভাইয়ের মত দেখতাম। আপনাদের ভেবেছিলাম ভদ্রঘরের মেয়ে। আমার বোকামির শাস্তি যথেষ্ট হয়েচে—

কান্নায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

হেনার মন যে পথকে আশ্রয় করে পোক্ত হয়েচে, সেই পথের ওর সংকীর্ণ দৃষ্টি ও মনুষ্যত্বকে শৃঙ্খলিত করে রেখেচে। পাপের পথে যে মনে ঝানু হয়ে পড়ে, পুণ্যের আলো প্রবেশ করবার বাতায়ন-পথ তার নিজের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে রুদ্ধ হয়ে যায়।

হেনার মন গলবার নয়।

সে বললে, কেন কান্নাকাটি করচো ভাই? প্রথম প্রথম অবিশ্যি একটু কষ্ট হয়—কিন্তু জগতে এসে সুখের মুখ যদি না দেখলে তবে করলে কি? এখানে দিব্যি সুখে থাকো—পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খাও—সব সয়ে যাবে।

শরৎ বললে, আপনি দয়া করে আর কিছু বলবেন না। আমি গরীব লোকের মেয়ে, আমি বাসন মেজে ভাত রেঁধে কাঠ চ্যালা করে সংসার করে এসেচি এতকাল, এক দিনের জন্যও ভাবি নি যে কষ্টে আছি। আপনাদের সুখ নিয়ে থাকুন আপনারা—

এই সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে দুপ্ দুপ্ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল গিরিন।

তাকে দেখে হেনা যেন অকূলে কূল পেয়ে গেল। তার দিকে ফিরে বললে, এই যে! বাপরে বাপ! এত ঝক্কি পোয়াবার জন্যে আমি রাজি হই নি তা বলে দিচ্চি। ওই নাও, সব খুলে বলেচি—যা বোঝো করো।

গিরিন বললে, কি, ও বলে কি?

জিগ্যেস করো, তোমার সামনেই তো বিরাজ করচে সশরীরে—

গিরিন শরতের দিকে ফিরে বললে, কি? বলচ কি তুমি? তোমার বাবা তোমার কথা সব শুনে পালিয়েচে। এখানে থাকো পরম সুখে থাকবে—

শরৎ বললে, আপনি আমার কোনো কথা বলবেন না। আমায় ছেড়ে দিন দয়া ক'রে—আমি গাঁয়ে চলে যাবো বাবার কাছে—

গিরিন বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বললে, সে গুড়ে বালি। এতক্ষণ গাঁয়ে রটে গিয়েচে সব। কোথায় দু-দিন দুরাত কাটিয়েচ গাঁয়ের সবাই জেনে গিয়েচে। আর ঘরে জায়গা নেই তোমার—এখন যা বলচি তাতে রাজি হও চাঁদ—

শরৎ হঠাৎ তীব্র, পুরুষ কণ্ঠে বলে উঠলো—খবরদার, আমাকে যা তা বলবার কোনো এক্তার নেই আপনার জানবেন—সাবধানে কথা বলুন—

গিরিন কৃত্রিম ভয়ের ভাণ করে হেনার পেছনে লুকোবার অভিনয় করলে। বললে—ও বাবা, শূলে দেবার না ফাঁসিতে লটকাবার হুকুম হয়ে গেল বুঝি। তাল সামলাও হেনাবিবি—

শরৎ বললে, সে দিন নেই, আজ আমার বাবা গরীব, আমরা গরীব—নইলে আপনাদের মত ছোটলোককে শূলে ফাঁসে দেওয়া খুব বেশি কথা ছিল না গড়শিবপুরে—যাক্, আমায় যেতে দিন, আমি চলে যাবো—

গিরিন বললে, কোথায় যাবে চাঁদ? সে পথ বন্ধ—আমি তো—

শরৎ বলে উঠলো, আবার ওই ইতরের মত কথা। আমি কোনো কথা শুনবার আগে আপনি আমার সামনে থেকে চলে যান—ভদ্রলোক বলে ভুল করে ঠকেচি—

শরতের কথাবার্ত্তার ভঙ্গির মধ্যে ও কণ্ঠস্বরে এমন কি একটা জিনিস ছিল যাতে গিরিন কুণ্ডু যেন সাময়িক ভাবে ভয় খেয়ে চুপ করলে।

হেনা ওকে আড়ালে চুপিচুপি বললে, কেন ও বাঙালনীকে রাগাচ্ছ। রাগিয়ে কাজ পাবে না ওর কাছে।

—বাপরে! কেবলই যে ফোঁস ফোঁস করে? আজ ওকে ... নে রাখো—

—আমি পারবো না, আমার থিয়েটার আজ—

—তুমি নিয়ে যাও কমলাকে। হরি সাকে আমি নিয়ে ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে যাচ্ছি। থাকুক এখানে চাবি দেওয়া আটকানো—

হেনা ফিরে গিয়ে বললে, তোমার কথা হোল। বাড়ী যাবে কোথায়?

সেখানে সব রটে গিয়েচে—গাঁয়ে যাবে কোন মুখে? এখানে সুখে থাকবে।

—সে ভাবনা আপনি ভাববেন না। আমার যে দিকে দু-চক্ষু যায় চলে যাবো। মা-গঙ্গা তো আছেন, শেষ পর্য্যন্ত। এমন কি করেচি আমি যাতে মা আমায় কোলে স্থান দেবেন না?

শরতের গলা আবার কান্নার বেগে আটকে গেল। বললে—লোককে বিশ্বাস করে আজ আমার এই দশা—কি করে জানবো যে মানুষের পেটে এত থাকে!

হেনা বললে, আচ্ছা, তাই হবে। না হয় মোটরে করে তোমাকে ইষ্টিশানে রেখে আসুক—দেখে আসি নীচে—

সে চলে গেল। কমলাকে গিরিন কি বলতে নিয়ে গেল পাশে। শরৎ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হেনার ওপরে উঠে আসবার অপেক্ষা করলে। তারপর তার দেরি হচ্চে দেখে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে দেখলে বাইরের দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে ওরা ঘরে তালা দিয়েচে।

শরৎ আবার ওপরে উঠে এল। একবার মনে করলে তালা দেয়নি, ওরা গাড়ীর সন্ধানে গিয়েচে। আনতে দেরি হচ্চে হয় তো।

শরৎ এসে চুপ করে ওপরে অনেকক্ষণ বসে রইল।

বাড়ী নির্জ্জন, নিস্তব্ধ। জলতেষ্টা পেয়েচে বড়, জল আছেও কিন্তু এবাড়ীতে সে জলস্পর্শ করবে না, জলতেষ্টায় মরে গেলেও না। প্রভাসদা'র বাবার কি সত্যিই অসুখ? হয় তো সব মিথ্যে কথা ওদের। ওদের কথাতে বিশ্বাস করেই আজ তার এই দশা। প্রভাসও লোক ভাল নয় নিশ্চয়ই।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। কেউ আসে না। শরৎ জানালা দিয়ে পাশের বাড়ীতে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করলে। কোনো লোক দেখা গেল না। দু'ঘণ্টা তিন ঘণ্টা কেটে গেল শরৎ বসে বসে হাপুস নয়নে

কাঁদতে লাগলো। সম্পূর্ণ অসহায়, কেউ তাকে জানে না, কেউ চেনে না। কি সে এখন করে?

শেষ পর্য্যন্ত সে ভাবলে, এও ভালো, দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালও ভালো। ওরা না আসুক, সে এখানে না খেয়ে মরবে। মরতে তার ভয় নেই। একবার আশা ছিল বাবার সঙ্গে দেখা করে সব কথা খুলে বলে--কিন্তু বাবার দর্শনলাভ অদৃষ্টে বোধ হয় নেই।

বিকেল হয়ে আসচে। পাশের বাড়ীর গায়ে লম্বা ছায়া পড়েচে। শরৎ বসে বসে একটা উপায় ঠিক করলে। সে যেই দেখবে পাশের বাড়ীর জানালায় লোক, তাকে সে নিজের অবস্থার কথা জানাবে। তার কথা শুনে দয়া হবে না কি ওদের? বাড়ীর চাবিটা খুলিয়ে দেবে না তারা?

হঠাৎ সে দেখলে পাশের বাড়ীর জানালায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে।

সে চেঁচিয়ে বললে, শুনুন, এই যে এদিকে—

মেয়েটি ওর দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, আমায় বলচো—কি ভাই?

—আমায় এ বাড়ীতে আটকে রেখেচে। আমি পাড়াগাঁ থেকে এসেচি—আমায় দোরটা খুলে দিন—দয়া করুন আমার ওপর।

—এ তো হেনাদিদির বাড়ী। হেনা নেই?

—হেনা কে জানি নে। তবে কেউ এখন এবাড়ীতে নেই। আমায় তালা দিয়ে বন্ধ করে রেখে চলে গিয়েচে—

তোমার বাড়ী কোথায়?

—অনেক দূরে। গড়শিবপুর বলে একটা গাঁ—যশোর জেলা—

—এখানে কার সঙ্গে এসেচ?

প্রভাস আর অরুণ বলে দুজন লোক—আমাদের গাঁয়ের—

মেয়েটি মুচকি হেসে বললে, তারপর ঝগড়া হয়েচে বুঝি? থাকো ভাই থাকো। এসেচ যখন, তখন যাবে কোথায়?

শরৎ ব্যগ্রস্বরে বললে, না না—আপনি বুঝতে পারচেন না। ওরা আমায় ঠকিয়ে এনেচে, আমি ভদ্রলোকের মেয়ে। আমায় দোর খুলে দিন কাউকে বলে দয়া করে—আমায় বাঁচান—আমার সব কথা শুনুন—

মেয়েটি ঠোঁট উল্টে বললে, সবাই বলে ঠকিয়ে এনেচে। তবে এসেছিলে কেন? ওসব আমি কিছু করতে পারবো না—কে হাঙ্গামা পোয়াতে যাবে বাপু তোমার জন্যে? যারা এনেচে, তাদের কাছে বোঝাপড়া করো গে—

কথা শেষ করে মেয়েটি জানালা থেকে সরে গেল। শরৎ জানতো না যে এপাড়ায় আশপাশের বাড়ীতে যে-সব স্ত্রীলোক বাস করে, তারা কেউ ভদ্রঘরের নয়, মনে, চরিত্রে পেশায় তারা হেনারই সগোত্র। এদের কাছ থেকে সাহায্য ভিক্ষা নিষ্ফল।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। বিকেল বেশ ঘনিয়ে এসেচে। এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে শরৎ তাড়াতাড়ি ছুটে বাইরের বারান্দায় এসে দেখতে গেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসচে একা কমলা। ওর পেছনে কেউ নেই। ওকে দেখে কমলা হাসিমুখে বললে—কি ভাই গঙ্গাজল?

তারপর তাড়াতাড়ি দু-তিনটী সিঁড়ি একলাফে ডিঙিয়ে এসে শরতের গলা জড়িয়ে ধরে বললে, গঙ্গাজল—কি কষ্ট ওরা তোমাকে দিলে? কোনো ভয় নেই ভাই, আমি যখন এসে গিয়েচি। তুমি পালাও—আমি লুকিয়ে দেখতে এসেছিলাম তোমার কি দশা হচ্ছে—হয় তো এতক্ষণে একটা উপায় হয়েচে ভেবেছিলাম। তুমি চলে যাও—আমার কাছে এ বাড়ীর একটা চাবি থাকে, তাই রক্ষে।

এতক্ষণ শরৎ কথা বলবার অবকাশ পায় নি, এত তাড়াতাড়ি সব ব্যাপারটা ঘটলো।

সে এইবার বললে, ভগবান আছেন গঙ্গাজল, তাই তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন ভাই—আমার তো আর কেউ ছিল না—

কমলা বললে, তুমি ভাই তাড়াতাড়ি নেমে চলো জিনিষপত্র কিছু এনেছিলে—সুটকেশ কি পুঁটুলি (—নেই ?···এসো নেমে। গিরিনরা এসে পড়তে পারে। আমায় দেখলে গোলমাল করবে। হেনা-দি থিয়েটারে গিয়েছে—সে আজ এখুনি আসবে না।

শরৎ ওর সঙ্গে ফুটপাথে এসে দাঁড়ালো।

কমলা বললে, ভাই, তুমি এখন কোথায় যাবে ?

—যেদিকে দুই চোখ যায়—ভগবান আমার হাত ধরে যে পথে নিয়ে যাবেন। আমাদের গড়ের ভাঙা দেউলে সন্দে পিদিম দিয়েছি জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত—তিনি পথ দেখিয়ে দেবেন আমায়। পথ না হয়, মা-গঙ্গা আর কোল থেকে ঠেলে ফেলবেন না।

কমলার চোখ জলে ভরে উঠলো। সে বললে, আমরা নরকের কীট, ভাই, তোমার মত মেয়ের পায়ের ধুলো পড়ে আমাদের পাপের বাসা পবিত্র হয়ে গেল। একটু সাবধানে থেকো, তোমার রূপ যে কি তুমি নিজে জানো না, আমাদের মাথা ঘুরে যায়। পুরুষের দোষ কি দেবো ? তারপর সে আঁচল খুলে পাঁচটা টাকা নিয়ে শরতের হাতে দিয়ে বললে, এই টাকাকটা সঙ্গে রাখো দিদি। দরকার হবে, ছোট বোনের কাছ থেকে নিতে লজ্জা নেই। সুসময় আসে, অনেক রকমে শোধ দিতে পারবে।

শরৎ বললে, তুমিও কেন চল না আর সঙ্গে ? এই কষ্ট সহ্য করে মার খেয়ে কেন এখানে পড়ে থাকো ? চলো দুই বোনে পথে বেরুই ভগবানের নাম ক'রে। তিনি নিরুপায়ের উপায়, একটা কিছু করে দেবেনই তিনি—

কমলা বিষণ্ণ মুখে বললে, না দিদি। আমার তা হবার নয়। আমার

মা এখানে—মার বয়েস হয়েছে—তাকে ফেলে যেতে পারবো না। তাছাড়া আরও অনেক কাল এই পথের পথিক এক পুরুষে নয়, অনেক পুরুষে। আমাদের উদ্ধার নেই—আমি যাবো বললেই যাওয়া হবে না। বাঁচি মরি এখানে থাকতে হবে। গোবরের গাদাতে জন্মেছি, গোবরের গাদাতেই মরতে হবে।

শরৎ কমলার চিবুক ধরে আদর করে বললে, না ভাই, গোবরের গাদায় তুমি পদ্মফুল—

কমলা অশ্রুসজল চোখে মাথা নীচু করে বললে, একটু পায়ের ধুলো দাও দিদি। ছোট বোন বলে মনে রেখো যেখানে থাকো—আমার আর দেরি করবার যো নেই—

কমলা বিদায় নিয়ে দ্রুতপদে চলে গেল।

কমলা চলে গেলে শরৎ বড় একা মনে করলে নিজেকে। এতক্ষণ তবুও একটা অবলম্বন ছিল, তাও গেল। এখন থেকে সে সম্পূর্ণ একা, নিঃসহায়। কখনো এমন অবস্থায় পড়েনি জীবনে। কোথায় সে এখন যায়? বেলা পড়ে এসেছে—এই বিশাল অপরিচিত সহর সামনে। সুনির্দ্দিষ্ট পথে চিন্তাধারাকে চালিত করবার শিক্ষা ওর নেই—যারা এ বিষয়ে আনাড়ি, তাদের চিন্তা যেমন খাপছাড়া ধরণের, ওর বেলাতে তার ব্যতিক্রম হোল। শরৎ ভাবলে—কালীঘাটে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে শুদ্ধ হই—যা কিছু পাপ যদি বটে থাকে কিছু, গঙ্গায় ডুব দিয়ে কেটে যাবে এখন—

একটা ঘোড়ার গাড়ী যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। গাড়োয়ান এ পাড়াতেই থাকে—এ পাড়ার স্ত্রীলোকদের সে চেনে—সওয়ারি খুঁজবার চেষ্টায় বললে, গাড়ী চাই?

শরৎ যেন অকূলে কূল পেলে। গাড়ী ডেকে নিজে সে চড়তে পারতো না—কি করে গাড়ী ডাকতে হয়, কি বলতে হয়, এ সবে সে অনভ্যস্ত। সে বললে, আমায় কালীঘাট নিয়ে যাবে?

—কেন যাবো না বিবিজান? চলো—

—কত ভাড়া দিতে হবে?

—তিন টাকা দিও, তোমাদের এ পাড়ার ভাড়া তো বাঁধাই আছে। ওই খেঁদি বিবি যায়, বড় পারুলবিবি সেদিন গেল—তিন টাকা দিলে। আমি যাস্তি লেবো না।

শরৎ দরদস্তুর করিতে জানে না। দু'টাকার জায়গায় তিন টাকা ভাড়ায় সওয়ারি পেয়ে গাড়োয়ান মনের আনন্দে গাড়ী ছুটিয়ে দিলে। গড়ের মাঠ দিয়ে যখন গাড়ী চলেছে, তখন শরতের মনে হোল একটা বিশাল জনস্রোতের মধ্যে সেও একজন। প্রকাণ্ড মাঠটার মধ্যে দিয়ে কত রাস্তা, কত গাড়ী ঘোড়া, ট্রাম গাড়ী, মোটর গাড়ী, লোকজন ছুটেছে, চলেছে—দূরে গঙ্গাবক্ষে বড় বড় জাহাজের মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। সকলের ওপর উপুড় হওয়া নীল আকাশের কতটা দেখা যাচ্ছে, মুচুকুন্দ চাঁপা-গাছের সারির নীচে সাহেবদের ছেলে-মেয়েদের ঠেলে নিয়ে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট ঠ্যালা গাড়ীতে—জীবনটা ছোট নয়, সংকীর্ণ নয়—এত বড় জগতে যদি সবাই বেঁচে থাকে নিজে নিজের পথে—সেও থাকবে। ভগবান তাকে পথ দেখিয়ে দেবেন।

গাড়ীতে বসেই গতির বেগে মন যখন পুলকিত, তখন অনেক কথা এমন অল্প সময়ের জন্যে আসে, শরীরের জড়তার সুদীর্ঘ অবসরে নিষ্প্রভ ও অলস মন যা কখনো দেয় কল্পনা করতে পারে না।

এই অল্প সময়টুকুর মধ্যেই শরৎ অনেক কথা ভেবে ঠিক করলে। সে আর গড়শিবপুরে ফিরবে না।

বাবা সেখানে গিয়ে আছেন, হয় তো তিনি গিয়ে বলেছেন মেয়ে

তাঁর মারা গিয়েছে। সে গেলেই গ্রামে কলঙ্ক রটবে। সে কলঙ্কের হাত থেকে বাবাকে সে রক্ষা করবে।

কোথায় সে যাবে? তা সে জানে না আজ, যদি কখনো কারো অনিষ্ট চিন্তা না করে থাকে জীবনে, কখনো অন্যায় না করে থাকে—তবে সে সবের জোর নেই জীবনে?

কালীঘাটে পৌঁছে সে গঙ্গায় ডুব দিলে, তার পর আর কোথাও যাওয়া নিরাপদ নয় ভেবে সে কালী-মন্দিরের সামনে চুপ করে বসে রইল।

সন্ধ্যার আরতি আরম্ভ হোল। কত মেয়ে সাজগোজ করে আরতি দেখতে এল। তার মধ্যে ও চুপ করে বসে বসে সকলের দিকে চেয়ে দেখলে। কত বৃদ্ধা এসে দোরের কাছে ওর পাশে বসলো। রাত্রি বেশি হোল। ও ভাবলে কোথায় যাবে এখন। কোনো জায়গা নেই যাবার। এত বড় বিশাল সহরে অসহায়, তরুণী নারীর পক্ষে নিরাপদ স্থান কোথায় এই দেবমন্দির ছাড়া। সুতরাং সে বসেই রইল। বসে বসে মনে পড়লো বাবার কথা। গড়শিবপুরের জঙ্গল-ঘেরা বাড়ীতে বাবাকে একা হয়তো এতক্ষণ হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হচ্ছে। আনাড়ি মানুষ, কোন দিন জীবনে কুটোটা ভেঙে দুখানা করার অভ্যেস নেই, বেহালা বাজিয়ে আর গান গেয়েই নিশ্চিন্ত দিনগুলো কাটিয়ে এসেচেন বাবা—শরৎ তাঁর গায়ে আঁচটুকুও লাগতে দেয় নি. আজ সে থেকেও নেই, বাবার কি কষ্টই হচ্ছে! তার কথা মনে ভেবে বাবার কি শান্তি আছে?

শরতের চোখে জল এল। বাবার কথা মনে পড়লে মন হু-হু করে। সে কিছুতেই চুপ করতে পারে না, ইচ্ছে হয় সে এখুনি ছুটে চলে যায় সেই গড়শিবপুরের ভাঙা বাড়ীতে, বড় কাঁঠাল কাঠের পিঁড়িখানা বাবাকে পেতে দেয় রান্নাঘরের কোণে—একটা চটা ওঠা কলাই-করা পেয়ালায়

বাবাকে চা করে দিয়ে ছোট্ট খুকীর মত বাবার মুখের দিকে চেয়ে বসে বসে গল্প শোনে।

মন্দিরের সামনে নাটমন্দিরে একজন সন্ন্যাসিনী ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছে—ওর নজর পড়লো। তার চারিপাশ ঘিরে অনেক মেয়েছেলে জড় হয়ে কেউ হাত দেখাচ্ছে, কেউ ওষুধ নিচ্ছে, কেউ শুধু বা কথা শুনচে। শরৎ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে এই দেবমন্দিরের পবিত্রতা অনুভব করতে চাইছিল—যে ঘরে সে আজ দুদিন কাটিয়ে এসেচে তার সমস্ত গ্লানি, অপবিত্রতা, পাপ এই দেবায়তনের ধূপধুনার সৌরভে, শঙ্খঘণ্টার ধ্বনিতে, সমবেত ভক্তমণ্ডলীর প্রাণের নিবিড় আগ্রহে যেন ধুয়ে যায়, মুছে যায়, শুভ্র হয়ে ওঠে, নির্ম্মল হয়ে ওঠে কালীঘাটের মন্দিরের সেবকদের লোভ যেখানে উগ্র, পূজার্থীদের অর্থ শোষণ করবার হীন আকাঙ্ক্ষা সব ছাপিয়ে যেখানে প্রবল হয়ে উঠেচে—পূজার মধ্যে ব্যবসা এসে ঢুকেচে, বৈষয়িকতা এসে ঢুকেচে—সে সব দিক পল্লীবাসিনী শরতের জানা নেই। তার মুগ্ধ মনের ভক্তি ওর চোখে যে অঞ্জন মাখিয়েচে, তার সাহায্যে প্রাচীন ভারতের সংস্কারপূত বাহান্ন পীঠের এক মহাপীঠস্থান জাগ্রত হয়ে উঠেচে ওর মনে, বুদ্ধদেবের সেই অমর বাণী মনই জগৎকে সৃষ্টি করে'—শরতের মনে মহারুদ্রের চক্রছিন্ন দক্ষকন্যা সতীর দেহাংশ সতী নারীর তেজ ও পাতিব্রত্যের প্রতীক স্বরূপ এখানকার মাটিতে আশ্রয় নিয়েচে। এই মাটি তার মনে তেজ ও বল দিক সন্ন্যাসিনীর সামনে বসে সে সারারাত কাটিয়ে দিলে। কিছু কিছু কথাও হোল সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে। সামান্য কিছু ফলমূল কিনে ক্ষুন্নিবৃত্তি করলে।

সন্ন্যাসিনী বললে, বাড়ী কোথায় তোমার?

—গড়শিবপুরে।

—এখানে কোথায় থাকো?

—কোথায় না মা। মন্দিরেই আছি এখন। আশ্রয় নেই কোথাও।

—তোমাকে দেখে মনে হচ্চে তুমি বড় ঘরের মেয়ে। কে আছে তোমার? কি করে এখানে এলে মা? একটা কথা জিগ্যেস করি কিছু মনে কোরো না—কারো সঙ্গে—মানে কেউ ভুলিয়ে নিয়ে এসেছিল?

কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গেই শরতের সরল, তেজোদৃপ্ত মুখের সুকুমার রেখার দিকে, তার ডাগর কালো, নিষ্পাপ চোখ দুটির দিকে চেয়ে সন্ন্যাসিনী এ প্রশ্ন করার জন্যে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়লো।

শরৎ মুখ নীচু করে বললে, না, মা। ও সব নয়। তবে সব তো বোঝেন, মেয়েমানুষের অনেক শত্রু—বিশেষ করে মা, যে সকলকে বিশ্বাস করে তার শত্রু এখন দেখচি চারিদিকেই। ভুলিয়েই এনেছিল বটে মা—তবে আমি ভুলে আসি নি। বুঝলে মা?

—তোমার বয়েস কত মা?

—সাতাশ বছর।

—কিন্তু তোমার রূপ এই বয়েস যা আছে, তা কুড়ি বছরের যুবতীরও থাকে না। তোমার বড় বিপদ এই কলকাতা সহরে। আমার এখানে থাকো—কোথাও গেলে তোমার বিপদ ঘটতে দেরি হবে না মা।

শরতের চোখ ছাপিয়ে জল পড়লো। এই তো মা দক্ষরাণী সতী তাকে আশ্রয় দিয়েচেন। ঠাকুর-দেবতার মাহাত্ম্য কলিকালে তবে নাকি নেই? বাবা তো নাস্তিক, সন্ধ্যে-আহ্নিকটা পর্য্যন্ত করবেন না। সে কত বকুনির পরে জোর করে আসন পেতে বাবাকে আহ্নিকে বসাতো। বাবার কথা মনে পড়তে শরতের চোখের জল আর থামে না। বাবা কি আর সন্দে আহ্নিক করচেন? উত্তর-দেউলে এই সন্ধ্যার বাদুড়নখের জঙ্গল ঠেলে কে সন্দে-পিদিম দিচ্ছে আজকাল? কেউ না।

বহুদূর থেকে সে দেখতে পায়, ভগ্ন দেবীমূর্ত্তির পায়ের চিহ্ন বনে-জঙ্গলে নির্দ্দেশহীন কালো নিশীথ রাত্রে এমনি অমনি পড়ে ভয়ে শিউরে

উঠে কুটীরের ঘরে অর্গলবদ্ধ করবার জন্যে সে আর সেখানে নেই। রাজলক্ষ্মী? সে কি আছি—সে আর সেখানে আসে না। কেনই বা আসবে?

শরৎ সেখানে রইল সেদিনটা। সন্ধ্যার পরে অনেকগুলি মেয়ে আসে—রোজ শাস্ত্রকথা হয়। শরৎ বড় ভালবাসে শাস্ত্রকথা শুনতে, একদিন নকুলেশ্বরের মন্দিরে কত্তকথা হোল। আরও কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে সেখানে শরৎ গেল। কথকথার পর প্রসাদ বিতরণের পালা। সকলের সঙ্গে শরৎও শালপাতা পেতে বাতাসা, শসা, ছোলা ভিজে, ফলমূল নিয়ে এল। সন্ন্যাসিনী ব্রাহ্মণের মেয়ে—তিনি স্বপাক ভিন্ন খান না, নিজে রান্না করেন, শরৎকে শাল পাতে ভাত বেড়ে দেন। সারাদিন খাওয়া হয় না—সন্ধ্যার পর রান্না চড়ে।

তিন-চার দিন পরে একটি বড়লোকের গৃহিণী এলেন সন্ন্যাসিনীর কাছে। স্নানের ঘাটে যেতে শরৎকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন দুপুরে। বোধ হয় সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে তাঁর কিছু কথা হয়ে থাকবে শরতের সম্বন্ধে। বললেন—তোমাকে দেখে আমার বড় ভাল লেগেচে। তোমার নাম কি?

—শরৎসুন্দরী।

—কতদিন সন্ন্যাসিনীর কাছে আছ?

—বেশি দিন না।

—আমাদের সঙ্গে যাবে?

—কোথায় মা?

—আমরা বেরিয়েচি কাশী, গয়া করবো বলে। মুখে বলতে নেই—এখন হবে কি না তা জানি নে। ইচ্ছে তো আছে। আমার বড় মেয়ের বিয়ে হয়েচে লক্ষ্ণৌ। সেখানে গিয়ে একবার মেয়ের সঙ্গে দেখা করবো। আমি যাচ্ছি আর আমার দুই মেয়ে, ছোট ছেলে আর কর্ত্তা।

কটা লোক আমাদের দরকার। বয়েস হয়েচে—একা ভরসা করি নে ব ঝক্কি নিতে বিদেশে। তুমি চলো না কেন আমার সঙ্গে? মাইনে-পত্নে সব ঠিক করে দেবো এখন—কোনো অসুবিধে হবে না। গৌরি বলেছিলেন তোমার কথা। কথা কি জানো, যে সে মেয়ে নিতে রসা হয় না। স্বভাব চরিত্তির কার কি রকম না জেনে বাপু নেওয়া য় যায় না? গৌরি-মা যখন তোমার সম্বন্ধে বললেন—তখন আমার নতে কোন আপত্তি নেই।

মহিলাটির প্রস্তাব ভালই—তবুও শরৎ বলল, ভেবে দেখি মা—আপনাকে আমি বলবো এখন সন্দেবেলা। গৌরি-মার কথকথা আপনি আসবেন তো শুনতে সন্দেবেলা?

তারপর মন্দিরে ফিরে এল ওরা স্নান সেরে।

গিন্নী বললেন, আমি এখন যাচ্ছি মনোহরপুকুর রোডে আমার মেজ জামাইয়ের বাড়ী। নাতির অসুখ, তাকে গৌরী-মার কাছে নিয়ে এসে মাদুলী ধারণ করাবো। জামাই খৃষ্টান মানুষ, ওসব মানে না। মেয়েকে বলে রেখেচি জামাই আপিসে বেরুলে নাতিকে মোটরে নিয়ে আসবো। যাবে আমার সঙ্গে?

শরতের বাবার কৌতুহল হোল। ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী করে ওরা অনেক রাস্তা গলি পার হয়ে একটা ছোট দোতালা বাড়ীর সামনে এসে নামলো। শরৎ আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলে, কলকাতার বড় লোক; দেখি ওদের বাড়ী ঘর কি রকম—

প্রথমে এগারো বারো বছরের একটি মেয়ে নেমে এসে দোর খুলেই চেঁচিয়ে বলে উঠলো—ও মা, কে এসেছে দ্যাখো—

একটি সুন্দরী মেয়ে ওপর থেকে নেমে এসে গিন্নীর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, মা কবে এলে? কখন এলে? চিঠি তো লিখলে না আজ আসচো? এ কে মা?

—ওকে নিয়ে এলাম। আমাদের সঙ্গে যাবে। গৌরি মার কাছে এসেচে—সেখানে থাকে। পাড়াগাঁয়ে বাড়ী—কোন্ জায়গায় গো?

শরৎ বলল—যশোর জেলায় গড়শিবপুরে।

মেয়েটি বলল, এসো, ওপরে এসো।

ওপরের ঘর বেশ চমৎকার সাজানো; শরৎ চেয়ে চেয়ে দেখলে: বড় বড় গদি-আটা চেয়ার, মেঝের উপর বড় বড় সতরঞ্চির মত আসন পাতা। তার ওপর দিয়ে মাড়িয়ে চলে যাচ্চে সবাই, তবে আসন পাতা কেন? এক কোণে একটি ছোট পাথরের মূর্ত্তি, মেয়েটি বলল, তার শ্বশুরের চেহারা। বড় ডাক্তার ছিলেন, আজ ছ'বছর হোল মারা গিয়েচেন। ফুলদানীতে বড় বড় রজনীগন্ধার ঝাড়। রান্নাঘরের মধ্যে কল, রান্না করতে করতে কল টিপলেই জল, ভারি সুবিধে। ছ'সাতটা বড় কাঠের আলমারি-ভর্ত্তি মোটা মোটা বই। সেগুলো দেখিয়ে মেয়েটি বলল, শ্বশুর ডাক্তার ছিলেন বড়, নাম করতে পারিনে। তাঁর ডাক্তারি বই এগুলো—আরও সাত আলমারি বোঝাই বই আছে, নীচের ঘরে—শ্বশুরের শোবার ঘরে।

মেয়েটি শরৎকে কিছু মিষ্টি ও ফল খেতে দিলে।

তারপর গিন্নী মেয়ে ও নাতি সঙ্গে তাদের বড় মোটরে আবার এলেন কালীমন্দিরে। বেলা প্রায় তিনটে। শরৎ বলল, মা, আমি গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি, বড্ড গরম—

আসল কথা গরম নয়। গঙ্গাহীনদেশের মেয়ে শরৎ, গঙ্গাকে কাছে পেয়ে সর্ব্বদা ডুব দিয়ে পুণ্য সঞ্চয়ের লোভ দমন করতে পারে না। কিন্তু স্নান করে উঠে আসবার সময় শরৎ মহা বিপদের সামনে পড়ে গেল। স্নান করে উঠে কৃষ্ণকালী লেনের মুখে এসেচে, বা দিকেই মনসাতলা ও কৃষ্ণকালীর মন্দিরে একবারে দর্শন করে আসবে—হঠাৎ

দেখলে তার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে গিরিন, প্রভাস ও আরও দুটো অজানা লোক। তারা চারিদিকে কি যেন খুঁজচে।

ওর সঙ্গে গিরিনের একেবারে চোখাচোখি হয়ে গেল। গিরিন আঙুল দিয়ে তার সঙ্গীদের ওর দিকে দেখিয়ে বল্লে—এই যে! তারপর সবাই মিলে এসে ওকে ঘিরে ধরলে। গিরিন বলল, তারপর? রাগ করে লুকিয়ে পালিয়ে এসে এখানে আছ? চলো বাড়ী চলো—

সঙ্গীদের দিকে চেয়ে বলল, কেমন বলেছি কি না যে ঠিক কালীঘাটে খুঁজলেই পাওয়া যাবে। আজীর গাড়োয়ান দেখ ঠিক সন্ধান দিয়েছিল। বাবা, এ সব ডিটেক্‌টীভগিরি কি তোমাদের কম্মো?

প্রভাস বলল, চলো শরৎ দিদি, ফিরে চলো—রাগ কেন? আর রাগ করে কি বাড়ী ছেড়ে চলে আসতে হয়?

ওদের কথাবার্ত্তার সুরে এমন একটা সহজ ভাব নিয়ে এসে ফেলেচে যেন শরৎ ওদের বহুদিনের ন্যায্য অভিভাবকত্ব থেকে বঞ্চিত করে নিজের একগুয়েমি এবং বদমেজাজের দরুণ নিজে চলে এসেচে। ওরা যথেষ্ট উদারতা দেখিয়ে আবার ফিরিয়ে নিতে এসেচে। গিরিন বলল, নাও হয়েছে, কোথায় বাসা নিয়েচ চল দেখি—জিনিসপত্র কিছু আছে-টাছে? প্রভাস একখানা গাড়ী ডেকে আনো—এসো—

শরৎ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, এতক্ষণে যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলল, আপনি আবার এসেচেন এখানে পর্য্যন্ত? কেন এসেছেন, আমি আপনাদের সঙ্গে যাবই বা কেন? আপনাদের সাহস তো খুব।

প্রভাসের দিকে চেয়ে বলল, আর প্রভাসদা, আপনাকে মায়ের পেটের ভাইয়ের মত জ্ঞান করতাম—তার সাজা খুব দিয়েছেন। এত খারাপ হয় লোকে তা আমি বুঝি নি। বাবা কোথায়? বাবার খবর কিছু আছে?

গিরিন ওদের দিকে সাট করে চোখ টিপে বলল—আরে আছেই

তো। তিনি তো কাল থেকে এসে আমাদের ওখানে প্রভাসদের বাড়ী বসে। সেই জন্যেই নিতে আসা—চলো।

শরৎ বলল, মিথ্যে কথা। বাবা কখনো আসেন নি। হ্যাঁ প্রভাসদা, সত্যি? বাবা এসেচেন সত্যি বলুন—

প্রভাস বলল, মিথ্যে বলে লাভ? এসে দেখবে চলো। গাড়ী আনি।

—গাড়ী আনতে হবে না প্রভাস-দা। বাবা কখনো আসেন নি। এলে আপনাদের সঙ্গে এখানে আসতেন।

—আমাদের কথা বিশ্বাস হোল না? যাবে কি না তাই বলো।

কলকাতা সহরের রাস্তা—একটি তরুণী মেয়েকে ঘিরে তিন চারজন লোককে কথা কাটাকাটি করতে দেখে দু' একজন লোক জমতে সুরু করলে। একজন ছোকরা এগিয়ে এসে বলল, কি হয়েচে মশাই?

গিরিন কুণ্ডু ঈষৎ সলজ্জ সুরে বলল, ও আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার মশাই। আপনারা যান।

আর একজন বলল, ইনি কে? কি বলচেন? আপনারা নিয়ে যেতে চাইচেন কোথায়?

প্রভাস বলল, উনি আমাদের লোক—

গিরিন বলল, মশাই আপনারা ভদ্দর লোক, চলে যান। আমাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে—সে সব কথা শুনে আপনাদের লাভ কি? আমাদের মেয়ে মানুষ ঝগড়া হয়ে রাগ করে চলে এসেচে তাই নিয়ে যেতে এসেচি।

কে একজন বাহিরে থেকে বলে উঠলো—ওহে চলে এসো না— ওসবের মধ্যে থাকবার দরকার নেই ও বুঝতে পেরেছি। এ সব জায়গায় ও রকম কত কাণ্ড নিত্যি ঘটচে।—

শরৎ অবাক, স্তম্ভিত। এমন সহজ ভাবে এমন নির্লজ্জ মিথ

কথা কেউ যে বলতে পারে তা তার ধারণার বাহিরে। সে এর প্রতিবাদ করতেও পারলে না, প্রকাশ্য রাজপথে অপরিচিত পুরুষ বেষ্টিতা অবস্থায় কথা কাটাকাটি করা, চীৎকার করে ঝগড়া করা তার ঘটে লেখা নেই, তার স্বভাবজ শোভনতা বোধ মুখে যেন হাত চাপা দেয়। সে মরে যাবে তবুও পথে দাঁড়িয়ে ইতরের মত ঝগড়া করতে পারবে না।

লোকদল চলে যেতে সুরু করলে। শরৎ এগিয়ে যেতে চাইলে গিরিন কুণ্ডু এসে পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলল, নাও চলো—খুব ঢলান ঢলালে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, এতগুলো ভদ্দরলোক জুটিয়ে ফেল্লে চারিদিকে—এখন ফিরে চলো আমাদের সঙ্গে—রাগ অভিমান করে কি পালিয়ে আসলে চলে চাঁদ?

গিরিন যেন রাস্তার লোককে শুনিয়ে শুনিয়ে এ কথাগুলো চেঁচিয়েই বলল।

শরতের হঠাৎ বড় রাগ হোল, গিরিনের মিথ্যা কথায়, ধূর্ত্তামি ও শেষের কথার ইতর সম্বোধনে।

সে বললে, আবার ঐ কথা মুখে? আপনার সাধ্য নেই এখান থেকে আমায় নিয়ে যান। আমি এখানে চলে এলাম—এখানেও আপনারা এলেন? পথ ছেড়ে দিন বলচি—

শরৎ তখনই মনে ভেবে দেখলে এই দল যদি তার সঙ্গে যায় বা যে মহিলাটির আশ্রয় সে পেয়েছে তারা যদি এখন এখানে এসে পড়ে, তবে এদের সাজানো মিথ্যে কথায় তাদের মনে সন্দেহ জাগবে এবং তারা তাকে কুচরিত্রা ভেবে তখনি পরিত্যাগ করে চলে যাবে। তাহ'লে সে একেবারে অসহায়—এই সব শুনলে গৌরি মা কি তাকে জায়গা দেবেন আর?

যাক যদি কেউ আশ্রয় না দেয়, গঙ্গা তো কেউ কেড়ে নেবে না?

গিরিন আবার বলল, দাঁড়াও এখানে গাড়ী ডাকি—মিছে রাগ করে কি হবে বলো!

সুর নীচু ও নরম করে বলল, চলো—কেন মিথ্যে পথে পথে ঘুরে কষ্ট পাও। এখানে আছ কোথায় বলো তো? খুব সুখে থাকবে। আমাদের সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। প্রভাস মাসে পঞ্চাশ টাকা দেবে—আমি আর অরুণ পঞ্চাশ। আলাদা সাড়ী ভাড়া করে থাকতে চাও, পাবে—হেনার বাড়ীতেও থাকতে পারো। নেক্‌লেস আর চুড়ি সামনের হপ্তাতেই পাবে। ঘর সাজিয়ে দেবো দুশো টাকা খরচ করে। কলের গান কিনে দেবো। পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকবে, যা যখন হুকুম করো ইচ্ছামত—

শরৎ ঝাঁজের সঙ্গে বলল, আবার ওই সব কথা? চলে যান আপনারা! আপনাদের দেখলেও পাপ হয়। আমি এই পথে বসে থাকবো, মা কালী আমার আশ্রয় দেবেন—

গিরিন জানতো রাস্তার ওপর কোনো জোর করতে গেলেই লোক ছুটে হৈ চৈ বাধিয়ে দেবে, পুলিশ আসবে—সব পণ্ড হবে। মিষ্টি কথায় কাজ হাসিল হোলো না দেখে সে ভয় দেখাতে আরম্ভ করলে। চোখ রাঙিয়ে বলল, সহজে না যাও—জানো আমি, কি করতে পারি? আমার নাম গিরিন কুণ্ডু—থানায় এজাহার করবো তুমি হেনা বিবির হার চুরি করে এনেচ। এক্ষুনি চালান দিয়ে দেবো জানো? হেনা সাক্ষী দেবে—আজ রাতেই হাজতে বাস করতে হবে। ও বাঙালের বাঙালগিরি কি করে ঘোচাতে হয়, সে আমি জানি—তুমি এখানে আছ কোথায় শুনি?

শরৎ বলল, বেশ তাই করুন। ভগবান জানেন আমি কোনো অপরাধ করিনি। এখনও চন্দ্র সূর্যি উঠছে—আমি জীবনে পরের কুটো গাছটাতে কখনো হাত দিইনি। তিনি কখনো আমার মিছামিছি শাস্তি—

হঠাৎ নিজের অসহায় অবস্থা, কল্পনা করে এবং ভগবানের উপর

নির্ভরতার অনুভূতিতে শরতের চোখে জল এসে পড়লো—সে কেঁদে ফেল্লে।

ক্রন্দনরতা মেয়ে পথের ওপর, তখুনি কৌতূহলী জনতা জমতে আরম্ভ করলে আবার!

একজন ষণ্ডা গোছের তোয়ালে কাঁধে লোক এগিয়ে এসে বললে, কি হয়েচে? কে আপনি? উনি কাঁদচেন কেন মশাই?

ভিড়েরই একজন বলল, তা কি জানি? আপনার সঙ্গে কে আছেন মা? হয়েছে কি?

আর একজন বলল, আপনি কোথায় যাবেন? কি হয়েচে আপনার বলুন মা?

এরা গিরিনের দলকে ঠাওর করতে পারেনি—সুতরাং তাদের সঙ্গে জনতার কথা বিনিময় হোল না। জনতার স্বর ক্রমশঃ উত্তেজিত ও কৌতূহলী হয়ে উঠতে দেখে গিরীন বুঝলে এখানে কথা বলতে যাওয়া মানেই বিপদ টেনে আনা। এরা কোনো কথা শুনবে না, সকলেরই সহানুভূতি ক্রন্দনরতা নারীর দিকে। মার খেতে হবে বেশি কথা বললে। বাতাসের মোড় হঠাৎ এমন ভাবে ঘুরে যাবে, তা ওরা ভাবেনি।

গিরীন কুণ্ডু আর যাই হোক, নির্ব্বোধ নয়। বেগতিক বুঝে সে দলবল নিয়ে মুহূর্ত্তে হাওয়া হয়ে গেল।

শরৎ যখন নাটমন্দিরে ফিরে এল, তখন বেলা পাঁচটা।

গৌরী-মা বললেন, এত দেরী হোল যে মা? এসে একটু প্রসাদ খেয়ে নাও। ওরাই পুজো দিয়ে গেল। কাল যাবে তো ওদের সঙ্গে?

শরৎ বলল, যাবো মা, আপনি যা বলেন।

শরৎ ইতি মধ্যে পথে আসতেই ঠিক করে ফেলেচে সে ওদের সঙ্গে যাবে। এখানে থাকলে তার সমূহ বিপদ। আজ উদ্ধার পেয়েচে, কিন্তু

যদি গিরিন তোড়জোড় করে আর একদিন আসে—আসবেই সে, তখন হয়তো জোর করেই নিয়ে যাবে। সন্ধ্যা বেলা গৌরী-মার কথকথা শুনতে গিন্নি এলেন, সব ঠিক হয়ে গেল—কাল বেলা তিনটার সময় শরৎ তৈরী থাকবে। কালই রওনা হতে হবে ওদের সঙ্গে।

রাত্রিটা নিতান্ত ভয়ে ভয়ে কেটে গেল। সকাল উঠে শরৎ গৌরী মার সঙ্গে গঙ্গাস্নান করে এল। তাও তার বুক ঢিপ ঢিপ করছিল, কোন দিক থেকে ওরা এসে পড়ে নাকি। ভগবান কাল বড় বাঁচিয়ে দিয়েছেন! মানুষ এত খল হতে পারে, এমন নয় কে হয় করতে পারে, হাসিমুখে নির্জ্জলা মিথ্যে বলতে পারে গ্রাম্য মেয়ে শরতের তা জানা ছিল না। বিশেষ করে সে যে বাপের মেয়ে। কেদারের মেয়ে তারই মত সরল।

গৌরি মা বললেন, নকুলেশ্বর তলায় গিয়ে একটু প্রসাদী বেলপাতা নিয়ে এসো। তোমার যাত্রার দিন, ওদের যাত্রার দিন। মায়ের ফুল বেলপাতা আমি মন্দির থেকে এনে দেবো।

যাবার সময় গৌরী-মার চোখে জল এল, বললেন—তিনদিনের মায়া, তাতেই তোমায় ছেড়ে দিতে মন কেমন করচে। আবার এসো, দেশে ফিরবার সময় এখান দিয়েই হয়ে যাবে সরলারা।

শরৎ চোখের জলে ভেসে গৌরী-মার পায়ের ধুলো নিলে, বলল—অনেকদিন মাকে হারিয়েছি, আমার সেই মায়ের কথা আবার আপনাকে দিয়ে মনে পড়লো। আশীর্ব্বাদ করুন মা।

হাওড়া ষ্টেশন। মস্তবড় জায়গা। লোকজন গমগম করচে। লম্বা রেলগাড়ী ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াচ্ছে। আলোয় আলো চারিদিকে। ঘরের মধ্যে এসে রেলগাড়ী দাঁড়ায় কেমন করে?

সে সত্যিই চললো তবে? কোথায় চললো?

বাবার সঙ্গে আর দেখা হবে না। কোথায় পড়ে রইল তার আবাল্য পরিচিত গড়শিবপুর, যেখানকার গড়ের জঙ্গলে, তাদের কালো পায়রার

দীঘির জলে, চৈত্র মাসে তুলো-ওড়া বড় শিমুল গাছটার ছায়ায়, উত্তর দেউলের নির্জ্জন পথে বাদুর নখীর শুকনো খালের ঝুমঝুমির শব্দে তার যে জীবনের সুরু, সেই মাটিতেই সেখানকার জ্যোৎস্নার মধ্যে, বর্ষার দিনের মেঘের ছায়ায় যে জীবন সুখদুঃখে আপন পথ ধরে চলে এসেছিল এতদিন —সে জীবনের সঙ্গে আজ চিরদিনের মত ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

শরৎ জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে দিল। চোখের জলে দ্রুত পলায়ন-পর টেলিগ্রাফের তারের খুটি, গাছপালা, ঘরবাড়ী সব ঝাপসা। কামরার মধ্যে শরৎ চেয়ে দেখলে অবাক হয়ে। কাদের সঙ্গে সে আজ দেশ ছেড়ে যাচ্ছে? কারা এরা? ওই মোটামত ফর্সা রংয়ের গিন্নী, এই চৌদ্দ বছরের মেয়ে, ওই তিন চারটি ছোট বড় খুকি, কর্ত্তা আছেন পুরুষ-গাড়ীতে—এদের তো সে চেনে না।

বাবা গান গাইতেন—'দিয়ে মায়া বেড়ি পদে ফেলেচ বিপদে।'

কত যে তার সাধ ছিল দেশবিদেশে বেড়াতে। গড়শিবপুরের জঙ্গল ভাল লাগে না। রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সে কত গল্প! আজ তো সে সব সফল হতেই চললো—কিন্তু এ ভাবে সর্ব্বস্ব ছেড়ে, বাবাকে ছেড়ে গড়শিবপুর জন্মের মত ছেড়ে যেতে হবে। জন্মজন্মান্তরের গভীর চেতনা দিয়েযে গড়-শিবপুরকে তার মন আকড়ে ধরে ছিল তা সে কি কোনদিন ভাবতো?

আর সে ফিরবে না। বাবাকে সে কলঙ্কের হাত থেকে—লোকের টিটকিরি থেকে মুক্ত রাখবে। তার ভাগ্যে পরের বাড়ীর দাসী হয়ে চিরকাল বিদেশে নির্ব্বাসন—যা ঘটে ঘটুক—বুড়ো বয়েসে বাবার মুখ হাসাতে পারবে না। বাবা হয় ত দেশে গিয়ে বলেচেন, মেয়ে মরে গিয়েচে, খুব ভাল। আর সে দেখা দেবে না। দেশের কাছে মৃত হয়েই থাকবে যতদিন বাঁচবে সে।

রাতের অন্ধকারে বাংলা মুছে গেল। কামরাটা ছোট, ধামা, লণ্ঠন, পেঁটরা, বিছানা, জলের কুঁজোতে একটা দিক ঠাসা,—অন্য দিকে শরৎ

একখানি হাত বিস্তার করে বললেন, ওরে বেটা, আজ ত্রিশ বছর বাঁর্শেলগিরি করছি এটুকু আর বুঝিনে? খোলার শেষের গাঙ, সেখানে চারকাঠি না বেঁধে বাঁধব কি না পুকুরে?...হা-হা-হা

গণেশ কেদার রাজার ছিপ ও সরঞ্জাম বয়ে নিয়ে চলল নিজের ছিপগুলোর সঙ্গে।

গড়ের পুকুরের ধারে বেতস ও কণ্টকগুল্মের দুর্ভেদ্য জঙ্গল। গত বর্ষার জলে সে জঙ্গল বেড়ে মধ্যেকার অন্ধকার সুঁড়ি পথটাকে প্রায় ঢেকে দিয়েচে—তার মধ্যে দিয়ে দুজনে সন্তর্পণে চলল পায়ের পাতায় কাঁটা না মাড়িয়ে ফেলে।

পাড়ের ওপারে যেখানে জঙ্গলটা একটু পাতলা হয়ে এসেচে, সেখানে পৌঁছে গণেশ বললে, আমার কিন্তু বাবা ঠাকুর, জোড়া দেউলের নীচে চারকাঠি পোঁতা, দেখে যাবা না একবারটী?

কেদার বললেন, উঃ, ব্যাটা বড় চালাক তো! ওখানে পুঁতেছিস্ তো আমাকে বলিস নি মোটেই। চল্ দেখি—

গড়ের দীঘির বাঁ পাড়ে জঙ্গলের মধ্যে থেকে সেকালের ভাঙা প্রকাণ্ড দেউলের চূড়া যেখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, তারই নীচে দীঘির জলে গণেশ গিয়ে নামলো।

দীঘিটা এত বড় যে এপার থেকে ওপারের গাছপালা যেন মনে হয় ছোট। অনেকগুলো দেউল এখানে আছে গড়ের দীঘির গভীর জঙ্গলের মধ্যে—কোনো কোনো মন্দিরের গায়ে কালো স্লেট পাথরের ওপর মন্দির-নির্ম্মাতার নাম ও সন তারিখ লেখা। একটার ওপর সন লেখা আছে ১০২৪। এ থেকে দেউলগুলির প্রাচীনত্ব অনুমান করা কঠিন হবে না।

গণেশ বললে, ভাল মাছ লেগেছে বাবাঠাকুর, এখানেই বসবা এসো—

কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, কত খোঁজখবর করে। দরিদ্র কেদারের সে সব করবার সঙ্গতি কৈ?—নীরবে ও নিশ্চেষ্ট ভাবে সব সয়ে থাকতে হয়েচে।

কি করবেন উপায় নেই।

কেদার নিজের অলক্ষিতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, নিয়ে চল রে গণেশ, পৌঁছে দে মাছটা বাড়ীতে। একেবারে কেটে দিয়ে তুইও কিছু নিয়ে যা—চল্‌।

সন্ধ্যার অন্ধকার গড়ের পুকুরের বনে দিব্যি ঘনিয়েচে—হেমন্তের প্রথম, ছাতিম ফুলের উগ্র গন্ধে ভরা অন্ধকার বন-পথ বেয়ে দুজনে বাড়ীর দিকে ফিরলে।

দুই

শরৎ বাবার সন্ধ্যা-আহ্নিকের জায়গা করে বসে ছিল, কিন্তু কেদার এখনও ফেরেন নি। বাইরের দোরের কাছে খুট্‌খাট্‌ শব্দ শুনে শরৎ ডেকে বললে, কে? বাবা নাকি?

শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। শরৎ চেঁচিয়েই বললে, দেখে আসি আবার কে, বাবার এখনও দেখা নেই—কোথায় গিয়ে বসে আছে তার ঠিক কি? হাড় ভাজা-ভাজা হয়ে গেল আমার—

দরজার কাছে কেউ কোথাও নেই। শরৎ মুখ বাড়িয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাড়ীর রোয়াকে এসে বসল।

খানিকটা পরে আবার বাইরের দরজায় খুট্‌খুট্‌ শব্দ। এবার যেন বেশ একটু জোরে জোরে। শরৎ এবার পা টিপে টিপে উঠে গিয়ে বাইরের দরজার খিলটা খুলে ফেললে। বাইরে বেশ অন্ধকার, কিন্তু কোথায় কে?

শরতের ভয় ভয় করতে লাগল। তবুও সে খুব সাহসী মেয়ে—এই জঙ্গলের মধ্যে পোড়ো বাড়ীর ধ্বংসস্তূপ চারি দিকে, কত কাণ্ড সেখানে ঘটে—একা , ৎ রাত্রি পর্য্যন্ত বাবার ভাত নিয়ে বসে থাকে। ভয় করলে চলে না তার। মাঝে মাঝে দু-একটা ঘটনাও ঘটে।

ঘটনা অন্য বেশী কিছু নয়, খুট্‌খাট্ শব্দ, একা রান্নাঘরে যখন শরৎ রাঁধছে—বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলা, তখন কে কোথায় ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন বলে উঠে—বেশ কি একটা কথা বললে সেটা বোঝা যায়, কিন্তু কথাটা কি, তা বোঝা যায় না।

এ-সব গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে শরতের।

শরৎ বাপের বাড়ীতেই আছে আজীবন, মধ্যে বিয়ের পর বছর তিনেক শ্বশুরবাড়ী ছিল। শিবনিবাসে ওর শ্বশুরবাড়ী, রাণাঘাটের কাছে। স্বামী মারা যাওয়ার পর আর সেখানে যায় নি, তার কারণ মায়ের মৃত্যুর পর পিতার সংসারে লোক নেই, কে এই বয়সে তাঁকে দুটি রেঁধে দেয়, কে একটু জল দেয়—এই ভাবনা শরতের সব চেয়ে বড় ভাবনা। শরতের শ্বশুরবাড়ীর অবস্থা নিতান্ত খারাপ নয়, অন্ততঃ এখানকার চেয়ে অনেক ভাল—কিন্তু দরিদ্র পিতাকে একা ফেলে রেখে সে সেখানে গিয়ে থাকতে পারে কি করে?

তার শ্বশুর বলে পাঠিয়েছিলেন, এখানে যদি না আস বৌমা, তা হ'লে ভবিষ্যতে তোমার প্রাপ্য অংশ সম্বন্ধে আমি দায়ী থাকব না।

শরৎ তার উত্তরে বলে দেয়—আপনার সম্পত্তি আপনি যা খুশি করবেন, আমার কি বলার আছে সে সম্বন্ধে? বাবাকে ফেলে আমার স্বর্গে গিয়েও সুখ হবে না। আজ বছর দুই আগেই মা মারা যান, এই দু-বছরের মধ্যে শ্বশুর সাত বার লোক পাঠিয়েছিলেন।

শরৎ জানে, বাবার অবর্ত্তমানে এ গাঁয়ে তাঁর চলা-চল্‌তির মহা

অসুবিধে। বাবা সামান্য কিছু খাজনা আদায় করেন, দু-তিন বিঘে ধান করেন,—কষ্টেস্রষ্টে একরকম চলে। কিন্তু সে একা থাকলে এ দুটি আয়ের পথও বন্ধ। গ্রামে লোক নেই, থাকলেও সবাই নিজেরটা নিয়ে ব্যস্ত, শরতের মুখের দিকে কেউ চেয়ে নিজের কাজের ক্ষতি করে শরতের কাজ করে দেবে—তেমন প্রকৃতির লোক এ গাঁয়ে নেই।

সব জেনে শুনেও শরৎ এখানেই রয়ে গিয়েছে। তার অদৃষ্টে যা ঘটে ঘটুক।

সন্ধ্যার পর দেড় ঘন্টা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

কেদারের সঙ্কোচমিশ্রিত কাশির আওয়াজ এই সময় বাইরের উঠানে [illegible]য়া গেল।

শরৎ বললে, কে? বাবা?

—হ্যাঁ—ইয়ে—এই যে আমি—

শরৎ ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল—হ্যাঁ, তুমি যে তা তো বেশ বুঝলাম। এত রাত পর্য্যন্ত এই জঙ্গলের মধ্যে একা মেয়েমানুষ বসে আছি, তা তোমার কি একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই—জিগ্যেস করি?

কেদার কৈফিয়তের সুরে বলতে গেলেন, তাঁর নিজের কোন দোষ নেই—তিনি এক ঘন্টা আগেই আসতেন। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট পঞ্চানন বিশ্বাস তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল একটা গুরুতর বিষয়ের পরামর্শের জন্যে—সেখানেই দেরি হয়ে গেল।

শরৎ বললে—তোমার সঙ্গে কিসের পরামর্শ? ভারি পরামর্শদাতা তুমি কি না!···তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করলে তাদের কাজ আটকে গিয়েছে ভারি—

কেদার নীরবে হাত পা ধুয়ে ঘরে উঠলেন, মেয়ের সঙ্গে বেশি তর্কাতর্কি করে ঝগড়া বাধাতে তিনি এখন ইচ্ছুক নন—নির্ব্বিরোধী লোক কেদার।

মেয়ে আহ্নিকের জায়গা করে বসে আছে দেখে কেদার একটু বিপদে পড়লেন—সেদিকে চেয়ে বললেন—সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে এখন আবার—

—তোমার যত সব ছুতো—সন্ধ্যে উৎরে গেলে বুঝি আহ্নিক করে না? তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, পরকালের কাজটা এখন থেকে করো একটু—

কেদার অপ্রসন্ন মুখে আহ্নিক করতে বসলেন।

বাইরে থেকে কে ডাকলে—ও শরৎদি—আলো ধরো, উঠোনে যে জঙ্গল করে রেখেছ—

হাসতে হাসতে একটি ষোল-সতেরো বছরের শ্যামবর্ণ মেয়ে ঘরে ঢুকল। কেদারকে দেখে সঙ্কোচের সঙ্গে গলার সুর নীচু ক'রে শরৎকেই বললে, জ্যাঠামশায় ফিরেছেন কখন? আমি ভাবলাম বুঝি একা—

—বাবার কথা আর বলিস্ নে ভাই—তিনটের সময় বেরিয়েছিলেন, আর এই এখন এসে আহ্নিক করতে বসলেন—

নবাগত মেয়েটি হাসি হাসি মুখে চুপ করে রইল।

কেদার দায়-সারাগোছের অবস্থায় সান্ধ্যাহ্নিক সাঙ্গ করে বললেন, আছে নাকি কিছু?

—হ্যাঁ, বোসো। বাতাবী লেবু খাবে? মিষ্টি লেবু, ফকিরচাঁদের মা দিয়ে গেল আজ ওবেলা। আর এই নারকোলের নাড়ু ছটোও দিয়ে গেল জল খেয়ে নাও—

জলযোগান্তে কেদার একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, তাহলে রাজলক্ষ্মী তো আছিস্ মা, আমি ততক্ষণ একটুখানি—বরং—ওই হরি বাঁড়ুয্যের ওখান থেকে—

—না যেতে হবে না বাবা। বোসো। রাজলক্ষ্মী ছুপুর রাত পর্য্যন্ত

আমায় আগলে বসে থাকবার জন্যে এসেছে নাকি? ও এখুনি চলে যাবে—

—আমি যাবো আর আসবো মা—এই আধ ঘণ্টার মধ্যে—

—না তোমার আধঘণ্টা আমি খুব ভাল জানি—যেতে হবে না বোসো তুমি। তার চেয়ে বসে একটা গল্প করো—

রাজলক্ষ্মীও আবদারের সুরে বললে, হ্যাঁ জ্যাঠামশাই, বলুন না একটা গল্প। আপনার মুখে কতকাল গল্প শুনিনি। সেই আগে আগে বলতেন—

অগত্যা কেদারকে বসতে হ'ল। খাপছাড়া ভাবে একটা গল্পের খানিকটা বলে তিনি কেমন উসখুস করতে লাগলেন। মন ঠিক গল্পে নেই তাঁর, এটা বেশ বোঝা যায়। শরৎ বললে—কোথায় যাবে বাবা বিশ্বেসকাকার ওখানে কি বড্ড বেশি দরকার তোমার?

কেদার উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন, বিশেষ জরুরি, দুবার লোক পাঠিয়েছে—জমিজমা নিয়ে একটা গোলমাল বেধেছে, তাই আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চায় কি না? তাই—

শরৎ মুখে কিছু বললে না। পঞ্চানন বিশ্বাস ঘুণ বিষয়ী ব্যক্তি, সে লোক তার বাবার মত ঘোর অবৈষয়িক লোকের সঙ্গে পরামর্শ করবার আগ্রহে দু-দুবার লোক পাঠিয়েছিল, একথা বিশ্বাস করা শক্ত। তা নয়, আসলে বাবা বারুইপাড়ার কৃষ্ণযাত্রার দলের আখড়ায় গিয়ে এখন বেহালা বাজাবেন এই তাঁর বৈষয়িক কাজ। যদি কেউ লোক পাঠিয়ে থাকে, সেখান থেকেই পাঠানো সম্ভব।

রাজলক্ষ্মী বললে, দিদি, উনি যান তো একটু ঘুরে আসুন—

শরৎ বললে, হ্যাঁ উনি গেলে রাত এগারোটার কম ফিরবেন না, আমি একা কি করে এখানে বসে থাকি বল্ তো? থাকবি তুই আমার সঙ্গে—বাবা না আসা পর্যন্ত? বলছিস তো খুব যেতে—

কেদার বিব্রত ভাবে বলে উঠলেন, আরে না-না, ওর থাকার দরকার হবে না, আমি যাব আর আসব, এই ধর গিয়ে ঘণ্টাখানেক, দেরি কিসের? যাই তা হোলে?

শরৎ বললে, ন'টার মধ্যে যদি না ফিরে আস, তবে আমি কি রকম রাগ করি দেখো এখন আজ—রাজলক্ষ্মী এখন রইল, তুমি এলে তবে যাবে—

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বললে, বেশ ভালই তো জ্যাঠামশায়, যান আপনি—আমি ততক্ষণ দিদির কাছে থাকি। আসবেন ত শীগ্‌গিরই—

কেদার আর দ্বিরুক্তি না করে বেরিয়ে গেলেন। শরৎ ঠিক বুঝতে পারে নি, কৃষ্ণযাত্রার দলে বেহালা বাজাতে তিনি যাচ্ছিলেন না। কেদারের বাড়ীটির ধারে ধারে অনেক দূর পর্য্যন্ত ভাঙা ও পুরোনো বাড়ী, সবগুলো ভাঙা নয়, তবে পরিত্যক্ত এবং সাপখোপের বাস হয়ে পড়ে আছে বর্ত্তমানে।

চার-পাঁচ রশি কি তা ছাড়িয়েও একটা পুরোনো আমলের উঁচু সদর দেউড়ির ভগ্নাবশেষ আজও বর্ত্তমান। এটা পার হয়ে দুধারে সেকালের আমলের নীচু লম্বা কুঠুরির সারি, কোন কালে এর নাম ছিল কাছারি-বাড়ী এখনও সেই নাম চলে আসছে। এর অর্দ্ধেকখানি এখন মাটির ভেতর বসে গিয়েছে, দেওয়াল সেকালে হয়ত চূণকাম করা ছিল, এখন শেওলা ছাতা ধরে সবুজ রং দাঁড়িয়েছে। কোনও একটা ঘরেও ছাদ নেই—মেজেতে বনজঙ্গল, শালকাঠের বড় বড় কড়ি আর স্তূপের ওপর বড় বড় গাছ—এমন কি দেউড়ির ঠিক পাশেই এই কাছারিবাড়ীর একটা অংশে প্রকাণ্ড এক তিন পুরুষে বটগাছ—যার বয়েস কোনক্রমেই একশ বছরের কম হবে না, বেশিও হতে পারে।

কাছারি-বাড়ী পার হয়ে আর একটা দেউড়ি—এর নাম নহবৎখানা—বর্ত্তমানে কিছুই অবশিষ্ট নেই—দুটি মাত্র উঁচু থাম ও তাদের মাথায়

একটা ফাটা খিলান ছাড়া। থামের একপাশে একপাশে এক সারি সিঁড়ি খানিকটা ভেঙে পড়ে গিয়েছে—বিচুটি গাছের জঙ্গল থাম আর সিঁড়ির ধাপগুলো ঢেকে রেখেছে। হঠাৎ কোন নবাগত লোক এসব জায়গায় সন্ধ্যার পর এলে তার দস্তুরমত ভয় হওয়ার কথা, কিন্তু কেদার নির্ব্বিকার ভাবে এ সব পার হয়ে গিয়ে বড় একটা খালের মধ্যে নামলেন।

এই খালটাকে এখানে গড়ের খাল বলে, কিন্তু এতে জল নেই, খানিকটা খুব নাবাল জমি মাত্র, পশ্চিম কোণের এক জায়গায়—সদর দেউড়ি থেকে প্রায় এক মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে এই খালের খানিকটা জল কচুরী পানায় ভর্ত্তি।

পূর্ব্বদিকের বাহু ধরে এলে গড়ের খালের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত বিরাট ধ্বংসস্তূপ, সম্পূর্ণরূপে জঙ্গলাবৃত, দিনমানে বাঘ লুকিয়ে থাকতে পারে এমন ঘন কাঁটা আর বেত বন, বন্যশূকরের ভয়ে সেদিকে বড় কেউ একটা যায় না।

গড়ের এই দিকটায় বিস্তর বড় বড় ছাতিম গাছ—মানুষের হাতে পোতা গাছ নয়, বন্য বৃক্ষের বীজের বিস্তারে উৎপন্ন।

যেখানে এখনও একটু জল আছে, সেখানকার উঁচু পাড়ে বসে দেখলে এই অংশের দৃশ্য মনে কেমন এক ধরণের ভয় মিশ্রিত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। কেদার অবশ্যি এ সবের দিকে নজর না দিয়েই খালের নাবাল জমি পেরিয়ে ওধারে গিয়ে উঠলেন এবং আরও খানিকটা হেঁটে ছিবাস মুদির দোকানে উপস্থিত হোলেন।

ছিবাস মুদির চালাঘরে ঝাঁপ পড়ে গিয়েচে কারণ এমন গাঁয়ে এত রাতে খরিদ্দার কেউ আসবে না—কিন্তু ঘরের ভেতরে চার পাঁচজন লোক বসে। ছিবাস বল্লে, আসুন বাবাঠাকুর, আপনার জন্যে সব বসে—বলি, বলে গেলেন আসচেন তা দেরী হচ্চে কেন—আসুন বসুন—

এখানে এখন গান-বাজনা হবে—শরৎ সুন্দরী ঠিকই আন্দাজ করেছিল, তবে বারুই পাড়ার কৃষ্ণযাত্রার দলে নয়, এই যা তফাৎ। সবাই সরে বসে কেদারকে বসবার জায়গা করে দিলে। কেদার মহানন্দে বেহালা ধরলেন, তাঁর বেহালা বাজানোর নাম আছে এ গ্রামে। অনেকক্ষণ ধরে গান-বাজনা চলল, আরও দু'তিনজন লোক এসে গান-বাজনায় যোগ দিলে—তবে গ্রামের ভদ্রলোক কেউ আসেনি।

কেদার বেহালায় কসরৎ দেখালেন প্রায় আধ ঘন্টা ধরে, তারপর আবার গান সুরু হল। রাত আন্দাজ এগারটার সময় কি তারও বেশী যখন, গানের আড্ডা তখন ভাঙল।

একজন বললে, বাবাঠাকুর, আলো এনেছেন কি, না হয় বলুন আলো ধরে দিয়ে আসি খাল পার করে—

কেদারের হুঁস হোল এতক্ষণ পরে, বাইরে এসে বললেন, তাই তো, চাঁদ অস্ত গেল কখন? বড্ড অন্ধকার দেখছি যে—

পঞ্চমীর চাঁদের অবিশ্যি যতক্ষণ থাকা সাধ্য ততক্ষণ সে বেচারী আকাশে ছিল, তার কোন কসুর নেই। কেদার রাজার জন্যে দুপুর রাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা তার সাধ্যাতীত।

দাসু কুমোর বললে—আমার সঙ্গে যদি কেউ আসে আমি বাবাঠাকুরকে খাল পার করে দিয়ে আসি—

দু'তিন জন যেতে রাজি হল—একা রাত্রে কেউ ওদিকে যেতে রাজি হয় না, গড়ের মধ্যে আছে অনেক রকম গোলমাল। এ অঞ্চলে সবাই তা জানে। কেদার কিন্তু নির্ভীক লোক, তিনি কোন লোক সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজি নন—দরকার নেই কিছু। তিনি এমনিই বেশ যাবেন।

তবুও জন চারেক লোক পাকাটির মশাল জ্বালিয়ে তাঁকে গড়ের খাল পার করে দিয়ে এল। এত রাত হয়েছে কেদার সেটা পূর্ব্বে বুঝতে

পারেন নি, তা হলে এত দেরী করতেন না, ছিঃ, কাজ বড় খারাপ হয়ে গিয়েচে!

কেদার বাড়ী ঢুকে দেখলেন মেয়ে খিল বন্ধ করে ঘরের মধ্যে শুয়ে মেয়েকে একা এত রাত পর্য্যন্ত এই বনে ঘেরা নির্জ্জন বাড়ীতে ফে বাইরে ছিলেন বলে মনে মনে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হোলেন, তবে ি এ অনুতাপ তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েচে, আর মজা এই যে প্রতিরাত্রে ফিরবার সময়েই এই অনুতাপ মনের মধ্যে হঠাৎ আবির্ভূত হয়, এর আসা এর যাওয়া দুই-ই অদ্ভুত ধরণের আকস্মিক, ন্যায়শাস্ত্রের 'বেগবেগা' জাতীয় পদার্থ, আসবার সময় যত বেগে আসে, ঠিক তত বেগেই নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়—মনে এতটুকু চিহ্নও রেখে যায় না।

শরৎ উঠে বাবাকে দোর খুলে দিলে, ভাত বেড়ে খেতে দিলে। তার মনে রাগ অভিমান কিছুই নেই—সে জানে এতে কোনো ফলও নেই—বাবা যা করবেন তা ঠিক করবেন। ওঁর ঘাড়ে ভূত আছে, সে-ই ওঁকে চরিয়ে নিয়ে বেড়ায়, উনি কি করবেন?

কিন্তু কেদারের ঘাড়ে সত্যিই ভূত চেপে আছে বটে। খাওয়াদাওয়ার পরে অত গভীর রাত্রেও বাবাকে বেহালার লাল খেরোর খোল খুলতে দেখে সে আর কথা না বলে থাকতে পারলে না। বাবা এখন আবার বেহালা বাজাতে বসলেই হয়েচে!

কেদার ব্যাপারটাকে সহজ করবার চেষ্টা করলেন। বেহালা যে তিনি ঠিক বাজাতে চাইচেন এখন তা নয়, তবে একটা সুর মাথার মধ্যে বড় ঘুরচে—সেইটে একবারটি সামান্য একটু ভেঁজে নিতে চান।

শরৎ বল্লে, না বাবা, তোমার ঘুম না আসতে পারে, তোমার খিদে নেই, তেষ্টা নেই, শরীরের ক্লান্তি নেই, ঘুম নেই—সব জয় করে বসে না হয় আছ, কিন্তু আমি এই সারাদিন খাটচি, তুমি এখন রাত দুপুরে

বেহালা নিয়ে কোঁকর কোঁকর জুড়ে দিলে কানের কাছে আমার চোখে ঘুম আসবে?

কেদার বল্লেন, আমি—তা—না হয় দেউড়িতে গিয়ে বসি মা—তুই ঘুমো—

—না তা হবে না। আমি মাথা কুটে মরবো, এই এত রাত্রে অন্ধকারে সাপখোপের মধ্যে তুমি এখন জঙ্গলের মধ্যে দেউড়িতে বসে বেহালা বাজাবে? রাখ ও সব—

কেদার অগত্যা বেহালা রেখে দিলেন। মেয়েমানুষদের নিয়ে মহা মুস্কিল। এরা না বোঝে সঙ্গীতের কদর, না বোঝে কিছু। তাঁর মাথায় সত্যিই একটা চমৎকার সুর খেলছিল, এই দুপুর নিস্তব্ধ নির্জ্জন রাত্রি, সুরটা বেহাগ—রক্তমাংসের শরীরে এ সময় তারের ওপর ছড় চালানোর প্রবল লোভ সামলানো যায়?

মেয়েমানুষ কি বুঝবে?

•

কেদার বিকেলবেলা গেঁয়োখালির হাটে যাবার পথে সাধু সেকরার দোকানে একবারটি ঢুকলেন, উদ্দেশ্য তামাক খাওয়াও বটে, অন্য একটি উদ্দেশ্যও ছিল না যে এমন নয়। সাধু সেকরার বয়েস হয়েছে, নিজে সে একটি হরিনামের ঝুলি নিয়ে একটা জলচৌকিতে বসে মালাজপ করে, তার বড় ছেলে নন্দ দোকান চালায়। ব্রাহ্মণসজ্জনে সাধুর বড় ভক্তি—কেদারকে দেখে সে হাত জোড় করে বললে—আসুন, ঠাকুরমশায়, প্রণাম হই—ওরে টুলটা বার করে দে—ব্রাহ্মণের হুঁকোতে জল ফিরো—

কেদার বললেন—তার পর ভাল আছ সাধু? তোমার কাছে এসেছিলাম একটা কাজে—আমার কিছু টাকার দরকার—তোমার এ বছরের খাজনাটা এই সময়—

সাধুর অবস্থা ভালই, কিন্তু মুখে মিষ্ট হোলেও পয়সাকড়ি সম্বন্ধে ে বেজায় হুঁসিয়ার। কেদারকে যা হয় কিছু বুঝিয়ে দেওয়া কঠিন নয় ত সে বিলক্ষণ জানে—সে বিনীত ভাবে হাত জোড় করে বললে, বড্ড ক যাচ্ছে ঠাকুরমশায়, ব্যবসার আবস্থা যে কি যাচ্চে, সোনার দর এই উঠচে এই নামচে, সোনার দর না জোয়ারের জল! আর চলে ন ঠাকুরমশাই—এই সময়টা একটু রয়ে বসে নিতে হচ্চে—আপনি রাজ লোক, আপনার খেয়েই মানুষ—

কেদার চক্ষুলজ্জায় পড়ে আর খাজনা চাইতে পারলেন না। হাটে ঢুকে আরও দু-একজনের কাছে প্রাপ্য খাজনা চাইলেন—সকলেই তাদের দুঃখের এমন বিস্তারিত ফর্দ্দ দাখিল করলে যে কেদায় তাদের কাছেও জোর করে কিছু বলতেই পারলেন না।

হাটের জিনিসপত্রও সুতরাং বেশি কিছু কেনা হোল না—হাতে পয়সাকড়ি বিশেষ নেই।

সতীশ কলুর দোকানে ধারে তেল নিয়েছিলেন ওমাসে—এখনও একটি পয়সা শোধ দিতে পারেন নি, অথচ সর্ষের তেল না নিয়ে গেলে রান্না হবার উপায় নেই, মেয়ে বলে দিয়েচে।

সতীশ বললে, আসুন দাঠাকুর, তেল দেবো নাকি?

সতীশের দোকানে কোণের দিকে যে ঘাপটি মেরে বৃদ্ধ জগন্নাথ চাটুয্যে বসেছিলেন, তা প্রথমটা কেদার দেখতে পান নি, এখন মুস্কিল জগন্নাথ চাটুয্যে লোক ভাল নয়, গাঁয়ের গেজেট, তার সামনে সতীশকে ধারের কথা বলতে কেদারের বাধলে—অথচ না বললেও তো নয়। জগন্নাথ উঠলে না হয় বলবেন এখন। জগন্নাথ চাটুয্যে হেঁকে বললেন, ওহে কেদার রাজা, এস এস, এদিকে এস ভায়া—তামাক খাও—

কেদার বললেন, জগন্নাথ দাদা যে! ভাল সব?

—ভাল আর কই, আবার শুনেছ তো ওপাড়ার নীলমণি গোঁসাইয়ের

বাড়ীর ব্যাপার ? শোন নি ? তা শুনবে আর কোথা থেকে—শুধু মাছ ধরা নিয়ে আছ বই তো নয়—সরে এল ইদিকে বলি—ঘোর কলি হে ভায়া ঘোর কলি, জাতপাত আর রইল না গাঁয়ের বামুনের—

জগন্নাথ চাটুয্যের কথা শুনবার কোন আগ্রহ ছিল না কেদারের—পরের বাড়ীর কুৎসা ছাড়া তিনি থাকেন না। কিন্তু এঁকে এখান থেকে সরাবার উপায় না দেখলে তো তেল নেওয়া হয় না। কেদার অগত্যা জগন্নাথের কাছে গেলেন। জগন্নাথ গলার সুর নীচু করে বললেন, কাল রাত্তিরে নীলু গোঁসাইয়ের মেয়েটা আফিম খেয়েছিল জানো না ?

কথাটা প্রথম থেকেই কেদারের ভাল লাগলো না ? তবুও তিনি বললেন, আফিম ? কেন ?…

জগন্নাথ চোখ মুখ ঘুরিয়ে হাসি হাসি মুখে বললেন, আর, এর আবার কেন কি কেদার রাজা ! বিধবা মেয়ে, সোমত্ত মেয়ে, বাপের বাড়ী পড়ে থাকে—কোনো ঘটনা-টটনা ঘটে থাকবে। কথায় বলে—

কেদারের নিজের বাড়ীতেও ওই বয়সের বিধবা মেয়ে, গল্প শুনবেন কি, জগন্নাথ চাটুয্যের কথার গূঢ় ইঙ্গিত, শ্লেষ ও ব্যঞ্জনা শুনে কেদার ভেতরে ভেতরে ভয়ে ও সঙ্কোচে আড়ষ্ট হয়ে উঠতে সুরু করলেন। তেল কিনতে এসে এমন বিপদে পড়বেন জানলে তিনি না হয় আজ তৈলবিহীন রান্নাই খেতেন।

জগন্নাথ চাটুয্যে বললেন, আমি শুনলাম কি করে বলি শোনো তবে। কাল আমি ক্ষেত্র ডাক্তারের বাড়ীতে ডাক্তারের স্ত্রীর ব্রত উদ্‌যাপনে নেমন্তন্ন খেতে যাই, তাদের পরিবেশনের লোক হয় না, আমি আবার খাওয়ার পরে নিজে পরিবেশন করতে লাগলুম। রাত প্রায় বারটা হয়ে গেল। তখন ক্ষেত্র ডাক্তার বল্লে, এখানেই আমার বাইরের ঘরে বিছানা পেতে দিক, এখানেই শুয়ে থাকুন—এত রাত্তিরে আর বাড়ী যায় না—

শুয়ে আছি, রাত প্রায় তিনটের সময় নীলু গোঁসাইয়ের বড় ছেলে

ধীরেন এসে ডাক্তারকে ডাকলে। আমি জেগে আছি, সব শুনচি শুয়ে শুয়ে। ধীরেন কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, শীগগির যেতে হবে ক্ষেত্রবাবু মীনা আফিম খেয়েচে—

ডাক্তার বললে, কতক্ষণ খেয়েছে? ধীরেন বললে, কখন যে খেয়েছিল তা তো জানা যায় না। নিজের ঘরে খিল দিয়ে শুয়েছিল, এখন গোঁয়ানি ও কাতরানির শব্দ শুনে সবাই গিয়ে দেখে, এই ব্যাপার।

সেই রাত্রে ক্ষেত্র ডাক্তার ছুটে যায়। কত করে তখন বাঁচায়। তা ওরা ভাবে যে কাগপক্ষিতে বুঝি টের পেল না, কিন্তু আমি যে ক্ষেত্র ডাক্তারের বাইরের ঘরে শুয়ে তা তো কেউ জানে না? সোমত্ত বিধবা মেয়ে মীনা, কি জানি ভেতরের ব্যাপারটা কি—কাল পড়েছে খারাপ কিনা—বলে আগুন আর ঘি—আরে উঠলে যে বোসো।

বারেবারে বিধবা মেয়ের উল্লেখ কেদারের ভাল লাগছিল না—তা ছাড়া জগন্নাথ চাটুয্যে কি ভেবে কি কথা বলছে তা কেউ বলতে পারে না। লোক সুবিধের নয় আদৌ। সর্ষের তেলের মায়া ছেড়ে দিয়েই কেদার উঠে পড়লেন, জগন্নাথ চাটুয্যের সামনে তিনি ধারের কথা বলতে পারবেন না সতীশকে।

জগন্নাথ চাটুয্যে বললেন, তা হলে নিতান্তই উঠলে কেদার রাজা, বাড়ী থাকো কখন হে—একবার তোমাদের বাড়ীতে যাব হে—ভাবি যাব, কিন্তু গড়ের খাল পার হতে ভয় হয়, আর যে বন জঙ্গল গড়ের দিকটাতে! তা ছাড়া আবার সেই তিনি আছেন—

জগন্নাথ চাটুয্যে হাত জোড় করে কার উদ্দেশে দু'তিনবার প্রণাম করলেন।

কেদার বলে উঠলেন, আরে ও কখনো কেউ দেখেনি, এই তো শরৎ রোজ সন্ধ্যের সময় উত্তর দেউলে পিদ্দিম দিতে যায়—একাই তো যায়—কিছু তো কখনো কই—

ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলে ফেলেই কেদার বুঝলেন কথাটা বলা তাঁর উচিত হয়নি—জগন্নাথ চাটুয্যের পেটে কোন কথা থাকে না—এর কথা ওর কাছে বলে বেড়ানই তার স্বভাব—এ অবস্থায়—মেয়ের কথা তোলাই এখানে ভুল হয়েছে—

কিন্তু জগন্নাথ অন্য দিক দিয়ে গেলেন পাশ কাটিয়ে। বললেন, তুমি বলছো কেদার রাজা কিছু নেই, আমরা বাপ-দাদ্দাদের মুখ থেকে শুনে আসছি চিরকাল—নেই বলে উড়িয়ে দিলেই—অবিশ্যি তোমার মেয়ে ঐ নিবান্ধা পুরীর মধ্যে একা থাকে, সাহস বলিহারি যাই—আমাদের বাড়ীর এরা হোলে দিনমানেই থাকতে পারত না—

এদের কথাবার্ত্তায় এই অংশটা সতীশ কলুর কানে গিয়েছিল, সে খদ্দেরকে তেল মেপে দিতে দিতে বললে, এখন অবেলায় ওকথাডা বন্ধ করুন বাবাঠাকুর, দরকার কি ওসব কথায়? চেরকাল শুনে আসছি, বাপ পিতেমো পজ্জন্ত বলে গিয়েছে—গড়ের বাড়ীই পড়ে আছে কতকাল অমনি হয়ে তার ঠিক ঠিকানা নেই—আমার বয়েস এই তিন কুড়ি চার যাচ্ছে, আমি তো ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি ঠিক অমনি ধারা—কেদার দাঠাকুরের বয়েস আমার চেয়ে কত কম—আমি ওনাকে এটুকখানি দেখেচি—

জগন্নাথ চাটুয্যে বললেন, আরে তোমার তো মোটে চৌষট্টি সতীশ, আমার ঠাকুরদা মারা গিয়েছিলেন আমার ছেলেবেলায়, তিনি বলতেন তাঁর ছেলেবেলায় তিনিও গড়বাড়ী অমনি ধর জঙ্গল আর ইটের ঢিবি দেখে আসচেন, তাঁর মুখেও আমি উত্তর দেউলের ওকথা শুনেচি—কেদার রাজা কি জানে? ও কত ছোট আমাদের চেয়ে।

কেদার বলে উঠলেন, ছোট বড় নই দাদা, এই তিপ্পান্ন যাচ্ছে—

জগন্নাথ বললেন,—আর আমার এই ষাঁটি ষাট কি একষট্টি—তা হোলে হিসেব করে দেখো কতদিন হোল, আমার যখন পনেরো তখন

ঠাকুরদা মারা যান, তখন তাঁর বয়েস নব্বইয়ের কাছাকাছি—এখন হিসেব করে দেখ ঠাকুরদাদার ছেলেবেলা, সে কত দিনের কথা—কত দিনের হিসেব পেলে দেখো—

কেদার তেলের আশা ত্যাগ করে উঠে পড়লেন—কোনো উপায় নেই। কারো সামনে তিনি ধারের কথা বলতে পারবেন না—বিশেষ করে জগন্নাথ চাটুয্যের সামনে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়েছে। গেঁয়োখালির হাট থেকে ফিরবার পথে গড়ের সদর দেউড়ির দিকে গেলে ঘুর হয় বলে পূর্ব্বদিক দিয়েই ঢুকলেন কেদার—যে দিকটাতে খালে এখনও জল আছে। এদিকটাতেই বড় বড় ছাতিম গাছ আর ঘন বন। এক জায়গায় মাত্র হাঁটু জল খালে, কার্ত্তিক মাসে কচুড়ী পানার নীলাভ ফুল ফুটে সমস্ত খালটা ছেয়ে ফেলেছে—এতটুকু ফাঁক নেই কোথাও—অন্ধকার সন্ধ্যাতেও শোভা যেন আরো খুলেচে।

খাল পেরিয়ে উঠে গড়ের মধ্যে ঢুকেই ছাতিম বনের ওপারে ডান দিকে এক জায়গায় ধ্বংসস্তূপের থেকে একটু দূরে গোলাকৃতি গম্বুজের মত ছাদওয়ালা ছোট গোছের মন্দির—এরই নাম এ গাঁয়ে উত্তর দেউল। কেন এ নাম তা কেউ জানে না, সবাই শুনে আসচে চিরকাল, তাই বলে।

উত্তর দেউলের পাশ দিয়ে ছোট্ট পায়ে-চলার পথ বাদুড়নখী কাঁটার ঝোপের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। ছাতিম ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশেচে বাদুড়নখী ও জংলী বনমরচে ফুলের ঘন সুবাস। বন বাঁধারে বেশ ঘন আর অন্ধকার। গড়ের এখানকার দৃশ্যটি সত্যিই ভারী সুন্দর।

কেদার একবার গম্বুজাকৃতি মন্দিরটার দিকে চাইলেন। আজ কেন যেন তাঁর গা ছমছম্ করতে লাগলো। অন্ধকার ঘরটার মধ্যে সামান্য মৃদু প্রদীপের আলো—শরৎ এই সন্ধ্যার সময় প্রতিদিনের মত

সন্ধ্যাদীপ জালিয়ে দিয়ে গিয়েছে—এটা কেদার রাজার বংশের নিয়ম, আজন্ম দেখে আসচেন তিনি, উত্তর দেউলে বাতি দিয়ে এসেচেন চিরকাল কেদারের মা, ঠাকুরমা এবং সম্ভবতঃ প্রপিতামহী। কেদারের আমলেও দেওয়া হয়।

তিন

শরৎ বাবাকে বললে, তুমি আজও তো কোথাও খাজনা আদায় করতে বেরুলে না—কি করে কি হবে আমি জানি নে। ঘরে কাল থেকে চাল বাড়ন্ত, কোনো কাজের কথা বললে, সে তোমার কানে যায় না, আমি বলে বলে হার মেনে গিয়েচি—

কেদার বললেন, তা যাবো তো ভাবচি। তুই না বললেও কি আর আমি বাড়ী বসে থাকতাম? একটু বেলা হোক—

শরৎ গৃহকর্ম্মে মন দিলে। কেদার মোটা চাদরখানা গায়ে দিয়ে কিছুক্ষণ পরে বেরুবার উদ্যোগ করতেই শরৎ বললে, না খেয়ে বেরিও না বাবা—আহ্নিক করে একটু জল মুখে দিয়ে যাও—

কিছু খেতে অবিশ্যি কেদারের অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু তৎপূর্ব্বে যে আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানটির কথা শরৎ উল্লেখ বলে, তাঁর যত আপত্তি সেখানে। এত সকালে তিনি আর ও হাঙ্গামার মধ্যে যেতে রাজি নন। সুতরাং তিনি বললেন, আমি এখন আর খাবো না, এসে বরং—সবাই বেরিয়ে যাবে কিনা এর পরে—

তাঁদের গ্রামের পাশে রাজীবপুর চাষাদের গাঁ। এখানে কেদারের তিন-চারটি প্রজা আছে। আজ কয়েক মাস যাবৎ কেদার তাদের

কাছে খাজনার তাগাদা করে আসচেন, কিন্তু জোর করে কাউকে কিছু বলতে পারেন না বলে একটি পয়সাও আদায় হয় নি।

প্রথমেই কেদার গেলেন একঘর মুসলমান প্রজার বাড়ী। দুখানি মাত্র খড়ের ঘর, উঠোনে ধানের মরাই আছে বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে তাতে ধান নেই। আরও দিন পনেরো পরে মাঠ থেকে ধান আসবে। মুরগী চরচে ধানের মরাইয়ের তলায়।

বছর দুই আগে এই বাড়ীর মালিকের মৃত্যু হয়েছিল। ছেলে আর ছেলের বৌ ছিল—গত চৈত্র মাসে ছেলেটির সর্পাঘাতে মৃত্যু ঘটে—এখন শুধু আছে বিধবা পুত্রবধূ আর একটি মাত্র শিশু পৌত্র। সামান্য জমার জমির ধান আর রবিশস্য থেকে কোনো রকমে সংসার চলে এদের।

কেদার উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়ে হেঁকে বললেন, বলি, ও আবদুলের মা, কোথায় গেলে?

বাড়ীতে কেউ ছিল না সম্ভবতঃ। দু-একবার ডেকে কারো সাড়া না পেয়ে কেদার ধানের মরাইয়ের ছায়ায় একখানা কাঠ পেতে বসে পড়লেন। একটু পরে একটি অল্পবয়সী বৌ কলসীকক্ষে উঠানে পা দিতেই কেদারকে দেখে জিব কেটে একহাত ঘোমটা টেনে ক্ষিপ্রপদে উঠোন পার হয়ে ঘরে উঠলো।

একটু পরে বৌটি একখানা পিঁড়ি নিয়ে এসে কেদারের বসবার জায়গা থেকে হাত দশেক দূরে মাটির ওপর রেখে চলে গেল। কেদার সেখানা টেনে এনে তাতে বসলেন।

মেয়েটি আরও প্রায় কুড়ি মিনিট পরে ঘোমটা দিয়ে ঘরের বার হয়ে ছাঁচতলায় নেমে দাঁড়ালো। কোনো কথা বললে না।

কেদার বললেন, আর বছরের দরুন একটাকা পাঁচ আনা আর এ বছরের সমস্ত খাজনা মোট সাড়ে চারটাকা তোমার কাছে বাকি, টাকাটা আজ দিয়ে দাও—বুঝলে?

মেয়েটি নম্রসুরে বললে, বাপজী—

কেদার চমকে উঠলেন। কখনো বৌটি তাঁর সঙ্গে কথা বলেনি—তা ছাড়া ওর মুখের ডাকটি তাঁর বড় ভাল লাগলো। শরতের চেয়েও বৌটির বয়েস কম।

কেদার বললেন—কি ?

—টাকা তো জোগাড় করতে পারিনি আজও, কলাই বিক্রী না করে টাকা দিতে পারবো না।

কেদার দ্বিরুক্তি না করে সেখান থেকে উঠলেন। ওর মুখের 'বাপজী' ডাকের পর আর কখনো তাকে কড়া তাগাদা করা চলে ?

আর এক বাড়ী গিয়ে দেখলেন, তাদের বাড়ীশুদ্ধ সব ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়ে। শুধু রোগের সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে সেখান থেকে তিনি বিদায় নিলেন।

পথে বেলা বেশি হয়েচে। এক দিনের পক্ষে যথেষ্ট বিষয়কর্ম্ম করা হোল—বেশি খাটতে তিনি রাজী নন—বাড়ীর দিকে ফিরবার জন্যে সড়কে উঠেছেন, এমন সময় একজন বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হোল।

বৃদ্ধ লোকটির পরনে আধময়লা থান, গায়ে চাদর, হাতে একটা বড় কেম্বিসের ব্যাগ। তাঁকে দেখে লোকটি জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ মশাই, গড়শিবপুর যাবো কি এই পথে ?

—গড়শিবপুরে কোথায় যাবেন ?

—ওখানকার রাজবাড়ীর অতিথিশালা আছে—শুনলাম, সকলে বললে। অনেক দূর থেকে আসছি, অতিথিশালায় গিয়ে আজ আর কাল থাকবো।

—গড়শিবপুরের রাজবাড়ী ? কে বলে দিয়েছে ? আচ্ছা, চলুন নিয়ে যাই, আমার সঙ্গে চলুন—

কেদারের বাড়ীর অতিথিশালা পূর্ব্বপুরুষদের আমল থেকেই আছে

—সেই নামডাকেই এখনও গ্রামে অপরিচিত বিদেশী লোক এলে কেদারের বাড়ী অতিথি হতে আসে। নিজে খেতে না পেলেও পূর্ব্ব-আভিজাত্যের গৌরব স্মরণ করে কেদার তাদের থাকবার খাবার বন্দোবস্ত করে দিয়ে আসচেন বরাবর। কখনও তাদের ফিরিয়ে দেন নি এ-পর্য্যন্ত। থাকবার জায়গার অসুবিধা বলে কেদার কাছারীবাড়ীর উঠানে অতিথির জন্যে একখানা ছোট্ট দো-চালা খড়ের ঘর তৈরি করে দিয়েছেন অনেক দিন থেকে। খড় পুরানো হয়ে জল পড়তে সুরু করলে কেদার নিজেই চালে উঠে নতুন খড়ের খুঁচি দেন। এই ঘরখানার নামই অতিথিশালা। কেদারকে বিপন্ন হয়ে পড়তে হয় যখন হঠাৎ অতিথি এসে জোটে অতিথিশালায়, হয়ত নিজের ঘরেই সেদিন চালবাড়ন্ত—কিন্তু অতিথিকে যোগান দিতেই হবে। অনেক সময় গ্রামের লোক দুষ্টুমি করেও কেদারের অতিথিশালায় অতিথি পাঠিয়ে দেয়, সকলেই জানে কেদারের অবস্থা—মজা দেখবার লোভ সামলান যায় না সব সময়।

সাধারণ অতিথিকে দিতে হয় এক বোঝা কাঠ ও এক সের চাল, সামান্য কিছু নুন আর তেল। তরকারী হিসাবে দু-একটা বেগুন। এর বেশী কিছু দেবার নিয়ম নেই পূর্ব্বকাল থেকেই—কেদারও তাই দিয়ে আসছেন।

তবে ভদ্র অতিথি এলে অন্য রকম ব্যবস্থা। নিয়ম আছে দই, ঘি, সৈন্ধব লবণ, মিছরিভোগ আতপ চাল, মুগের ডাল ইত্যাদি তাকে যোগাতে হবে। কেদারের বর্ত্তমান অবস্থায় সে-সব কোথায় পাওয়া যাবে—কাজেই নিজের ঘরে রেঁধে তাদের খাওয়াতে হয়—যতই অসুবিধে হোক, উপায় নেই। মাসের ভিতর পাঁচদিনও শরৎকে অতিথিসেবা করতেই হয়। আজ কেদার একটু অসুবিধায় পড়লেন। ঘরে এমন কিছু নেই যা অতিথিশালায় পাঠাতে পারেন। লোকটা

কি শ্রেণীর তা এখনও তিনি বুঝতে পারেন নি, সাধারণ শ্রেণীর বলেই মনে হচ্ছে। অন্ততঃ আধসের চালও তো দিতে হয়, কি করা যাবে সে-সম্বন্ধে পথ হাঁটতে হাঁটতে কেদার সেই কথাই ভাবতে লাগলেন।

বৃদ্ধ বললে, কতদূর মশাই গড়শিবপুর?

—এই বেশী নয়, ক্রোশখানেক হবে। আপনাদের বাড়ী কোথায়?

—বাড়ী অনেকদূর, মেহেরপুরের কাছে, নদে জেলায়।

—কোথায় যাবেন?

—দেশ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি। যেদিকে যখন ইচ্ছে, তখন সেদিকেই যাব—

—আপনারা?

—ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ গোত্র, অভিনন্দ ঠাকুরের সন্তান, খড়দা মেল—আমার নাম শ্রীগোপেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। কেদারের বয়স হয়েছে, সুতরাং তিনি জানেন ব্রাহ্মণদের পরিচয় দেবার এই প্রথাই ছিল আগের কালে। তাঁর ছেলেবেলায় তিনি দেখে এসেছেন বটে। এমন লোককে অতিথিশালায় পাঠিয়ে দেওয়া যায় না, নিজের ঘরে রেঁধে খাওয়াতে হয়।

গ্রামের মধ্যে ঢুকে ব্রাহ্মণ বললে, রাজবাড়ী দেখিয়ে দিয়ে আপনি চলে যান, আমার সঙ্গে অনেকদূর তো এলেন—আর কষ্ট করতে হবে না আপনার—

চলুন, আমিও সেই বাড়ী যাব, সেই বাড়ীর লোক—

আপনি রাজবাড়ীর লোক বুঝি?

আজ্ঞে হ্যাঁ—আমি—ইয়ে—

গড়ের খাল পেরিয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বিস্ময়ের চোখে দু-ধারের জঙ্গলেভরা ধ্বংসস্তূপগুলির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে বললে—রাজবাড়ী কতদূর?

কেদার কৌতুকের সঙ্গে বললেন, দেখতেই পাবেন চলুন না—

দেউড়ির ধ্বংসস্তূপ পার হয়ে নিজের চালাঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কেদার বললেন, এই রাজবাড়ী—আসুন—

বৃদ্ধ কেদারের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চাইলে।

কেদার হাসিমুখে বললেন, আমিই রাজবাড়ীর রাজা—আমারই নাম কেদার রাজা—

ইতিমধ্যে শরৎ বার হয়ে বাবাকে কি বলতে এল, সকালে উঠে সে স্নান সেরে নিয়েছে, ভিজে চুলের রাশি পিঠময় ছড়ানো, গায়ের রঙের সুগৌর দীপ্তি রোদে দশগুণ বেড়েছে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অবাক হয়ে এই সুন্দরী মেয়েটির দিকে চেয়ে রইল।

কেদার বললেন, আমার মেয়ে, ওর নাম শরৎসুন্দরী। প্রণাম কর মা, ব্রাহ্মণ অতিথি—

শরৎসুন্দরী বাবাকে আড়ালে ডেকে জিগ্যেস ক[illegible]. তার পর নিয়ে তো এলে, এখন উপায়? ঘরে তো এক দানা চা[illegible] নেই। বেলাও হয়েছি কি করি বলো।

কেদার বললে, যা হয় করো মা তুমি। আমি কিছু [illegible]নি নে—ওবেলা আমি বরং—

শরৎসুন্দরী রাগ করে নিজের গালে চড় মারতে ল[illegible]ন। ফর্সা গাল রাঙা হয়ে গেল। মেয়ে এ রকম প্রায়ই করে থা[illegible] বেশী রাগ হ'লে—কেদার অপ্রতিভ মুখে বললেন, ও কি করো [illegible] ছেলেমানুষি না—ছিঃ—অমন করতে নেই।

শরৎ জলভরা চোখে রাগের ও ক্ষোভের সুরে বললে, আমার ইচ্ছে করে গলায় দড়ি দিয়ে কি মাথায় ইট ভেঙে মরি, আমার এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না বাবা। বেলা দুপুরের সময় তুমি এখন নিয়ে এলে ভদ্রলোক অতিথি, নিজেদের নেই খাবার জোগাড় কি করবো বলো বুঝিয়ে আমায়। নিত্যি তোমার এই কাণ্ড—কত বার না তোমায় বলেছি?

কেদার চুপ করে রইলেন, বোবার শত্রু নেই। শরৎ তাঁর সামনে থেকে চলে গেলে তিনি অতিথির সঙ্গে এসে বসে গল্প করতে লাগলেন, কারণ শরৎ যে একটা যা হয় কিছু ব্যবস্থা করে ফেলবেই এ বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। শরৎ রাগী তেজী মেয়ে বটে, কিন্তু সব কাজে ওর ওপর বড় নির্ভর করা চলে অনায়াসে। খুব স্থিরবুদ্ধি মেয়ে।

শরৎ কোথা থেকে কি করলে তিনি জানেন না, আহারের সময় অতিথির সঙ্গে খেতে বসে দেখলেন, ব্যবস্থা নিতান্ত মন্দ হয় নি। এত বেলায় মাছও যোগাড় করে ফেলেছে মেয়ে।

আহারাদির পর কেদার বললেন, আচ্ছা গোপেশ্বরবাবু, চলুন একটু বিশ্রাম করবেন—

তারপর তিনি অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে অতিথিশালার দো-চালা ঘরখানাতে এলেন। এখানে একখানা কাঁঠাল কাঠের সেকেলে ভারি তক্তপোষ পাতা আছে অতিথির জন্যে! পাতার জন্য একখানা পুরানো মাদুর ছাড়া অন্য কিছু নেই চৌকীখানার ওপর—দেবার সঙ্গতিও নেই তাঁর।

বৃদ্ধ বললেন, বসুন আপনিও। একটু গল্পগুজব করি আপনার সঙ্গে।

আপনার গান-বাজনা আসে?

সামান্য এক আধটু। সে কিছুই নয়—

কেদার উৎসাহে উঠে পড়লেন চৌকি ছেড়ে। গানবাজনা জানে এ ধরণের লোকের সঙ্গ তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। এ রকম লোকের দেখা হওয়া ভাগ্যের কথা।

বললেন, কি বাজনা আসে আপনার?

কিছু না, তবলা বাজাতে পারি এক-আধটু—

তাহলে আজ ওবেলা আপনাকে যেতে দেব না গোপেশ্বরবাবুর—আমাদের আড্ডায় আজ সন্ধ্যেবেলা আপনাকে নিয়ে একটু আমোদ করা যাবে—

তা আপনি যখন বলছেন, আমায় থাকতে হবে রাজামহাশয়। আপনার অবস্থা এখন যাই হোক, আপনি গড়শিবপুরের রাজবংশের বড় ছেলে, এখানকার রাজা। আমি সব শুনেছি আসবার পথে। আপনার অনুরোধ না রেখে উপায় কি বলুন। আর আমার কোনো তাড়া নেই, দেশ দেখতেই তো বেরিয়েছি—

—পায়ে হেঁটে?

—পয়সাকড়ি কোথায় পাবো বলুন। পায়ে হেঁটে যত দূর হয় দেখছি। কখনো দূর দেশে যাই নি, কিছু দেখি নি ছেলেবেলা থেকে অথচ বেড়াবার সখ ছিল। ভাবলুম বয়েস ভাঁটিয়ে গেল, এই বার বেরুনো যাক, হেঁটেই দেশ দেখবো। পয়সা কোন দিনই হবে না আমাদের হাতে। তা ধরুন ইতিমধ্যে নদীয়া জেলা সেরে ফেলেছি, এবার আপনাদের জেলায়—

—আপনার বয়েস হয়েছে, এ রকম হেঁটে পারেন এখনও?

—বয়েস হোলেও মনটা তো এখনও কাঁচা। কখনও কিছু দেখি নি বলেই যা দেখি তাই ভাল লাগে। ভাল লাগলে হাঁটতে কষ্ট বোধ হয় না। কিন্তু আপনাকে দেখে আজ এত অবাক হয়ে গিয়েছি আমি, আর আপনাকে এত ভাল লেগেছে যে কি বলবো। সত্যিকার রাজদর্শন ভাগ্যি ছাড়া হয় না, আমার তাই হ'ল আজ। আমিও আমুদে লোক রাজামশায়, আমোদ ভালবাসি বলেই বেরিয়েছি এই বয়সে।

—বেশ তো, এখানে দু-চারদিন থেকে যান। আমোদ করা যাবে এখন। আপনার মত লোক পেলে—

—কি জানেন, অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে নেনজার

হয়ে পড়লুম রাজামশাই। দেশ ভ্রমণের সখ ছিল এন্তক লাগাৎ। কিন্তু যেতে পারিনে কোথাও—মনটা মাঝে মাঝে এমন হাঁপাতো! এই আমার বাষট্টি তেষট্টি বছর বয়েস হয়েছে—আর বছর মেয়ে ছুটিকে পাত্রস্থ করার পরে সংসারের ঝঞ্চাট অনেকটা মিটলো। তাই বলি কখনও কোথাও যাইনি—বেড়িয়ে আসি একবার। এক বছর পথে পথে থাকবো—

—লাগছে ভাল এরকম হেঁটে বেড়ানো ?

—আহা, বড্ড ভাল লাগছে রাজামশায়। নদীর ধার, বটগাছের তলা, মাঠে যবের ক্ষেত, মেয়েদের ক্ষার কাচা পিঁড়ির ওপরে হয়তো কোন পুকুরের পাড়ে—যা দেখি তাতেই অবাক হয়ে থাকি। বড় ভাল লেগেছে আমার। যেখানে নদে জেলা শেষ হোল সেখানে একটা বড় শিমুল গাছ আছে রাস্তার ধারে। জেলার শেষ কখনো দিখিনি—হাঁ করে জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম কতক্ষণ। বেশ রদ্দুর তখন মাঠে, আকাশে বড় বড় চিল উড়ছে, কেউ কোনদিকে নেই। আমার এক বন্ধু ছিল, মারা গিয়েছে অনেক কাল, নাম ছিল কেশব—সেও দেশ দেখতে ভালবাসতো বড়। তার কথা মনে পড়লো—

কেদার বিস্ময় ও কৌতূহলের সঙ্গে বৃদ্ধের গল্প শুনছিলেন। তিনিও বেশিদূর কোথাও যান নি, অবস্থার জন্যেও বটে—তা ছাড়া সংসার ফেলে নড়তে পারেন না। তাঁর বড় ইচ্ছে হোল মনে, নদে জেলা যেখানে শেষ হয়েছে, সেই শিমুল গাছের তলাটাতে গিয়ে একবার দাঁড়ান। কখনও তিনি দেখেন নি জেলা কি করে শেষ হয়। বৃদ্ধের বর্ণনা শুনে মনে মনে অনেক দূরের সেই অদেখা শিমুল গাছের তলায় চলে গিয়েছে তাঁর মন।

জিগ্যেস করলেন, আচ্ছা গোপেশ্বরবাবু, সেই যেখানে শিমুল গাছ, তার এপারে ওপারে তো দুই জেলা? একহাত তফাতেই নদীয়া, এধারে

আবার যশোর। ধরুন আমার যদি একখানা বেগুনের ক্ষেত থাকে সেখানে, একটা বেগুন গাছ থাকবে নদে জেলায়, আর দু-হাত তফাতের বেগুন গাছটা হবে যশোর জেলায়! ভারি মজা তো? সেখানে এমন জমি আছে?

বৃদ্ধ হেসে বললে, কেন থাকবে না? ওদিকের জমি হবে কেষ্টনগর সদরের তৌজিভুক্ত, আর এদিকের জমি হবে যশোর বনগাঁ মহকুমায়—

—বাঃ বাঃ চমৎকার!

কেদারের মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বিস্ময়ে ও কৌতূহলে। তাঁর ইচ্ছে হোল জায়গাটা এখান থেকে কতদূর হবে জিগ্যেস করে নেন। কিন্তু পরক্ষণে মনে পড়লো বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাবার যো নেই তাঁর, শরৎকে একা এই বনের মধ্যে রেখে একদিনও তাঁর নড়বার উপায় আছে কোথাও? ছেলেমানুষ শরৎ···

জেলার সীমা দেখা তাঁর ভাগ্যে নেই।···

সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধকে নিয়ে কেদার ছিদাম মুদির দোকানে গিয়ে হাজির হোলেন। রাত দশটা পর্য্যন্ত সেখানে গান বাজনা পুরোদমে চললো। সকলেই বৃদ্ধের হাতে তবলা বাজানোর প্রশংসা করলে। খুব দ্রুত এবং খুব মিঠে হাত। সেই আড্ডাতেই আবার এসে জুটলো জগন্নাথ চাটুয্যে। কোন দিন আসে না, আজ কি ভেবে এসে পড়েছে কে জানে।

জগন্নাথ চাটুয্যে মন দিয়ে খানিকক্ষণ গোপেশ্বরের বাজনা শুনে কেদারের কানে কানে বললে, ওহে কেদার রাজা, এ ভদ্রলোকটি বেশ গুণী দেখছি। এঁকে জোটালে কোথা থেকে হে?

কেদার পরিচয় দিলেন। জগন্নাথ শুনে খুব খুসি। তাঁর ইচ্ছে কেদারের বাড়ীতে এসে লোকটির সঙ্গে কাল সকালে আরও আলাপ জমান। কেদার বললেন, তা বেশ তো দাদা, আসুন না সকালে—

বাড়ী ফিরতে রাত্তি হয়ে গেল এগারোটা। রাত্রের আহারের ব্যবস্থা শরৎ ভালই করেছে। মেয়ের ওপর ভার দিয়ে কেদার নিশ্চিন্ত থাকেন কি সাধে? কোথা থেকে সে কি করে, কেদার কোনোদিন খবর রাখেন নি। সে রাগ করুক, ঝাল করুক, সংসারের কাজকর্ম্ম সব ঠিকমত করে যাবে, সে বিষয়ে তার ত্রুটি ধরবার উপায় নেই। ঠিক ওর মায়ের মত।

কেদার বোধ হয় একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন কি ভেবে।

গোপেশ্বর চাটুয্যে কেদারের সঙ্গে বাড়ীর চারিদিক বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখলেন। গড়ের এপারে ওপারে যে সব প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ বনের আড়ালে আত্মগোপন করে রয়েছে, তার সবগুলির ইতিহাস কেদারেরও জানা নেই।

একটা পাথরের হাত-পা-ভাঙা মূর্ত্তির চারিদিকে নিবিড় বেতবন।

গোপেশ্বর বললেন, এ কি মূর্ত্তি?

কেদার বলতে পারলেন না। বিভিন্ন মূর্ত্তি চিনবার বিদ্যা নেই তাঁর। বাপ-পিতামহের আমল থেকে শুনে আসছেন এখানে যে মূর্ত্তি আছে, অনেক দিন আগে মুসলমানদের আক্রমণে তার হাত-পা নষ্ট হয়—কেউ বলে কালাপাহাড়ের আক্রমণে;—এ সব কিছু নয়, আসল কথা কেউ কিছু জানে না। বিস্মৃত অতীত কোন ইতিহাস লিখে রেখে যায় নি। গ্রামের মাটির বুকে—সময় যে কি সুদূরপ্রসারী অতীত ও ভবিষ্যৎ রচনা করে মানুষের স্মৃতিতে, সে গহন রহস্য এ সব গ্রামের লোকের কল্পনাহীন মনে কখনও তার উদার ছায়াপাত করে নি, পঞ্চাশ বছর আগে কি ঘটেছিল গ্রামে, তাও তারা যখন জানে না—তখন ঐতিহাসিক অতীতের কাহিনী তাদের কাছে শুনবার আশা করা যায় কি করে?

গড়ের বাইরে এসে কেদার একটা প্রাচীন বটগাছ দেখালেন। কেদারের বাড়ী থেকে জায়গাটা অনেক দূর। গাছটার তলায় প্রাচীন আমলের বড় বড় শিবলিঙ্গ, গৌরীপট্ট, মকরমুখ, পয়োনালা ইত্যাদি

এখানে ওখানে পড়ে আছে স্মরণাতীত কাল থেকে—গ্রামের কেউ বলতে পারে না সে সব কোথা থেকে এল। বৃদ্ধ পেশ্বর চাটুয্যে এ সব দেখে সেই ধরণের আনন্দ পেল, অধিকতর সচ্ছল অবস্থার ভ্রমণকারী দিল্লী আগ্রার মুঘলযুগের কীর্ত্তি দেখে যে আনন্দ পায়।

কেদারকে বললে, রাজামশায়, যা দেখলাম আপনার এখানে, জীবনে কখনও দেখি নি। দেখবার আশাও করিনি—এ সব জিনিস কত-কালের, যুধিষ্ঠির ভীম অর্জ্জুনের সময়কার বোধ হয়। পাণ্ডবদের রাজ্য ছিল এখানে—না?

সেই রাত্রে বৃদ্ধের জ্বর হ'ল। পরদিন সকালে কেদার অতিথিশালায় এসে দেখলেন বিছানা থেকে উঠবার ক্ষমতা নেই বৃদ্ধের। সারাদিন জ্বর ছাড়ল না—সন্ধ্যার পরে তার ওপর আবার ভীষণ কম্প দিয়ে জ্বর এল। কেদার পড়ে গেলেন মুস্কিলে। তাঁর বাইরে যাওয়া একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। সর্ব্বদা রোগীর কাছে থাকতে হয়, কখনও তিনি কখনও শরৎ।

সাতদিন এভাবে কাটল। কেদার পাশের গ্রাম থেকে সাতকড়ি ডাক্তারকে এনে দেখালেন, বৃদ্ধের জ্ঞান নেই—তার বাড়ীর ঠিকানাটি জেনে নিয়ে যে একখানা চিঠি দেবেন তার আত্মীয়স্বজনকে, তার সুযোগ পেলেন না কেদার। শরৎ যথেষ্ট সেবা করলে এই বিদেশী অতিথির। ঠিক সময়ে দুটি বেলা বৃদ্ধের পথ্য প্রস্তুত করে নিজের হাতে তাকে খাইয়ে আসা, বাপের স্নানাহারের সুযোগ দেবার জন্যে নিজে রোগীর পাশে বসে থাকা, নিজের বাবার অসুখ হলেও শরৎ বোধ হয় এর চেয়ে বেশি করতে পারত না।

ন'দিনের পর বৃদ্ধের জ্বর ছেড়ে গেল। পথ্য পেয়ে আরও এক সপ্তাহ বৃদ্ধ রয়ে গেল অতিথিশালায়—কেদার কিছুতেই ছাড়লেন না, এ অবস্থায় তিনি অতিথিকে পথে নামতে দিতে পারেন না। বাড়ীতে চিঠি দিতে

চাইলে বৃদ্ধ ঘোর আপত্তি তুললে। বললে, কেন মিছে ব্যস্ত করা তাদের? স্ত্রী নেই, মেয়ে নেই—আপনার মধ্যে আছে ছেলে দুটি আর ছেলের বৌয়েরা তাদের অবস্থা ভালও নয় বিশেষ, তাদের বিব্রত করতে চাই নে।

পরের সপ্তাহে বৃদ্ধ বিদায় নিয়ে চলে গেল। শরৎ পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করতে বৃদ্ধের চোখে জল দেখা দিল। শরতের মাথায় হাত দিয়ে বললে, এমন সেবা আমার আপনার লোক কখনো করে নি। আমার পয়সা নেই, পয়সা থাকলে হয়তো তারা করতো। তুমি যে বড় বংশের মেয়ে তা তোমার অন্তর দেখেই বোঝা যায়। তুমি আমার যা করলে, কখনো তা পাই নি কারো কাছ থেকে। তোমায় আর কি বলে আশীর্ব্বাদ করবো মা, ভগবান যেন তোমায় দেখেন।

কেদার বললেন, আপনি কি এখন বাড়ী যাবেন?

—না রাজামশায়—বেরিয়ে পড়েচি যখন, তখন ভাল করে সব দেখে নি। অনেক কিছু দেখলাম আরও অনেক কিছু দেখবো। আপনাকে আর মাকে যা দেখলাম এই তো আমার কাছে একেবারে নতুন। বাড়ী থেকে না বেরুলে কি আপনাদের মত মানুষের দর্শন পেতাম? ফিরবার পথে আপনাদের সঙ্গে দেখা না করে যাবো না।

অনেক দিন পরে বাড়ী থেকে বেরুবার অবকাশ পেলেন। বৃদ্ধের অসুখ সেরে গেলেও রুগ্ন অতিথিকে একা ফেলে কেদার কোথাও যেতে পারতেন না বড় একটা। সর্ব্বদা কাছে বসে কথাবার্ত্তা বলতেন। আজ একটা বড় দায়িত্বের বোঝা যেন ঘাড় থেকে নেমে গেল।

ছিবাস মুদীর দোকানের আড্ডায় জগন্নাথ চাটুয্যে বললে—আরে এই যে কেদার রাজা, এসো এসো—কি হোল, অতিথি চলে গেল? যাক, বাঁচা গিয়েছে—আচ্ছা, অতিথি জুটিয়েছিলে বটে! বাপরে, একেবারে একটি মাসের মত জুড়ে বসলো—যাবার নামটি করে না।

কেদার হেসে বললেন, কি করে যায় বলো—বেচারী এসেই পড়ে গেল অসুখে। লোক বড় ভাল, তার কোনো ত্রুটি নেই। তারপর জগন্নাথ-খুড়ো এখানে কি মনে করে? তোমাকে তো দেখিনি এখানে আসতে?

জগন্নাথ বললে, মাঝে মাঝে আসি আজকাল। একা বাড়ী বসে থাকি আর ওই একটু সতীশের দোকান নয় তো পঞ্চানন বিশ্বেসের বাড়ী—কোথায় যাই বলো আর? একটু বেহালা ধরো দিকি হে বাবাজী—তোমার বাজনা শুনিনি অনেক দিন।

শরৎ সন্ধ্যাবেলায় উত্তর-দেউলে প্রতিদিনের মত প্রদীপ দিতে গেল! দীঘির পশ্চিম পার ঘুরে সেই বড় বড় ছাতিম গাছতলা দিয়ে প্রায় তিন রশি পথ যেতে হয়—বড্ড বন এখানটাতে। বাদুরনখীর জঙ্গলে শুকনো বাদুরনখী ফল আঁকড়ে ধরে রোজ শরতের পরনের কাপড়। রোজ ছড়াতে হয়।

যে গম্বুজাকৃতি মন্দিরটার নাম 'উত্তর-দেউল' সেটা একেবারে এই পায়ে চলা সরু পথের পাশেই, গড়ের খালের ধারের ধ্বংসস্তূপ থেকে একটু দূরে, স্বতন্ত্র ভাবে দণ্ডায়মান। বাদুড়নখীর কাঁটাজাল ভেঙে পথটা এসে একেবারে মন্দিরের ভাঙা পৈঠায় উঠেছে। মাটি থেকে খুব উঁচু রোয়াক, তার ওপর গোল গম্বুজাকৃতি মন্দির—দুটি কুঠুরি পাশাপাশি। কি উঁচু ছাদ! শরতের মনে হয় মন্দিরের মধ্যে ঢুকলেই; চামচিকের বাসা—দোর খুলতেই খোলা দরজা দিয়ে একপাল চামচিকে উড়ে পালালো। ভেতরের কুঠুরিতে বেশ অন্ধকার। গা ছমছম করে সাহসিকার, তবুও তো ওর হাতে মাটির প্রদীপ মিটমিট জ্বলছে, আঁচল দিয়ে আড়াল করে আনতে হয়েছে পাছে বাতাসে নেবে। আলো হাতে ভয় কিসের?

হঠাৎ যেন পাশের কুঠুরিতে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল অন্ধকারে।

শরতের বুকের মধ্যে টিপ টিপ করে উঠলো—তবুও সে সাহসে ভর করে কড়াসুরে হেঁকে বললে—কে ওখানে?

ওর হাত কাঁপচে!···

কোনো সাড়া না পেয়ে শরৎ সাহসে ভর করে আর একবার ডেকে বললে—কে পাশের ঘরে? সামনে এসো না দেখি?

ওর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন পাশের কুঠরির ওদিকের কবাটবিহীন দোর দিয়ে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল—বাইরের চাতালে তার পায়ের শব্দ বেশ স্পষ্ট শোনা গেল।

শরৎ মন্দিরের মেজেতে মাটির পিলসুজে বাসানো প্রদীপটা জ্বালাতে জ্বালাতে আপন মনে বকতে লাগলো—দোগেছের শ্মশান তোমাদের ভুলে রয়েচে? মুখপোড়া বাঁদরের দল···বাড়ীতে মা-বোন নেই?

ওর আগের ভয়টা একবার সম্পূর্ণ কেটেচে। ব্যাপারটা অপ্রাকৃতের শ্রেণী থেকে সম্পূর্ণ বাস্তবের গণ্ডির মধ্যে এসে পৌচেচে। দু-পাঁচ মাস অন্তর, কখনো বা উপরি উপরি দু-তিন মাস ধরে—এক একদিন এ রকম কাণ্ড উত্তর-দেউলে সন্ধ্যাবেলা আলো দিতে এসে ঘটেই থাকে। গ্রামের বদমাইস কোনো ছেলে-ছোকরার কাণ্ড। এমন কি, কার কাণ্ড শরৎ খানিকটা মনে মনে সন্দেহও করতে পারে—তবে সেটা অবিশ্যি সন্দেহ মাত্রই।

শরৎ এ সবে ভয় খায় না, ভয় খেতে গেলে তার চলেও না। দরিদ্রের ঘরে সুন্দরী হয়ে যখন জন্মেচে, তখন এ রকম অনেক উপদ্রব সহ্য করতে হবে সে জানে। বাবার তো সে সব জ্ঞান নেই, সেই যে বেরিয়েচেন কখন তিনি ফিরবেন তার ঠিকানা আছে? একাই এই নিবান্ধা পুরীর মধ্যে যখন থাকা তখন ভয় করে কি হবে? আসুক না কার কত সাহস, বঁটি নেই ঘরে? বঁটি দিয়ে নাক যদি কেটে দুখানা না করে দিই

তবে আমি গড়শিবপুরের রাজবংশের মেয়ে নই! পাজি, বদমাইস সব কোথাকার।

প্রদীপ দেখিয়ে যখন সে মন্দিরের বাইরে এসে দাঁড়ালো—তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ভাল করে নেমেচে। ওই দীঘির পাড়ের ছাতিম-বনটা বড্ড অন্ধকার হয়ে পড়ে এ সময়—ওখানটাতে ভয় যে না করে এমন নয়। শরৎ যে-প্রদীপটা হাতে করে এসেছিল, সেই প্রদীপটা প্রাণপণে আঁচল দিয়ে বাঁচিয়ে বাদুড়নখীর কাঁটাজঙ্গলের পথ বেয়ে চলে গেল—শুকনো ফলের খোলো নাড়া পেয়ে ঝম্‌ঝম্ করচে—দু-একবার ওর কাপড় পেছন থেকে টেনেও ধরলে বাদুরনখী ফলের বাঁকা ঠোঁট—দু-একবার ও ছাড়িয়েও নিলে।

বাড়ী পৌঁছে যদি রাজলক্ষ্মীকে দেখতে পেতো, খুব খুসি হোত সে, কিন্তু সে পোড়ার মুখী আসে নি। শরৎ রান্নাঘরে ঢুকে উনুন জ্বেলে রান্না চড়িয়ে দিলে।

গোপেশ্বর চাটুয্যে ছিল এতদিন, শরতের বেশ লাগতো। বাপের বয়সী বৃদ্ধকে সেবা করে আনন্দ পেত সে—কেদার সে রকম নন, তিনি সেবা তেমন কখনও চান না। তা ছাড়া, এই নির্জ্জন পুরীতে দু-একজন মানুষের মুখ যদি দেখা যায়, সে ভালই।

শরৎ সেবা করতে ভালবাসে, পছন্দ করে। জীবনে যেটা সে চেয়েছিল, তাই তার হোল না। স্বামীর কথা তার ভাল মনে হয় না, সে দিক থেকে তার মন শূন্য—সে মন্দিরের সোপান-বেদীতে কোনো দেবতা নেই—তাদের পাড়ের উত্তর-দেউলের মতই।

সে জন্যে শরৎ স্বাধীন আছে এখনও—সম্পূর্ণ স্বাধীন। মনের দিগন্তে এতটুকু মেঘ নেই কোনোদিকে।

বেশী রাত এখনও হয়নি, শরৎ ডাল সবে নামিয়েছে—এমন সময় কেদার বাড়ী এলেন।

শরৎ হাসিমুখে বললে, এত সকালে যে বাড়ী ফিরলে? আবার যাবে বুঝি?

কেদার শান্তভাবে বললেন, না আর যাবো না—তবে—

—না বাবা আজ আর যেও না—

কেদার একটু অবাক হয়ে মেয়ের মুখের দিকে চাইলেন। ওর গলার সুরের মধ্যে বোধ হয় কি পেলেন।

—কেন বল তো মা?

—এমনি বলচি—থাকো না বাড়ীতে। সকাল সকাল খেয়ে নাও—রান্না হয়ে গেল, একটু চা করে দেবে নাকি?

কেদার চা খেতে তেমন অভ্যস্ত নন, মেয়েও এত আদর করে তাঁকে চা খেতে বলে না কোনোদিন। ইতস্ততঃ করে বললেন, তা করো না হয় —খাওয়া যাক। তুইও খা একটু—

আজ একটা গল্প করো না বসে আমার কাছে? কল্পবে? ভাল কথা, সন্ধে-আহ্নিকটা সেরে নাও দিকি? জায়গা করে দিই।

মেয়ে মুস্কিলে ফেললে দেখা যাচ্চে। কেদার একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন। তিনি আসলে এসেছিলেন খানিকটা রজন সংগ্রহ করতে বেহালার ছড়ে দেবার জন্যে। ছিবাস মুদীর আড্ডায় রজন ছিল, ফুরিয়ে গিয়েচে কিংবা হারিয়ে গিয়েচে। এত রাত্রে এ গ্রামের আর কোথাও ও জিনিস পাওয়া গেলে কেদার কখনই বিপদের মুখে পা দিতেন না। করাই-বা যায় কি? অগত্যা কেদার সন্ধ্যা-আহ্নিকে বসলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সাঙ্গও করে ফেললেন। তার পর তিনি ভাবচেন এখন কি ভাবে বাহিরে যাওয়া যায়। শরৎ আবার আবদারের সুরে বললে—বাবা, বল একটা গল্প—আজ তোমাকে যেতে দেব না—

কেদারের বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। আজ শরৎ যেন

ছেলেমানুষের মত হ'য়েছে। কতদিন শরতের গলায় এমন আবদারের সুর তিনি শোনেন নি। এমনি অন্ধকার রাত্রে তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীমণি বাপের বাড়ী থেকে ফিরে এসেছিল গরুর গাড়ী করে। শরৎ তখন ছ-মাসের শিশু। কেদার চিরদিনই এক রকম বাইরে বাইরে ফেরেন—বাড়ীতে কেদারের আপন বৃদ্ধা জ্যাঠাইমা ছিলেন—তিনি কানে অত্যন্ত কম শুনতেন। লক্ষ্মীমণি ও তার বাপের বাড়ীর গাড়োয়ান অনেক ডাকাডাকি করেও বৃদ্ধার ঘুম ভাঙাতে পারে নি। অগত্যা তারা ঘরের দাওয়াতেই বসে ছিল কেদারের আগমনের অপেক্ষায়।

রাত এগারটার সময় কেদার গানবাজনার আড্ডা থেকে বাড়ী ফিরে দেখেন এই কাণ্ড। কেদারের মনে আছে, লক্ষ্মীমণি অন্ধকারের মধ্যে তাঁর কোলে ছ-মাসের মেয়েকে তুলে দিয়েই কৌতুকে আমোদে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠেছিল।

—কেমন বড্ড যে মেয়েকে ঘেন্না করতে!···মেয়ে যেন হয় না, হ'লে গড়ের পুকুরে ডুবিয়ে মারব!···ইস্‌, মার না দেখি ডুবিয়ে?

সেই নবযৌবনা রূপবতী স্ত্রীর মুখের হাসি আজও মাঝে মাঝে যেন কানে বাজে···তখন পৃথিবী ছিল তরুণ, তিনি ছিলেন তরুণ, লক্ষ্মীমণি ছিল তরুণী। আর এক জন এসেছিল তার পর···কিন্তু থাক, তার কথা কেদার এখন ভাববেন না।

সেই মেয়ে শরৎ—সেই ছোট্ট শিশু! কি সুখে তাকে রেখেছেন কেদার?

শরৎ চা করে এনে দিলে।

—শুধু চা খেও না, দাঁড়াও কি আছে দেখি।

—দুটো বড়ি ভেজে কেন দেও না, সে বেশ লাগে আমার—

শরৎ একটু আচারনিষ্ঠা মেয়ে, ভাতের শকড়ি কড়াতে সে বড়ি

ভেজে এখন চায়ের সঙ্গে দিতে রাজী নয় বাবাকে। বাবা নিতান্ত নাস্তিক, তাঁর না আছে ধর্ম্ম—না আছে কর্ম্ম—বাবার ওসব ম্লেচ্ছাচার শরৎ পছন্দ করে না আদৌ।

—বড়ি আবার এখন কি খাবে, হেঁসেলের জিনিস—দুটি মুড়ি মেখে দিই তার চেয়ে।

কেদার অগত্যা মুড়ির বাটি নিয়ে বসলেন।

না, আজ আর অড্ডায় যাওয়া গেল না। শরৎ তাঁর মনকে বড় অন্যমনস্ক করে দিয়েচে। ভান রজন্ নিতে এসেছিলেন তিনি।

—আচ্ছা বাবা, উত্তর-দেউলের কথা যে লোকে বলে—তুমি কিছু জান?

—বলে, শুনে আসচি এই পর্য্যন্ত, নিজে কিছু দেখিও নি, কিছু শুনিও নি। তবে বাবার মুখেও শুনেচি, ঠাকুরদাদাও বলতেন—আমাদের বংশেও প্রবাদ চলে আসচে চিরদিন থেকে—

—বল না বাবা, কি কথা—

—তুমি তো জান, সবই তো শুনে আসচো আজন্ম। থাক ও কথা এখন এই রাত্তির বেলা। কেন বলতো মা, উত্তর-দেউলের কথা উঠল কেন মনে হঠাৎ?

—কিছু না, এমনি বলচি—

—আজ পিদিম দিয়ে এসেচ তো?

—ওমা, তা আর দেব না! কবে না দিই। এমনি মনে হোল তাই বলচি—

আজকার সন্ধ্যার ব্যাপারটা বাবার কাছে বলা উচিত কি না শরৎ অনেকবার ভেবেচে। শেষ পর্য্যন্ত সে ঠিক করে ফেলেচে বাবাকে কিছু বলবে না। বাবা ঐ এক ধরণের লোক, বালকের মত আমোদপ্রিয়, সরল লোক—সংসারের কোন কিছু গায়ে মাখেন না—মাথা অভ্যেসও

নেই। তিনি শুনবেন, শুনে ভয় পাবেন, উদ্বিগ্ন হবেন—কিন্তু কোনও প্রতিকার করতে পারবেন না। দুদিন পরে আবার সব ভুলে যাবেন। তাঁকে বলে কোনও লাভ নেই।

তা ছাড়া একথা প্রকাশ হোলেও এ-সব পাড়াগাঁয়ে অনেক ক্ষতি আছে। কে কি ভাবে নেবে তার ঠিক কি? এ থেকে কত কথা হয় তো ওঠাবে লোকে। বাবা পেটে কথা রাখতে পারেন না, এখুনি গিয়ে ছিবাস কাকার দোকানে গল্প করবেন এখন। দরকার কি সে-সব গোলমালে?

কেদার অবশেষে একটা গল্প বললেন—মেয়ের আবদার রাখবার জন্যেই। এ গল্প এদেশে অনেকে জানে। তাঁর নিজের বংশের ইতিহাসের হয়তো—কেদার কিছু খোঁজ রাখেন না। কোন পাঁজি-পুঁথিতে কিছু লেখা নেই।

গড়ের বড় দীঘিটার নাম কালো পায়রার দীঘি। এ বাদে আরও দুটো দীঘি আছে ছাতিমবনের ওপারে—একটার নাম রাণীদীঘি—একটার নাম চালধোয়া পুকুর। ও দুটো পুকুরেই অনেক পদ্মবন আছে—কালো পায়রার দীঘি অর্থাৎ যেটাতে কেদার প্রায়ই গণেশ মুচির সঙ্গে মাছ ধরে থাকেন—সেটাতে কোন ফুল নেই পাটা-শেওলার দাম ছাড়া।

বহুকাল আগে—কতকাল আগে কেদারের কোন ধারণাই নেই—তাঁর কোন পূর্ব্বপুরুষের সঙ্গে মুসলমান ফৌজদারের দ্বন্দ্ব বাধে। চাকদহের নিকট যশড়া ও হাট জগদলের যে যুদ্ধের প্রবাদ আজও ছড়ার আকারে এই সব গ্রাম্য অকাল-প্রচলিত, কেদার শুনেচেন যে ছড়ার মধ্যে উল্লিখিত রাজা দেব রায় ও ভূমিপাল রায় তাঁরই বংশের পূর্ব্বপুরুষ।

হাট জগদলে পানি প্যালাম না
তীর খেয়ে ভিরমি নেগেচে—
দেবরায়ের সেপাই যে ভাই যমদূতের চ্যালা
ভুঁইপালের তীরন্দাজে দেয় বড় ঠ্যালা
(ও ভাই) হাট জগদলে পানি প্যালাম না
তীর খেয়ে ভিরমি নেগেচে—

বিপদে পড়ে রাজা দেব রায় গৌড়ে যান দরবার করতে, বাড়ীতে বলে গিয়েছিলেন যদি মঙ্গলের সংবাদ থাকে তবে সঙ্গের শ্বেত পারাবত উড়িয়ে দেবেন, কিন্তু যদি অশুভ কিছু ঘটে, তবে কৃষ্ণ পারাবত উড়ে আসবে। সংবাদ শুভ হোলেও কার ভুলক্রমে কৃষ্ণ পারাবত উড়িয়ে দেওয়া হয়। মহারাণী অন্তঃপুরিকাদের নিয়ে গড়ের মধ্যে বড় দীঘির জলে আত্মবিসর্জ্জন করে বংশের সম্মান রক্ষা করেন।

রাজা জয়ী হয়ে ফিরে এসে যখন দেখলেন তাঁর অসতর্কতার পরিণাম—তিনি আর রাজকার্য্য পরিচালনা করেন নি, ভাইয়ের হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে তিনি নাকি উত্তর-দেউলে বারাহী দেবীর বেদীমূলে বসে প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করেন।

এ অঞ্চলে প্রবাদ, উত্তর-দেউলে এক বিশালকান্তি পুরুষকে. কখনো কখনো নাকি দেখা গিয়েছে—হাতে তাঁর বেত্রদণ্ড, মুখে তর্জ্জনী স্থাপন করে তিনি চিত্রার্পিতের মত উত্তর-দেউলের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু এসব শোনা কথা মাত্র। কেউ এমন কথা বলতে পারে না যে, সে নিজের চোখে কিছু দেখেছে।

অথচ গ্রাম্য লোকে ভয় পায়, সন্ধ্যার পর উত্তর-দেউলের ওদিকে কেউ বড় একটা যাতায়াত করে না।

কেদারও কিছু জানেন না, অপর পাঁচ জনে যা জানে, তিনি তার

বেশি কিছু জানেন না, জানবার কোন চেষ্টাও করেন নি। আর কেই বা বলবে?

শরৎ বললে, বাবা, এসব কত দিনের কথা?

—তা কি করে বলবো রে পাগলী? আমি কি দেখেছি?

—রাণীর নাম কি ছিল বাবা?

—কি করে বলবো মা?...ইয়ে তা হ'লে আমি এখন—

—আচ্ছা বাবা, তিনি আমার সম্পর্কে কেউ নিশ্চয় হোতেন—আমাদেরই বংশের তো—

কেদার একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন—এখনও যদি ছিবাস মুদীর দোকানে গিয়ে পৌঁছতে পারেন—রাত বেশি হয় নি এখনও।

তিনি অধীর ভাবে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হবেন বৈকি—তোমার ঠাকুরমা-টাকুরমা হোতেন আর কি—

শরৎ হেসে বললে, ঠাকুরমা কি বাবা, সে হোল কোন্ যুগের কথা—তোমার মা-ই তো আমার ঠাকুরমা হোতেন।

কেদারের মন এখন অত কুলজী নির্ণয়ের দিকে নেই। তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—আচ্ছা, তুমি ততক্ষণ রান্নাটা নামিয়ে রাখো—আমি আসচি চট্ করে—

এত রাত্তিরে তোমার বাবা, আর যেতে হবে না। না, থাকো আজ—

—কেন তোর ভয় করচে না কি মা?

—হ্যাঁ তাই। থাকো আজকে—

কেদার একটু আশ্চর্য্য হোলেন, শরৎ কোনোদিন এমন করে বাধা দেয় না। গল্প-টল্প শুনে ভয় পেয়েছে ছেলে মানুষ। থাক, আজ আর তিনি যাবেন না। রঞ্জন্ আনতে বাড়ী এসে যে ভুল তিনি করে ফেলেছেন, তার আর চারা নেই।

শরৎ বললে, বাবা, সেই কলসীটার কথা মনে আছে ?

—হ্যাঁ, খুব আছে। কলসীটা কোথায় রে ?

—রাজলক্ষ্মীদের বাড়ীতে চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল দেখবার জন্যে। সেখানেই আছে।

—নিয়ে এসে রেখে দিও, নিজের জিনিস বাড়ীতে রাখাই ভালো।

আজ বছর ছ'সাত আগে একটা মাটীর কলসী গড়ের খাতের মধ্যে এক জায়গায় পাওয়া যায়—কলসীটার ওপরে নানা রকম ছক্ কাটা, নক্সা আঁকা—কেদারই কলসীটা প্রথমে দেখতে পান, টাকাকড়ি পোঁতা আছে হয় তো পূর্ব্বপুরুষের প্রথমটা ভেবেছিলেন। কিন্তু শেষে কলসীটা খুঁড়ে বের করে আধ খুঁচিটাক কড়ি পান তার মধ্যে।

গ্রামের হীরু ও সাধন কুমোর দেখে বলেছিল—এ পোড়ের কলসী আজকাল আর হয় না, এমন ধরণের আঁকাজোঁকা কলসীর গায়ে। এ সব বাবাঠাকুর, অনেক কাল আগের জিনিস। এ পোড়ই আলাদা —খুব ওস্তাদ কুমোর না হোলে এমন পোড় হবে না বাবাঠাকুর।

গড়ের খালের খুব নীচের দিকে, যেখানে জল প্রায় মজে এসেছে, সেখানে এক দিন মাছ ধরতে বসে কেদার কলসীটা দেখতে পেয়েছিলেন। ওঃ, টাকার কলসী পেয়ে গিয়েচেন বলে কি খুসি কেদারের! শরতের মা লক্ষীমণি তখনও বেঁচে।

লক্ষ্মী ছুটে এল—কি গা কলসীটাতে ?

এর আগে কেদার বলে গিয়েছিলেন যে একটা কলসীর কানা বেরিয়েচে গড়ের খালের পাড়ে। অনেক নীচের দিকে পাড়ের।

কেদার হাসতে হাসতে বললেন, এক হাঁড়ি মোহর—নেবে এসো—

লক্ষ্মীর বয়েস তখন পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের কম নয়, কিন্তু দেখাতো পঁচিশ বছরের যুবতীর মত। গায়ের রংয়ের জলুস এই দু-বছর আগে মরণের দিনটি পর্য্যন্ত ছিল অম্লান। এই মেয়ে হয়েচে ওর মায়ের মত অবিকল—

কিন্তু লক্ষ্মীর মত অত জলুস নেই গায়ের রংয়ের—তার কারণ কেদার নিজে তত ফর্সা নন—শ্যামবর্ণ।

লক্ষ্মী এসে হাসিমুখে কড়িগুলো নিয়ে গেল। বললে, জানো না লক্ষ্মীর কড়ি, পয়মন্ত কড়ি—আমাদের বংশের কেউ হয় তো পুঁতে রেখে থাকবে কতকাল আগে—যত্ন করে তুলে রেখে দিই—

কেদার জিগ্যেস করলেন মেয়েকে—ভালো কথা, কলসীর সেই কড়িগুলো কোথায় আছে ?

লক্ষ্মীর হাঁড়ির মধ্যে মা-ই তো রেখে গিয়েছিল, সেখানেই আছে।

কেদারের মনটা আজ হঠাৎ কেমন আর্দ্র হয়ে উঠেছে, আশ্চর্য্যের ব্যাপার বটে! তিনি একটু ব্যস্ত হয়ে বললেন, দেখে এসো না মা, আছে তো ঠিক—যাও না—

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে শরৎ মুখের হাসি গোপন করলে, আহা, হাসিও পায়, দুঃখও হয় বাবার জন্যে। মা মারা যাবার পরে বাবা মায়ের কোন জিনিস ফেলতে পারেন না, মায়ের ভাঙা চিরুণীখানা পর্য্যন্ত। তবে সব সময় তো খেয়াল থাকে না, ভোলা মহেশ্বরের মত বাইরে বাইরে ঘোরেন কিন্তু মাঝে মাঝে হয়তো মনে পড়ে যায়। শরতের বয়েস হোল পঁচিশ-ছাব্বিশ—সে সব বোঝে।

বাবাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যেই বিশেষ করে শরৎ উঠে গেল লক্ষ্মীর হাঁড়ি দেখতে—সে ভালরকমই জানে কড়িগুলো আছে ওর মধ্যে। কিন্তু বাবার ছেলেমানুষের মত স্বভাব, যখন যা ধরবেন তাই।

সে দেখে ফিরে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে কেদার জিগ্যেস করলেন, রয়েচে দেখলি ?

শরৎ আশ্বাস দেওয়ার সুরে বললে, হাঁ বাবা, রয়েচে।

—আর সেই কলসীটা কালই নিয়ে আয় ওদের বাড়ী থেকে। সেখানে এত দিন ফেলে রাখে ? তোর জিনিসপত্রের যত্ন নেই।

—তুমি ভেবো না বাবা, কালই আনবো।

আজ বাবার হঠাৎ খেয়াল চেপেছে তাই, নইলে আজ পাঁচ ছ'বছরের মধ্যে কোনো দিন কলসীটার কথা বাবা তো এক দিনও বলেন নি। আজও তো সে-ই আগে তুলেছিল ওকথা, তাই এখন বাবার বড্ড দরদ কলসীর ওপর, কড়ির ওপর। কেদার নিশ্চিন্ত হয়ে এক ছিলিম তামাক ধরালেন। কলসীর কথা ওঠাতে তাঁর মনে পড়লো বনে জঙ্গলে ঘোরেন তিনি এই বিশাল গড়ের হাতার মধ্যে, খালের এপারে বা ওপারে জলের মধ্যে আরও দু-একটা জিনিস দেখেছেন, যার অর্থ তিনি করতে পারেন নি।

যেমন একবার, আজ দশ-পনেরো বছর আগে, কেদার গড়ের বাইরে যে বড় মজা দীঘির নাম চালধোয়া পুকুর, তার ধারে কি করতে গিয়ে একটা বাঁধাঘাটের চিহ্ন দেখতে পান। কত কাল আগের বাঁধা ঘাট কে বলবে? কয়েকটা মাত্র ধাপ তার অবশিষ্ট আছে—বাকীটা হয়তো মাটির মধ্যে পোঁতা।

একবার তিনি কিছু পুরোনো ইট বিক্রি করেন গড়ের খালের এপারে একটা বড় পাঁচীলের ইট বহু কাল থেকে স্তূপাকার হয়ে পড়ে ছিল—তার ওপরে গজিয়ে ছিল বনগাছের জঙ্গল। ইটের ঢিবি খুঁড়তে খুঁড়তে যখন সব ইটের স্তূপ শেষ হয়ে গেল—তখন সমতল মাটীর আরও হাত তিনেক নীচে আর কতকগুলো ইটের সন্ধান পাওয়া গেল। সে জায়গাটা খুঁড়ে দেখা গেল মাটীর নীচে একটা মন্দিরের খানিকটা অংশ যেন চাপা পড়ে আছে।

তখন সে ইটগুলোও খুঁড়ে তোলবার জন্যে বন্দোবস্ত করা হোল। আরও হাত দুই খুঁড়ে খুব বড় একটা পাথরের মাথা বেরিয়ে পড়লো। আর খোঁড়া হয় নি—এখন সে সব আবার বনে ঢেকে গিয়েছে। কেদারের মনে হয়েছিল, ওখানে একটা মন্দির ছিল বহু কাল আগে—

তা কতকাল আগে তা অবিশ্যি তিনি আন্দাজ করতে পারেন নি। অনেকগুলো নক্সাকাটা ইট বেরিয়ে ছিল ওখান থেকে। কিসের মন্দির তাও কেউ জানে না।

এই বাড়ীর চারিপাশে তাঁদের পূর্ব্বপুরুষদের কত দীঘি, দেউল, ঘরবাড়ী ভেঙেচুরে আত্মগোপন করে আছে আজ কতকাল কত যুগ ধরে, দুর্ভেদ্য বেতবনের আড়ালে, জগডুম্বুর গাছের আঁকাবাঁকা শেকড়ের নীচে, দুশো বছরের সঞ্চিত চামচিকের নাদির মধ্যে থেকে বিরাট শিবলিঙ্গ কোথাও মাথাটি মাত্র জাগিয়ে আছেন—হস্তপদভগ্ন বারাহী দেবীর পাষাণ মূর্ত্তি ছাতিমবনের নিবিড় ছায়ায় অনাদৃত অবস্থায় পড়ে আছে কতকাল।

শরৎ এসব জানে। নিজের চোখেও দেখে আসচে আবাল্য, রাজলক্ষ্মীর ঠাকুরদাদা বৃদ্ধ শ্রীনাথ চাটুয্যের মুখে সে অনেক কথা শুনেচে, যা তার বাবাও কোনোদিন বলেন নি। শ্রীনাথ চাটুয্যে অনেক খবর রাখতেন।

—ভাত দিই বাবা, রাত হয়ে গিয়েচে অনেক—

—কেমন গল্প শুনলি, হোল তো?

—উত্তর-দেউলের কথা ভুলে গিয়েচ দিব্যি।

—ভুলবো কেন, ওই যে বল্লাম—

—দেবীমূর্ত্তির কথা বললে না যে—

—সেও তো শোনা কথা। কালাপাহাড় না কি—দেবীর মূর্ত্তি ভেঙে চুরে মন্দির থেকে ফেলে দেয় টান মেরে—।

—ভাদ্র মাসের আমাবস্যেতে দেবীমূর্ত্তি নাকি—

—কে দেখতে গিয়েছে মা? চোখে কেউ দেখেছে? ওসব গুজব। পাষাণের অতবড় মূর্ত্তিটা অমনি জাগ্রত হয়ে ঠেলে উঠে চলতে সুরু করে—হ্যাঃ—

শরৎ সাহসিকা মেয়ে, তবুও বাবার কথায় যে ছবি তাঁর মনে জাগলো—তাতে সে শিউরে উঠলো, কারণ সে শুনে এসেচে সে সময় যে সঞ্চরণশীল জাগ্রত পাষাণ মূর্ত্তির সামনে পড়ে, তার সেদিন বড়ই দুর্দ্দিন।

না, ওসব কথায় তার ভয় হয়: তাড়াতাড়ি সে বাবাকে বললে, *থাক, থাক, বাবা, ওসব কথার আর দরকার নেই। তোমার কি, রাতদুপুর পর্য্যন্ত ফেলে রেখে যাবে, মর্ত্তে আমিই মরি আর কি।*

মশা বিন্‌বিন্ করছে জঙ্গলের মধ্যে। খালি গায়ে ঘরের মধ্যে বসা কষ্ট। কলাবাদুড় ঝুলছে তালকাঠের আড়া থেকে। বাইরের বাতাসে কি বনফুলের সুগন্ধ।

কেদার আহারে বসে অভ্যাসমত এ তরকারী ও তরকারীর দোষ খুঁত বার করতে করতে খেতে লাগলেন। কাঁচকলা রান্না বড় শক্ত কথা, বেগুনের তরকারীতে অত ঝাল দেওয়া সে কোথা থেকে শিখেছে ইত্যাদি। খেয়ে উঠে তামাক সাজতে গিয়ে কেদার দেখলেন তামাক একদম ফুরিয়ে গিয়েচে। মেয়ে আজকাল অত্যন্ত অমনোযোগী, কাজেকর্ম্মে আর আগের মত মন নেই—যদি থাকতো তবে তামাক ফুরিয়ে যাওয়ার একদিন আগে লক্ষ্য করে নি কেন? এখন তিনি তামাক কোথায় পান এত রাত্রে?

শরৎ বললে, বাবা, আচ্ছা তোমার তামাক খেতে পেলেই তো হোল? কল্কেটা দাও—

—কোথায় পাবি তামাক?

—তোমার সে খোঁজে দরকার কি? দেখি কল্কেটা—

অসময়ের জন্যে সে প্রতিদিনের তামাক থেকে একটু একটু নিয়ে একটা ঘুলঘুলির মধ্যে লুকিয়ে রাখে। বাবার কাণ্ড তার জানতে বাকি নেই, এই রকম রাত দুপুরে তামাক ফুরিয়ে যাবে হঠাৎ। বকুনি খেতে

হবে সে সময় তাকেই। বকুনির চেয়েও তার দুঃখ হয় যখন বাবার কোনো জিনিসের অভাব ঘটে—কোনো কিছুর জন্যে তিনি কষ্ট পান

শরৎ তামাক সেজে এনে দিলে। কেদার তামাক পেয়েই সন্তুষ্ট মেয়েকে আর বিশেষ জেরা করলেন না এ নিয়ে। রাত অনেক হয়েচে —আর এখন শয্যা আশ্রয় করলেই তিনি বাঁচেন। শরৎ সারাদিন খাটে, রাত্রে বিছানায় একবার শুয়ে পড়লে তার জ্ঞান থাকে না। আর এক ছিলিম তামাক চেয়ে রাখলে হোত ওর কাছ থেকে, কিন্তু কেদার ভরসা পেলেন না।

গভীর রাত্রে ঘুমের ঘোরে শরতের মনে হয়, আর সে ভাঙাচোরা গড় নেই, কি সুন্দর রাজবাড়ী, পদ্মদীঘিতে শ্বেত পদ্ম ফুটে জল আলো করেচে—দেউড়িতে দেউড়িতে পাহারা পড়চে, ছাদে লাল সাদা নিশেন উড়চে—গড়ের এপারে ওপারে কত বাড়ী, কত অতিথিশালা, কত হাতী-ঘোড়ার আস্তাবল···উত্তর-দেউলে প্রকাণ্ড বারাহী মূর্ত্তির পুজো হচ্ছে ধূপ ধুনো গুগ্‌গুলের সুবাসে চারিদিক আমোদ করচে, কাড়া-নাকাড়ার বাদ্যিতে কান পাতা যায় না।

যেন এক রাণী এসে তার শিয়রে দাঁড়িয়েছেন, ওঁর সুন্দর মুখে প্রসন্ন হাসি, কপালে চওড়া করে সিঁদুর পরা, রূপের দীপ্তিতে ঘর আলো হয়ে উঠেচে···তিনি সস্নেহ স্বরে যেন বলচেন—খুকী, আমার বংশের মেয়ে তুই, বংশের মান বাঁচাবার জন্যে আমি দীঘির জলে ডুবে মরেছিলাম, তুইও বংশের মর্যাদা বজায় রাখিস, পবিত্র, রাখিস নিজেকে। ঘুমের মধ্যেও শরতের সর্ব্বাঙ্গ যেন শিউরে ওঠে।

কেদার পাশের গ্রাম থেকে খাজনা আদায় করে ফিরছেন, এমন

র ছিবাস মুদী রাস্তায় তাঁকে ডাকলে—চলুন আমার দোকানে—
াঠাকুর, একটু তামাক খেয়ে যাবেন—

রাস্তার ধুলোতে কিসের দাগ দেখে কেদার বললেন, এ কিসের
া হে ছিবাস ?

—এ মটোর গাড়ীর চাকার দাগ—প্রভাস বাড়ী এসেচে যে
ারে চড়ে—

—বেশ, বেশ। গাড়ী তো দেখতে হয় ছিবাস—

—কখনো দেখেন নি বুঝি দাদাঠাকুর? আমি সেবার যোগে
াচানে গিয়ে নবদ্বীপে দেখে এসেছি—

—দূর, মটোর গাড়ী দেখবো না কেন, সেদিনও তো কেষ্টনগরে
া খাজনা দাখিল করতে গিয়ে চার-পাঁচখানা দেখে এলাম।
লোকেরা কেনে, কেষ্টনগরে বড়লোকের অভাব আছে নাকি? তবে
াদের গাঁয়ে মটোর গাড়ী নতুন কথা কি না—

—তা হবে না কেন দাদা ঠাকুর। আজকাল প্রভাসের বাবার
স্থা কি! কলকাতায় দুখানা বাড়ী, কারবার চলচে তোড়ে—
রম টাকা আসচে। বলে লক্ষ্মী যখন যারে স্থান, ছাপ্পর কুঁড়ে টাকা
স— ওদেরই তো এখন দিন—এ কি আর আপনি আমি ?

—তা ভালোই তো। গাঁয়ে সবাই গরীব, দু-একজন যদি বড় হয়,
তঃ গাঁয়ে রাস্তাঘাটগুলো তো ভাল হবে। দুদিন মটোরে করে
াই তখন রাস্তার দিকে নজর পড়বে—

—হাঁ। দুদিন মটোরে এসেই তোমার গাঁয়ের রাস্তা অমনি পাথর
য় বাঁধিয়ে গ্যাংট্যাং রোড করে ফেলচে। তুমিও যেন পাগল
াঠাকুর! ছাড়ান দ্যাও ও সব কথা।

প্রভাস যে মোটরখানা এনেছে, সাতকড়ি চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপের

সামনে সেখানা কাঁঠালতলার ছায়ায় দাঁড় করানো। চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে আট-দশ জন লোকের ভিড়।

কেদার সামনের রাস্তায় কালো চক্‌চকে গাড়ীখানার পাশে দাঁড়িয়ে ভাল করে জিনিসটা দেখতে লাগলেন। কেমন একটা গরম গন্ধ... কিসের গন্ধ কেদার ঠিক বুঝতে পারেন না। ঝক্‌ঝক করচে পেতলের না কিসের ডাণ্ডা, হাণ্ডল—আরও কি সব যন্ত্রপাতি।

বেশ জিনিস।

এত কাছে দাঁড়িয়ে কেদার কখনও মোটর গাড়ী দেখেন নি। রাস্তায় যেতে যেতে গাড়ীখানার ওধারে আরও দু-একজন পথচলতি চাষাভূষো লোক দাঁড়িয়ে গেল গাড়ী দেখতে।

কেদার তাদের দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললেন, কালে কালে কত কাণ্ডই দেখা গেল—হঁ্যা—কি বল মোড়লের পো? তাই না কি বল ঠিক করে? দশ বছর আগে দেখেছিলে কেউ?

একজন চাষীলোক ষ্টীয়ারিংয়ের চাকা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, এখানডাতে চাকা একটা আবার কেন হাদে ও দা'ঠাকুর?

কেদার বিজ্ঞ ভাবে বললেন, ও হ'ল হাণ্ডলের চাকা। ওটা ঘোরায়।

লোকটির নিকট সব ব্যাপারটা এক মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল। সে হাসিমুখে বললে, দেখুন দিখি দা'ঠাকুর, বললেন আপনি, তবে আমি বোঝলাম। না বলে দিলি কি আমরা বুঝতি পারি?

সে কি বুঝলে তা অবিশ্যি সে-ই জানে।

এই সময় কেদারকে দেখতে পেয়ে কে চণ্ডীমণ্ডপ থেকে ডেকে উঠল—ও কেদার রাজা, ওহে ও কেদার রাজা—শোন এদিকে, এস না একবার—

প্রভাসকে ঘিরে গ্রামের অনেকগুলি ভদ্রলোক বসে। জগন্নাথ চাটুয্যেও আছে ওদের মধ্যে, কেদারকে ডাক দিয়েচ সেই-ই।

চণ্ডীমণ্ডপের মালিক সাতকড়ি চৌধুরী বললেন, কেদার-দা যে! ।ারে এস, এস—বসতে দাও হে—কেদার-দা'কে বসাও—

জগন্নাথ বললে, আরে ভায়া কেদার রাজা, এসে পড়েচ ঠিক সময়ে—তামার কথাই হচ্ছিল।

কেদার বিস্ময়ের সুরে বললেন—আমার কথা!

তাঁর কথা কোথাও মজলিসে আলোচিত হবার মত গুণ তাঁর কি আছে? কেদার ভেবে পেলেন না। কখনও আলোচিত হয়ও নি।

জগন্নাথ বললে, তোমার কথা কেন, সকলেরই কথা। প্রভাস, চিনতে পেরেচ কেদার ভায়াকে? রাজবাড়ীর কেদার-রাজা। এ হোল প্রভাস—আমাদের গাঁয়ের রাসু বিশ্বাসের নাতি—

কেদার বললেন, হঁ্যা, হঁ্যা, আমি জানি। তবে সেই ছেলেবেলায় হয়ত দু-একবার দেখে থাকব, বাবাজি তো আস না গাঁয়ে বড় একটা—কাজেই এদানীং দেখিনি আর।

প্রভাসের বয়স ত্রিশ-বত্রিশ, মাথায় কোঁকড়া চুলে টেরি কাটা গায়ে সাদা আদ্দির পাঞ্জাবী, জরিপাড় কাঁচি ধুতি পরনে। সকলেই জানে প্রভাস চরিত্রহীন ও বয়াটে, কিন্তু বড়লোকের ছেলের কাছে স্বার্থ অনেকের অনেক রকম, মুখে কিছু বলতে সাহস করে না।

সাতকড়ি চৌধুরী বললেন—প্রভাসকে আমরা ধরেচি, আমাদের পুবপাড়ার ইস্কুলটার সম্বন্ধে ও কিছু বিবেচনা করুক। ওদের হাত ঝাড়লে পর্ব্বোত।

কেদার এক পাশে গিয়ে বসলেন। ব্যাপারটা কিছুক্ষণ পরে বুঝলেন, এ গ্রামের প্রাইমারী ইস্কুলের বাড়ীটা পাকা করে দেবার জন্যে সবাই প্রভাসকে ধরেচে, শ-চার পাঁচ টাকা ব্যয় করলে আপাততঃ বাড়ীটা এক রকম দাঁড়িয়ে যায়।

প্রভাস বলছিল—তা যখন আপনারা বলচেন, তখন দিয়ে দেব, তবে টাকা আপাততঃ এখন আনি নি, আপনারা যদি কেউ আমার সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে—

—আহা সে-জন্যে ভাবনা কি? তুমি যখন হয় পাঠিয়ে দিও। তুমি বললেই আমরা কাজ আরম্ভ করে দিই। তোমার ভরসা পেলে আমরা করতে পারি নে এমন কি কাজ আছে? কি বল হে জগন্নাথ-খুড়ো?

জগন্নাথ চাটুয্যে সাতকড়ির কথায় কোনও উত্তর না দিয়ে কেদারের দিকে চেয়ে বললেন, তোমার কথা কি হচ্ছিল বলি। ইস্কুলটার জন্যে তোমার গড়বাড়ীর পুরোনো ইট কিছু দিতে হবে।

কেদার দ্বিরুক্তি না করে বললেন—নিও।

—ঠিক তো?

—নিশ্চয়।

—তা হ'লে সব কথা মিটে গেল হে সাতু, কেদার রাজার ইট আর প্রভাসের টাকা, ও ইস্কুল বাড়ী তো পাকা হয়ে রয়েছে। এক ছিলিম তামাক খাও—ব'স কেদার রাজা।

প্রভাস উঠতে চাইলে—কিন্তু সাতকড়ি চৌধুরী বাধা দিলেন। চা হচ্ছে বাড়ীর মধ্যে তার জন্যে, না খেয়ে যাবার যো নেই।

কেদারের একটু চা খাবার ইচ্ছে ছিল না এমন নয়, সুতরাং তিনিও চেপে বসলেন। জগন্নাথ চাটুয্যে তাঁর সঙ্গে তার নিজের সংসারের ঝঞ্ঝাটের গল্প সুরু করলে। মেজ ছেলেটার জ্বর হচ্চে আজ এক মাস, রোজ বিকেলে জ্বর আসে, কত রকম কি করলেন, কিছুতেই জ্বর যাচ্চে না। ও-পাড়ার যতীশ চক্কত্তির সঙ্গে জমি নিয়ে বিবাদ চলেচে গোঁয়োহাটিতে। জগন্নাথ বলে জমি আমার, যতীশ বলে আমার। প্রজারা ফলে খাজনা বন্ধ করেছে, দু-পক্ষের কাউকেই খাজনা দেয় না।

কেদার বললেন, কেন, জমির পড়চা দেখলেই তো মিটে যায়—কার জমি লেখাই তো আছে—

—আরে তা কি আর দেখা হয় নি ভাবচ কেদার রাজা? পড়চা দৃষ্টে জমি সনাক্ত করতে হবে না?

—পড়চা দেখে যদি জমি সনাক্ত করতে না পারো, তা হ'লে আমীন ডেকে মীমাংসা করে নাও। সেটেলমেন্টের ম্যাপ আছে, তাই দেখে আগে মেপে নেবার চেষ্টা কর না কেন?

—তুমি একদিন এসো না ভায়া। তুমি ম্যাপ দেখে একটা মীমাংসা দাও না করে? জমিজমার কাজ তুমি তো খুব ভাল বোঝ।

—কেদার-দা সত্যিই ভাল জানে জমিজমা-সংক্রান্ত কাজ—কিন্তু মন এদিকে দিতে চায় না একেবারেই। নিজের অনেক জমি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বেহাতি হয়ে গেল, দেখেও দেখে না ঐ হয়েচে ওর দোষ।

একথা বললেন সাতকড়ি চৌধুরী। অনেক দিন আগে তাঁর নিজের জমিজমার দলিলসংক্রান্ত কি একটা জটিল ব্যাপারের ভাল মীমাংসা করে দেন কেদার, সেই থেকে কেদারের বৈষয়িক কাজকর্ম্মের প্রতি সাতকড়ি চৌধুরীর যথেষ্ট শ্রদ্ধা।

এই সময়ে চা এল। এখানে আর কেউ চা খায় না বলে বোধ হয় চা এসেচে শুধু প্রভাসের জন্যেই। শুধু চা নয়, খানকতক গরম পরোটা আর একটু আলু-চচ্চড়িও এসেচে! সকলেই নানা অনুযোগ অনুরোধ করে প্রভাসকে খাওয়াতে লাগলো। কেদার চা খাবেন কি না এ কথা কেউ জিগ্যেস করলে না, সুতরাং চা পানের ইচ্ছা আপাততঃ কেদারকে দমন করতে হোলো।

প্রভাস চা পান শেষ করে উঠে পড়লো। সকলে গিয়ে তাকে তার মোটরে উঠিয়ে দিলে।

সাতকড়ি বললেন, এখন যাবে কোথায় প্রভাস?

—এখন একবার রাণীনগর যাবো কাকা, হারাণ কাপালীর কাছে একখানা তিন শো টাকার হাণ্ডনোট আছে, তামাদির মুখে দাঁড়িয়েচে, দাদা বলে দিয়েচেন একবার গিয়ে তাগাদা দিতে।

ওবেলা একবার এসো। গড়ের ইট কেদার-দা দিতে চেয়েচেন, তোমায় দেখিয়ে আনবো। কি বলো জগন্নাথ খুড়ো? তুমি টাকা দেবে, ইটগুলো তুমি দেখে নাও। এই সব সরে যা গাড়ীর কাছ থেকে, তোদের এত ভিড় কেন?

প্রভাসের গাড়ীর চারি ধারে বহু ছেলেমেয়ে এসে জড় হয়েছিল। সকলকে সরিয়ে সাবধান করে দু-চারবার হর্ণ দিয়ে প্রভাস গাড়ী ছেড়ে দিলে।...

জগন্নাথ চাটুয্যে পথের বাঁকে দ্রুতবিলীয়মান গাড়ীখানার দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—সব টাকা রে বাপু টাকা। ওর ঠাকুর-দা এই গাঁয়ের পুবপাড়ায় কামারের দোকান করতো, হেঁই-ও হেঁই-ও করে হাতুড়ী পেটাতো, আমরা ছেলেবেলায় দেখেছি। সাতু বাবাজি, রাসু বিশ্বেসকে মনে আছে নিশ্চয়ই।

সাতকড়ি চৌধুরীর বয়েস আসলে চল্লিশের বেশী নয়। তার চেয়ে অন্ততঃ পঁচিশ বছর বেশি বয়েসের লোক জগনন্নাথ চাটুয্যে তাঁকে নিজের দলে টানবার চেষ্টা করছে দেখে তিনি ক্ষুণ্ণমুখে বললেন—আমার কি করে মনে থাকবে জগন্নাথ খুড়ো, আমি দেখিই নি—

কেদার বললেন, তোমার যে কাণ্ড জগন্নাথ-দাদা। ও দেখবে কোথা থেকে? আমারই ভাল মনে হয় না।

জগন্নাথ বললেন,—তা সে যাই হোক, মোটের ওপর পয়সা করেছে বটে। ব্যবসা না করলে কি আর বড় লোক হওয়া যায়? ওই রাসু কামারের ছেলে—আমরা রাসু কামার বলেই জানতাম ছেলেবেলায়—

তারপর সেই রাস্থর ছেলে হারাণ কলকাতায় গিয়ে ঘোড়ার গাড়ী সারানোর ছোট্ট দোকান খুললে বৌবাজারে। ক্রমে দোকানের উন্নতি হতে লাগলো—মাথা খুলে গেল, তখন পুরোনো গাড়ী কিনে তাই সারিয়ে বেচতে লাগলো। তারপর দেখো আজকাল ওদের অবস্থা। কলকাতায় চারখানা বাড়ী।

সাতকড়ি চৌধুরী বললেন, আজকাল প্রভাসই কর্ত্তা। ওই বলছিল ওর বাবা বাতে পঙ্গু, উঠে হেঁটে বেড়াতে পারে না। প্রভাসই দেখা-শুনো করে।

একজন কে বললে—তবে প্রভাস নাকি বাপের পয়সা বিস্তর উড়িয়েচে।

জগন্নাথ চাটুয্যে বললেন—তা ওড়াবে না কেন? হারাণ বিশ্বেস কম টাকা করে নি তো? ছেলে যদি না ওড়াবে তবে ওড়াবে কে বলো না? ঘোর বয়াটে আর মাতাল—

সাতকড়ি চারিদিকে চেয়ে বললেন, থাক, থাক, ওকথা থাক খুড়ো। সে সব কথায় দরকার কি তোমার আমার? যার ছাগল তার লেজের দিকে সে কাটুক না—বাদ দাও। ওরা হোল আজকাল বড়লোক, এদিগরে সাত-আটখানা গাঁয়ের মহাজন হোল ওরা। ওদেরই খাতির। টাকার দরকার হোলে হারাণ বিশ্বেসের কাছে—কলকাতার গিয়ে হ্যাণ্ডনোট্ লিখে কর্জ্জ না করলে যখন উপায় নেই, তখন তার ছেলে কি করে না করে সে সব কথার আলোচনা রাস্তায় দাঁড়িয়ে না করাই ভালো।

বেলা বেড়েচে। কেদার বাড়ীর দিকে রওনা হোলেন। পথে প্রভাসের গাড়ীর সঙ্গে আবার দেখা—বেজায় ধূলো উড়িয়ে আসছে, কেদার এক পাশে দাঁড়ালেন। ধূলোর পাহাড় সৃষ্টি করে হর্ণ বাজিয়ে মোটরখানা সবেগে পাশ কাটিয়ে চলে গেল, পেট্রল ও গ্যাসের গন্ধ

ছড়িয়ে। কেদার হুঁকোর মধ্যে চোখ মিট্‌মিট্‌ করতে করতে প্রশংসমান দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে রইলেন।

সকালে উঠেই সেদিন কেদার খাজনা আদায় করতে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন, এমন সময় জগন্নাথ চাটুয্যে এসে ডাকলে, ওহে কেদার রাজা বাড়ী আছ নাকি ভায়া?

কেদার বললেন, এসো জগন্নাথ দাদা, বসো। কি মনে করে?

—ওরা সব আসচে, ইট কোথা থেকে নেবে দেখিয়ে দেবে চলো।

কেদার বললে, ও আর দেখিয়ে দেওয়া কি, তুমি তো জানো—যেখান থেকে হোক—

জগন্নাথ জিভ কেটে বললে, তা কি হয় ভায়া? তোমার জিনিস না বলে দিলে কি আমরা নিতে পারি? চলো তুমি। প্রভাস নিজে আসবে এখুনি—আরও সব আসচে।

—ততক্ষণ বসবে এসো দাদা। ওরে শরৎ তোর জ্যাঠামশায়ের জন্যে বসবার কিছু দে।

শরৎ একখানা পিঁড়ি পেতে দিয়ে বললে, জ্যাঠামশায় তো এদিকে আসা ছেড়েই দিয়েছেন আজকাল। বসুন ভাল হয়ে। চা খাবেন?

জগন্নাথ চাটুয্যে এক গাল হেসে বললে, তা মা, দে না হয় করে।

নিজের বাড়ীতে জগন্নাথের চা খাওয়ার পাট নেই কোনো কালে, তবে পরের বাড়ীতে হ'লে কোনো কিছু খাওয়াতেই আপত্তি নেই জগন্নাথের।

কেদার বললেন, তারপর তোমাদের ইস্কুলের বাড়ী আরম্ভ হবে কবে ?

—জিনিসপত্র যোগাড় হ'লেই হবে। প্রভাস টাকা দিলেই আমরা কাজ আরম্ভ করে দিই। একটু তামাক সাজো ভালো করে ভায়া। চা-টা তোমার এখানেই খাওয়া যাক।

কিছুক্ষণ পরে শরৎ এসে দু-পেয়ালা চা সামনে রাখল। সে সকালেই স্নান সেরে নিয়েচে, পরনে সরু পাড় ফর্সা ধুতি, একরাশ ভিজে এলো চুল পিঠে ফেলা—গায়ের রং ফুটেচে স্নান করে—লম্বা পাতলা দেহ, সুন্দর ভুরু, বড় বড় চোখ—প্রতিমার মত সুশ্রী।

চা নামিয়ে বললে, জ্যাঠামশায়, বসুন, একটা জিনিস খাওয়াবো। খাবেন তো ?

—কি মা ?

—সে এখন বলচি নে। আনি আগে, তখন দেখবেন ?

শরৎ একটা পাথরের খোরাভর্ত্তি বাসি পায়েস এনে জগন্নাথের সামনে রাখলে। হাসিমুখে বললে, খান। বাবা বড় ভালবাসেন বলে কাল রাত্রে করেছিলুম—তা আজ সকালে অনেকখানি রয়েচে দেখলাম। বাবা চেয়েছিলেন খেতে, কিন্তু ওঁকে এখন আর দেবো না, দুপুরে ভাতের সঙ্গে দেবো বলে রাখলাম খানিকটা।

এমন সময় গ্রামের আরও অনেকের সঙ্গে প্রভাসকে দূরে আসতে দেখে কেদার বললেন, ও শরৎ, আরও সবাই আসচে। চা আর হবে নাকি ?

শরৎ বললে, ক' পেয়ালা ?

—চার-পাঁচ পেয়ালার মত হোক না হয়।

—তা হবে না, দুধ নেই। কাল রাত্রে একটু দুধ রেখেছিলাম, তাই

দিয়ে তোমাদের করে দিলাম। এক পেয়ালার মত একটুখানি পড়ে আছে।

—তবে প্রভাসের জন্যে শুধু এক পেয়ালা করে দে। ও গাঁয়ে কখনো আসে না, ওকে দেওয়া উচিত আগে। আর সব তো ঘরের লোক।

ওরা কিন্তু কেউই বাড়ীর কাছে এল না। অতিথিশালার কাছে এসে সাতকড়ি চৌধুরী ডাক দিয়ে বললেন,—ও কেদার-দাদা, এসো এদিকে—প্রভাস এসেচেন—আর কে বসে ওখানে—জগন্নাথ-খুড়ো?

কেদার বললেন, তুমি বসে পায়েস খাও দাদা, আমি যাই দেখি।

সাতকড়ি বললেন, কোথা থেকে ইট দেবে হে? চলো নিয়ে।

—চলো' কালো পায়রার দীঘির পাড়ে জঙ্গলে অনেক ইট আছে। ভুটো মন্দিরের ভাঙা ইটের রাশি। তাই নিও—কি বলো?

প্রভাস চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল বিস্ময়ের দৃষ্টিতে। সে এ-গ্রামে ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার এলেও কেদারের বাড়ী কখনো আসে নি বা গড়ের মধ্যেও কখনো ঢোকে নি। এত বড় বড় ভাঙা ঘরদোর ও মন্দির যে এখানে আছে, সে তা জানতো না। আগে জানলে সে ক্যামেরাটা নিয়ে আসতো কলকাতা থেকে।

কেদার তাকে বললেন, চলো প্রভাস, ওখানে জগন্নাথ-দা বসে আছেন, তুমিও একটু চা খাবে এসো। এসো সাতু ভায়া, তুমিও এসো।

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে চা পান করতে অভ্যস্ত নয় কেউই, সাতকড়িও না। সুতরাং প্রভাস ছাড়া আর কেউ চা খেতে গেল না।

সাতকড়ি বললেন, ঘুরে এসো প্রভাস, দেরি না হয়—আমরা এখানেই আছি।

প্রভাসকে ঘরের দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে বসিয়ে কেদার মেয়েকে চা দিতে বললেন। শরৎ এসে চা দিয়ে যাবে, কিন্তু অপরিচিত প্রভাসের সামনে হঠাৎ আসতে সঙ্কোচ বোধ করে পেয়ালা হাতে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে দেখে কেদার বললেন, ওকে দেখে লজ্জা করতে হবে না বুঝলি মা। ও আমাদের গাঁয়ের ছেলে—এখনই না হয় থাকে কলকাতায়। ও পর নয়। দিয়ে যাও চা।

শরৎ এসে প্রভাসের সামনে চা রাখলে। প্রভাস শরৎকে কখনো দেখেনি বলা বাহুল্য—চা দেবার সময় সে মৃদু কৌতুহলের সঙ্গে প্রথমটা একবার শরতের দিকে চাইলে…কিন্তু শরৎকে দেখবার পরক্ষণেই প্রভাসের চোখমুখ যেন অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মুখের চেহারা যে বদলে গেল অতি অল্পক্ষণের জন্যে এ যে কেউ দেখলেই বলতে পারতো।

প্রভাস আশা করে নি এত সুন্দরী মেয়েকে আজ সকালে এই ভাঙা ইটের স্তূপে ঘেরা জঙ্গলাবৃত ক্ষুদ্র বাড়ীতে এ ভাবে দেখতে পাবে। এত রূপ আছে, এই সব পাড়াগাঁয়ে!

প্রভাস থতমত খেয়ে চায়ের পেয়ালাটা হাতে তুলে নিলে।

কেদার বললেন, তোমাদের কলকাতায় কোথায় থাকা হয় বাবাজি?

প্রভাস অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবছিল, কেদারের প্রশ্নে যেন চমকে উঠে বললে, আমায় বলচেন? আপার সারকুলার রোড।

—তোমার বাবার শরীর কেমন?

—আছে ভাল, তবে উঠতে হাঁটতে পারেন না। বয়েস তো হোল কম নয়। সাহেব ডাক্তার দেখচে—তবে এ বয়েসের রোগ—

—তোমার একটি ছোট ভাই আছে শুনছিলাম, সে কি করে?

—সেও দোকানে বেরোয়। খুব ছোট নয়, তার বয়েস এই সাতাশ বছর হোল।

জগন্নাথ চাটুয্যে বললে, বাবাজি, বিয়ে করেচ কোথায়?

—কই, আমি বিয়ে তো করি নি এখনও।

কেদার জানতেন না যে প্রভাস অবিবাহিত। প্রভাসের সম্বন্ধে এ কথা তিনি কারো মুখে এর আগে শোনেন নি।

তিনি বিস্ময়ের সুরে বললেন, বিয়ে করো নি! তা তো জানতাম না।

—জগন্নাথ চাটুর্য্যে বললেন, আমিও জানতাম না। বাবাজির বয়েস অবশ্যি এখনও—বয়েসটা কত বাবাজি হোল?

—আজ্ঞে, একত্রিশ যাচ্ছে।

ওঃ, একত্রিশ! যথেষ্ট সময় আছে। তোমাদের এখনো যথেষ্ট—

—সে জন্যে নয় কাকাবাবু, বিয়ে আমার করবার ইচ্ছে নেই।

—বল কি বাবাজি! তোমাদের রাজার মত সম্পত্তি, বাড়ী ঘর, বিয়ে করবে না কি রকম?

প্রভাস হাসি হাসি মুখে চুপ করে রইল।

জগন্নাথ চাটুর্য্যে বললে, রাস্তু-দাদা কিছু বলেন না এ নিয়ে?

—অনেক বড় বড় সম্বন্ধ এনেচেন। হুগলী বালিতে একবার পচিশ হাজার টাকা দেবে আর হীরে জহরতের জড়োয়া—বাবা কিছুতেই ছাড়বেন না। বাবাকে বললাম, অমন সম্বন্ধ এর পরে জুটবার অভাব হবে না, যদি আমি বিয়েই করি। বাবা তাদের জানিয়ে দিলেন, কিন্তু তবুও তারা পীড়াপীড়ি করতে লাগলো এমন যে, আমি ওয়ালটেয়ার পালিয়ে গেলাম, সেখানে আমাদের বাড়ী আছে কি না? বছর পাঁচ-ছয় হোল বাবা হাইকোর্টের সেলে কিনেছিলেন।

কেদার বললেন, কি জায়গাটা বললে বাবাজি—কোথায় সেটা ?

—ওয়ালটেয়ার ? সমুদ্রের ধারে।

সমুদ্র কোন্ দিকে কত দূরে কেদারের সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব ছিল, কিন্তু জগন্নাথ চাটুয্যের জামাই রেলে কাজ করে, সে গত পুজোর সময় সস্ত্রীক পাশ নিয়ে পুরী গিয়েছিল। জগন্নাথ চাটুয্যের জানা আছে মাত্র এইটুকু যে পুরী নামক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানটি সমুদ্রের ধারে—সে সমুদ্র যত দূরেই হোক বা যে দিকেই হোক। সুতরাং সে জিগ্যেস করলে—পুরীর কাছে বাবাজি ?

—না, পুরী থেকে অনেক নীচে।

বলা বাহুল্য, পুরীর নীচে বা ওপরে কি ভাবে আর একটা জায়গা থাকতে পারে এ কথা জগন্নাথ বা কেদার কারো কাছেই তেমন পরিস্ফুট হোল না। সেদিক থেকে বরং সমস্যা জটিলতর হয়ে দাঁড়াতো এদের কাছে, কিন্তু শরৎ দোরের কাছে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্ত্তা শুনছিল, সে তার বাবার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—পুরীর আরও দক্ষিণে হোল তা হোলে—না বাবা ?

কেদার বিপন্নমুখে বললেন, হ্যাঁ—দক্ষিণে ?—তাই-ইয়ে দক্ষিণেই তো তা হোলে গিয়ে—

প্রভাস হঠাৎ শরতের মুখের দিকে একটু বিস্ময় মিশ্রিত প্রশংসার দৃষ্টিতে চেয়েই তখনি আবার চোখ ফিরিয়ে নিয়ে জগন্নাথের দিকে চেয়ে বললে, ঠিক বলেচেন উনি। দক্ষিণেই হোল।

এবার সকলে পুকুরের পাড়ের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলো ইট দেখবার জন্যে। ছাতিম বনের তলায় এদিক ওদিক ছড়ানো ভাঙা ঘরবাড়ী ও প্রাচীন দেউলগুলির ধ্বংসস্তূপ সকলকেই বিস্ময়াবিষ্ট করে তুললো। বেতের দুর্ভেদ্য ঝোপের আড়ালে কতদূর পর্য্যন্ত ছড়ানো বড় বড় ইটের স্তূপ, পাথরের কড়ি, পাথরের চৌকাঠ, নক্সা করা প্রাচীন ইট—ভাঙা

থামের মাথা সকলেরই মনে বর্ত্তমানের বহুদূর পিছনকার এক লুপ্ত বিস্মৃত অতীতের রহস্যময় বার্ত্তা ক্ষণকালের জন্যে বহন করে নিয়ে এল—যাতে জগন্নাথ চাটুয্যের মত কল্পনাশূন্য নিরেট ব্যক্তিকেও বলতে শোনা গেল —বাস্তবিক! এ সব দেখলে মন কেমন করে—কি বলো সাতু বাবাজি?

সাতকড়ি ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, তা আর করে না?

কিন্তু সকলের চেয়ে বিস্ময়ান্বিত হয়েচে প্রভাস—তা তার মুখ দেখেই বেশ বোঝা গেল।

প্রভাস এ সব কোনো দিন দেখে নি—বা তাদের গ্রামে যে এরকম আছে তা শুনলেও সেটা যে এই ধরণের ব্যাপার তা জানতো না।

সে বিস্ময়ের স্বরে বললে, ওঃ এতো অনেক কাল আগেকার। এ সব কীর্ত্তি ছিল কাদের?

সাতকড়ি বললেন, এই আমার কেদার দাদার পূর্ব্ব পুরুষের—আবার কার? এঁরাই গড়শিবপুরের রাজবংশ। কেন তুমি জানতে না বাবাজি? যাক্ দেখে নাও দিকি ক'গাড়ী ইট হবে বা কোন দিক থেকে খুঁড়বে।

প্রভাস চুপ করে রইল। জগন্নাথ চাটুয্যে বললে, যেখান থেকে হয় হাজার দশেক ইট আপাততঃ নাও না। কেদার ভায়ার কোনো আপত্তি নেই তো?

কেদার নির্ব্বিকার মানুষ—কোনো প্রকার ভাব বা অনুভূতির বালাই নেই তাঁর। তিনি বললেন, না আমার আপত্তি কি? ইট তো পড়েই রয়েচে।

সাতকড়ি বললেন, কিন্তু এ ইটের দাম কিছু দিতে পারবো না কেদার-দা, তা আগে থেকেই বলে রাখচি।

কেদার ক্ষুদ্র মনের পরিচয় কোনোদিন দেন নি—তিনি দিলদরিয়া

মেজাজের মানুষ সবাই জানে। বললেন, কিছু বলবার দরকার নেই সে সব। নিয়ে যাও না ভায়া—আমি কি তোমায় বলেচি দামদস্তুরের কথা?

ইতিপূর্ব্বেও কেদারের অবৈষয়িকতা ও ঔদার্য্যের সুযোগ নিয়ে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বহু লোক গড়ের ধ্বংসস্তূপ থেকে বিনামূল্যে গাড়ী গাড়ী ইট নিয়ে গিয়েচে ঘরবাড়ী তৈরী বা মেরামতের জন্যে—অর্থকষ্ট যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও কেদার কারো কাছে মূল্য চাইতে পারেন নি বা কাউকে বিমুখও করেন নি কোনোদিন, অথচ যেখানে পুরোনো ইটের হাজার-করা দর পাঁচ টাকা করে ধরলেও কেদার ইট বিক্রি করেই অন্ততঃ দেড় হাজার টাকা নিট দাম আদায় করতে পারতেন।

কিন্তু তা কখনো করবেন না কেদার। রাজবংশের ছেলে হয়ে পূর্ব্বপুরুষের ভিটের ইট বিক্রী করে টাকা রোজগার? ছিঃ—এমনি দেবেন। লোকের উপকার হয়, হোক না।

সাতকড়ি বললেন, তা হোলে প্রভাস বাবাজি, কাল থেকে লোক লাগিয়ে দিই—কি বল?

প্রভাস বললে, বেশ, নিয়ে যান—আমি তো বলেচি কাজ আরম্ভ করুন।

ক্ষণকালের সে ভাবান্তর কেটে গিয়েচে সকলের মন থেকেই। এরা অন্য ধাতের মানুষ, প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বাস্তব ছাড়া অন্য কোনো জগতের সঙ্গে এদের বিশেষ পরিচয় নেই।

কেদার দেখিয়ে দিলেন কোন্ পথে ইটের গাড়ী আসতে পারে, কারণ তিনি ভিন্ন গড়ের জঙ্গলের অন্ধি-সন্ধি বড় কেউ একটা জানে না।

কাজ মিটে গেল। সাতকড়ি বললেন, চলো সবাই জঙ্গলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে যাই—মশার কামড়ে মলাম।

বনের মধ্যে একটু যেন ভিজে ভিজে এখনও গাছপালা—বেলা বেশি

হয়েচে বটে, কিন্তু ঘন ছাতিম-বনের আবরণ ভেদ করে সূর্য্যকিরণ এখনও বনের তলায় পড়ে নি। কি একটা বনফুলের সুমিষ্ট গন্ধ ঠাণ্ডা বাতাসে।

প্রভাস সমস্ত পথ ঘোর অন্যমনস্ক ভাবে চলে এল। সে আজ যেন কেমন হয়ে গিয়েচে।

গড়বাড়ী থেকে বার হয়ে গ্রামে ঢুকবার মুখে সে কেদারকে বললে, আপনি বাড়ী থাকেন না কোথাও চাকুরী করেন?

কেদার বললেন, না বাবাজি, চাকুরী-টাকুরী কখনো আমাদের বংশে করে নি কেউ। বাড়ীই থাকি।

—আসুন না একবার কলকাতায়? আমাদের বাড়ী রয়েচে—দয়া করে সেখানে গিয়ে—

—আমার কখনো কোথাও যাওয়া হয় না—বাড়ী ফেলে, তা ছাড়া মেয়েটা একলা বাড়ী—ইয়ে হঁ্যা। এই সব কারণে যেতে পারি নে কোথাও। আর ধরো গিয়ে আমার বাড়ী একেবারে গাঁয়ের বাইরে। মানুষজন নেই। ফেলে যাই কি করে?

এ কথার প্রভাস বিশেষ কোনো জবাব দিলে না।

কেদার আবার বললেন, তুমি এখন ক-দিন থাকবে?

প্রভাস বললে, না, আমি কালই যাবো বোধ হয়। কলকাতায় অনেক কাজ রয়েচে পড়ে। পরশু তারিখের একটা পোষ্ট-ডেটেড্ চেক রয়েচে মোটা টাকার—আমি না গেলে সেখানা ব্যাঙ্কে প্রেজেণ্ট করা হবে না।

কেদার আদৌ বুঝলে না জিনিসটা কি। ব্যাঙ্ক জিনিসটা তিনি জানেন, শুনেচেন বটে—কিন্তু পোষ্ট-ডেটেড্ চেক্ কথার অর্থ কি বা সে কি ব্যাপার এসব সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই তাঁর। তিনি শুধু বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে বললেন, ও! ঠিক ঠিক।

ওরা চলে গেল সবাই। কেদার এত বেলায় অন্য কোথাও যাওয়া

উচিত বিবেচনা না করে বাড়ীর দিকেই ফিরচেন এমন সময় গেঁয়োহাটির ক্ষেত্র কাপালির সঙ্গে দেখা। সে গড়ের খাল পার হয়ে তাঁর বাড়ীর দিক থেকেই আসচে। কেদার বললেন, কি হে ক্ষেত্র, আমার ওখানে গিয়েছিলে নাকি?

—প্রাতপেন্নাম দা-ঠাকুর। মোদের গাঁয়ে ওবেলা যাতি হবে একেবারে ভুলে গিয়ে বসে আছো। দা-ঠাকুর আমাদের একেবারে বোম্ ভোলানাথ। মনে নেই আজ আমাদের যাত্রার দলের আথড়াই? আপুনি গিয়ে বেয়ালা না ধরলি আসর জমবে না আসরে ঢোলক বাজবে? চলো দা-ঠাকুর—তোমার বাড়ী গিয়েছিলাম, তা মা-ঠাকরুণ বললেন তিনি কোথায় গিয়েচেন বেরিয়ে।

—ভালই তো—তা ক্ষেত্র, তুমিও দুটো খেয়ে যাও আমার বাড়ী চলো না? বেলা হয়ে গিয়েচে, চলো।

ক্ষেত্র কাপালি রাজি হ'ল না। সে চলে গেল, যাবার সময় কেদারকে তাদের গ্রামে যেতে বলে গেল বার বার করে।

কেদার বাড়ী ফিরে দেখলেন শরৎ রান্না সেরে বসে আছে। বললে, বাবা, নেয়ে নাও, ভাত হয়ে গিয়েচে কতকক্ষণ। ওরা সব চলে গেল, ইট নিয়েচে?

—হ্যাঁ। ইট কাল গাড়ী পাঠিয়ে নিয়ে যাবে।

—গেঁয়োহাটির ক্ষেত্র এসেছিল তোমার খোঁজে। দেখা হয়েচে?

—এই তো গেল। ওবেলা ওদের আথড়াই বসবে তাই ডাকতে এসেছিল কিনা? খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নেবো—তার পর যাবো ওদের গাঁয়ে। তেল দাও।

ঘুমিয়ে উঠে বেলা তিনটর সময় কেদার গেঁয়োহাটি রওনা হবার উদ্যোগ করচেন, এমন সময় ভাঙা দেউড়ির রাস্তায় প্রভাসকে আসতে দেখে হঠাৎ বড় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

—আরে, এসো এসো বাবাজি এসো! কি মনে করে?...

প্রভাস একা এসেচে। ওবেলার সাজ আর এবেলা নেই গায়ে—সাদা সিল্কের একটা হাফ্-হাতা সার্ট পরেচে, হাতে ও গলায় সোনার বোতাম, পরণে জরিপাড় কাঁচি ধুতি, পায়ে নতুন ফ্যাসানের খাঁজকাটা জুতো। হাতের পাঁচ আঙ্গুলের মধ্যে তিন আঙ্গুলে পাথর-বসানো আংটি রোদ পড়ে চিক্‌চিক্ করচে।

—ও শরৎ, মা এদিকে এসো—প্রভাসকে একটা বসার জায়গা দাও। চা খাবে তো প্রভাস? হ্যাঁ, খাবে বৈকি, বোসো বোসো।

প্রভাস বললে, আপনাদের এখানে মোটর আসবার রাস্তা নেই? গাড়ীখানা গড়ের খালের ওপারে দাঁড় করিয়ে রেখেচি।

শরৎ একটা আসন বার করে প্রভাসকে বসতে দিয়ে রান্নাঘরের দিকে সম্ভবতঃ চা করতে গেল। প্রভাস বসে চারিদিকে তাকিয়ে বললে, আমি এর আগে কখনো গড়বাড়ীতে আসিনি, খুব কাণ্ড ছিল তো এক সময়! দেখে শুনে সত্যিই অবাক হয়ে যাবার কথা বটে। কি ছিল, তাই ভাবি! মন কেমন যেন হয়ে যায়। না, কাকা?

কেদার এ ধরণের কথা অনেক লোকের মুখ থেকে অনেক বার শুনেচেন, শুনে আসচেন তাঁর বাল্যকাল থেকে। এই সব ইট-পাথরের ঢিবি আর জঙ্গলের মধ্যে লোকে কি যে দেখতে পায়, তিনি ভেবেই পান না। পয়সা থাকলেই বোধ হয় মানুষের মনে এসব অদ্ভুত ও আজগুবি মনোবৃত্তির সৃষ্টি হয়—কে জানে? কেদারের কৌতুক হয় এ ধরণের কথা শুনলে। থাকে সব কলকাতায় বড় বড় বাড়ীতে ইলেকট্রিক আলো আর পাখার তলায়, এই সব পাড়াগাঁয়ে এসে যা দেখে তাই ভাল লাগে—আসল কথাটা হোল এই। একবার অনেক দিন আগে মহকুমার হাকিম এসেছিলেন এই গ্রামে কি একটা মোকর্দ্দমার তদারক করতে। যেমন সকলেই আসে, তিনি এলেন গড়শিবপুরের রাজবাড়ী থাকতে।

কেদারের ডাক পড়লো। কেদার তো সঙ্কোচে জড়সড় হয়ে হাকিমের সামনে হাজির হোলেন। হাকিম-হুকুমকে বিশ্বাস নেই, কাঁচা-খেকো দেবতা সব।

হাকিম জিগ্যেস করলেন, আপনি গড়শিবপুরের রাজবংশের লোক?

—আজ্ঞে হুজুর।

—আপনাকে দেখে আমার মনের মধ্যে কি হচ্চে জানেন? আপনি কে আর আমি কে! আপনি এ পরগণার রাজা—আর আমি—আপনার একজন কর্ম্মচারীর সমান।

কেদার সম্ভ্রম দেখিয়ে নীরব রইলেন। বড়লোক খেয়ালখুসিতে অনেক কিছু বলে—সব কথার জবাব দিতে নেই।

শরৎ তখন মাত্র পনেরো বছরের মেয়ে, উদ্ভিন্ন যৌবনা, অপূর্ব্ব সুন্দরী। হাকিম তাকে কাছে ডেকে আদর করে বললেন, মাকে আমি নিয়ে যেতাম, যদি আজ রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হতাম, আমার সে সৌভাগ্য নেই—আমার ছেলেটি এবার বি-এ পাশ করেচে। কিন্তু বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সঙ্গে তো আপনি কাজ করবেন না? মা আমার রাজবংশের মেয়ে বটে! ওর সেবা পাবো, সে ভাগ্য কি আর করেচি?

শরৎ মুখ নীচু করে রইল লজ্জায় ও সঙ্কোচে।

দশ-এগারো বছর আগেকার কথা।

শরৎ প্রভাশের সামনে চা এনে দিলে। সে খুব সরু পাড় একখানা ধুতি পরেচে, হাতে দুগাছা সোনার চুড়ি—মায়ের হাতের বালা ভেঙে ক'গাছা চুড়ি হ'য়েছিল, এই দু'গাছা তার মধ্যে অবশিষ্ট আছে। জড়িয়ে এলো-খোঁপা বাঁধা, দেখলে ওকে উনিশ-কুড়ি বছরের বেশি বলে কিছুতেই মনে হয় না এমনি লাবণ্যভরা মুখশ্রী।

প্রভাসের দিকে চেয়ে বললে, দেখুন তো আর চিনি দেব কি না—

প্রভাস চায়ে চুমুক দিয়ে একটু সঙ্কোচের সুরে বললে, আজ্ঞে না। আমি চিনি কম খাই—

কেদার বললেন, তার পর কি মনে করে বাবাজি?

প্রভাস যেন আমতা আমতা করে উত্তর দিলে—ইয়ে—এই কিছু না—এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম কি না?...তাই—

—বেশ বেশ। বোসো বাবাজি—

প্রভাস চা পান শেষ করে বসে রইল বটে, তবে একটু উস্‌খুস্ করতে লাগলো। বসে থাকাটা তার পক্ষে যেন বড়ই অস্বাচ্ছন্দ্যকর হয়ে উঠচে। অথচ মুখেও কোনো কথা যোগায় না। এমন অবস্থায় সে কখনো পড়ে নি।

কেদার বললেন, তুমি কালই তো কলকাতায় যাবে—না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কাল দুপুরে রওনা হবো খেয়ে দেয়ে।

আবার সে একটু উস্‌খুস্ করতে লাগলো।

তার এ ভাবটা বুদ্ধিমতী শরতের চোখ এড়ালো না। তার মনে হোল প্রভাস কিছু বলবার জন্যে এসেচে। কিন্তু তা বলতে পারচে না। সে একটু বিস্ময়মিশ্রিত কৌতুহলের দৃষ্টিতে প্রভাসের দিকে চেয়ে রইল।

পরক্ষণেই প্রভাস পকেট থেকে একটা ছোট মখমলের বাক্স সসঙ্কোচে বার করে বললে, এইটে এনেছিলাম দিদির জন্যে—

কেদার বিস্ময়ের স্বরে বললেন, কি ওটা?

—এই গিয়ে—একটা আংটি—

—শরতের জন্যে এনেচ?

—হ্যাঁ—ভাবলাম, কখনো আসিনে যখন আলাপ হয়েই গেল আপনাদের সঙ্গে তাই—

কেদার হাত বাড়িয়ে মখমলের বাক্স হাতে নিয়ে বললেন, দেখি?

বাঃ বাক্সটি বেশ! আংটিটা—এ যে দেখচি বেশ দামী জিনিস! এ তুমি আনলে কোথা থেকে?

—ওবেলা মোটরে চলে গিয়েছিলাম রাণাঘাট। সেখান থেকে কিনে এনেচি—আমার জানাশুনো দোকান, এ জিনিস বাইরে শো-কেসে সাজিয়ে রাখে না। আমাকে চেনে বলে বার করে দিলে।

—কত দাম নিয়েচে?

প্রভাস সলজ্জভাবে বললে, সে কথা আর কেন জিগ্যেস করচেন কাকাবাবু। দাম আর কি, অতি সামান্য—আপনাদের দেওয়ার মত কিছু না—

কেদার আংটিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, আমার মনে হচ্ছে তুমি বেশ পয়সা খরচ করেচ। এ পাথরখানা তো বেশ দামী, হীরে বোধ হয়—না?

প্রভাস একটু উৎসাহের সুরে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। দেড় রতি ওজন, আসল পাথর। তবে দামদস্তুরের কথা এখনও সেক্‌রার সঙ্গে কিছু হয় নি—

কেদার বাক্সটা প্রভাসের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, কেন এত খরচপত্র করতে গেলে অনর্থক? এ তুমি নিয়ে যাও বাবাজি। এ দরকার নেই।

প্রভাসের মুখে যেন কে কালি লেপে দিল। সে ভয়ে ভয়ে বললে—এনেছিলাম দিদিকে দেবো বলে—খুব আশা করেছিলাম—যদি অপরাধ না নেন—

—না বাবাজি—শরৎ বিধবা মানুষ, ও আংটি টাংটি পরে না তো। ও বড় গোঁড়া ধরণের মেয়ে। এতদিন চুল কেটে ফেলতো, শুধু আমার ভয়ে পারে না।

প্রভাস কিছু কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ করে রইল। কেদারের মনে

কেমন একটু সহানুভূতি জাগলো প্রভাসের প্রতি—বেচারী যেন বড়ই লজ্জিত ও অপ্রতিভ হয়ে পড়েচে আংটির বাক্স ফেরৎ দেওয়ায়। নাঃ এদের সব ছেলেমানুষি কাণ্ড!

মেয়ের দিকে চাইতে গিয়ে কেদার দেখলেন শরৎ কখন সেখান থেকে সরে গিয়েচে। ডাকলেন—ও শরৎ, শোনো মা—

শরৎ ঘরের ভেতের থেকে জবাব দিলে—কি বাবা?

—হ্যাঁরে, প্রভাস একটা আংটি দিতে চাচ্চে তোকে—কি করবি? রাখবি?

শরৎ আড়াল থেকেই বললে—আমি কি জানি? তুমি যা ভাল বোঝো। আংটি আমি তো পরিনে—তবে উনি যখন হাতে করে এনেচেন, থাক্ জিনিসটা।

কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে শরৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে বললে—দেখি?

প্রভাস জিনিসটা কেদারের হাতে দিল—তিনি মেয়ের হাতে তুলে দিলেন সেটা। প্রভাস শরতের দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল—কিন্তু শরৎ তখন বাক্সটি খুলে আংটি নেড়ে চেড়ে দেখচে—তার চোখ অন্যদিকে ছিল না।

কেদার হাসিমুখে বললেন—পছন্দ হয়েছে তোর? তা পছন্দ হবার জিনিস বটে। আমি শুধু বলচি প্রভাসকে যে এত খরচ করবার কি দরকার ছিল? এখান থেকে সাত ক্রোশ তফাৎ রাণাঘাটের বাজার। মটোর গাড়ী আছে তাই যেতে পেরেছিলে বাবাজি।

প্রভাসের মুখ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, সে বললে, দিদিকে একটা সামান্য জিনিস দিলাম—এতে খরচপত্রের আর—কিছুই না। অতি সামান্য জিনিস—

শরৎ বললে, বসুন আপনি। আমি খাবার করচি, খেয়ে যাবেন। ততক্ষণ বাবা একটু গল্প করো না প্রভাসবাবুর সঙ্গে?

কেদার আসলে খুব সন্তুষ্ট নন, তিনি একটু বিরক্তই হয়েচেন প্রভাস আসাতে। বেলা পড়ে আসচে, এখন তাঁর বেরুবার সময়—গেঁয়োহাটির আখড়াইয়ের আসরে বেহালা না বাজালে আখড়াই জমবে না ক্ষেত্র কাপালি বলে গিয়েচে ওবেলা।

আর ঠিক এই সময়ে এসে কিনা জুটলো প্রভাস।

একে তো মেয়ে বাড়ী থেকে বেরুতে দেয় না, তার ওপর যদি প্রতিবেশীরা পর্য্যন্ত বাদ সাধে, তবে তিনি বাঁচেন কি করে!

শরৎ ঘরের মধ্যে চলে গিয়েছে খাবার করতে—কেদার আর কিছুক্ষণ বসে প্রভাসের সঙ্গে অন্যমনস্ক ভাবে একথা ওকথা বললেন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল তাঁর মন নেই কথাবার্ত্তার দিকে—গেঁয়োহাটিতে একটা ছিটের বেড়ার দেওয়াল দেওয়া চালাঘরে এতক্ষণ কত লোক জুটেচে—সবাই তাঁর আগমন-পথের দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে—তিনি না গেলে আখড়াইয়ের আসর একেবারে মাটি।

বেলা বেশ পড়ে এসেছে। এখান থেকে দেড় ক্রোশ রাস্তা গেঁয়োহাটি—অনেক দূর।

হঠাৎ তিনি উঠে পড়ে বললেন, মা, প্রভাস বাবাজি রইলেন বসে। তুমি খাবার করে খাইয়ে দিও। আমার বিশেষ দরকার আছে—গেঁয়োহাটিতে খাজনার তাগাদা আছে—প্রভাসের দিকে চেয়ে বললেন—বোস তুমি বাবাজি, কিছু মনে কোরো না—

মেয়েকে কোনো রকম প্রতিবাদের সুযোগ না দিয়েই তিনি দাওয়া থেকে নেমে উঠোন পার হয়ে ভাঙা দেউড়ির দিকে হন্ হন্ করে হাঁটতে সুরু করলেন। অনেক সময় এ রকম ক্ষেত্রে মেয়ে ছুটে এসে পথ আটকায়—পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা থেকে কেদার এ জানেন কি না?

শরৎ রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বললে, যেও না বাবা—শোন বাবা—খেয়ে যাও খাবার—শোনো ও বাবা—

সঙ্গে সঙ্গে সে খুন্তি হাতে রান্নাঘর থেকে বার হয়ে এসে নীচু চালের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে চেয়ে দেখলে, কেদার ভাঙা দেউড়ির পথে অদৃশ্য হয়েছেন।

তার লজ্জা করতে লাগলো প্রায় অপরিচিত প্রভাস যে বসে সামনে—নইলে সে এতক্ষণ দেখিয়ে দিতো বাবা জোরে হেঁটে কতদূর পালান। গড়ের খালে নামবার আগেই সে ছুটে গিয়ে ধরে ফেলতো বাবার হাত।

ছিঃ কি অন্যায় বাবার!

প্রভাসের দিকে চেয়ে বললে, একটু বসুন, কেমন তো? আমি মোহনভোগ চড়িয়ে এসেচি কড়ায়—আসচি নামিয়ে—

প্রভাস খানিকক্ষণ একা বসে থাকবার পরে শরৎ কাঁসার কাণা উঁচু রেকাবিতে মোহনভোগ এনে ওর সামনে রাখলে, আর এক গেলাস জল।

—কেমন হয়েছে বলুন তো প্রভাস-দা?

শরতের স্বর সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ—আত্মীয়তার সহজ হৃদ্যতায় মধুর ও কোমল।

প্রভাস একটু অবাক হয়ে গেল ও 'দাদা' ডাকে।

শরতের মুখের দিকে চেয়ে বললে, আপনি কি করে জানলেন আমি আপনার চেয়ে বড়?

শরৎ মৃদু হাসিমুখে জবাব দিলে—আমি জানি।

—কি করে জানলেন?

—বারে, ভুলে গেলেন? ওবেলা তো জগন্নাথ জ্যাঠাকে বললেন এখানে বসে আপনার বয়সের কথা।

এইবার প্রভাসের মনে পড়লো। ওবেলা এ-কথা উঠেছিল বটে

সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, বেশ হোল, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল—

শরৎ সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললে, কেমন হয়েচে মোহনভোগ বললেন না যে?

—খু-ব ভাল হয়েচে। সত্যি বলছি চমৎকার হয়েচে—

—মা খুব ভাল করতে পারতেন, তেমনটি আমার হাতে হয় না।

—আমার একটা অনুরোধ রাখুন। আংটিটা পরুন আমার সামনে—

শরৎ বাক্সটা খুলে আংটিটা হাতে নিয়ে আঙুলে পরে বললে, বেশ হয়েচে। এই দেখুন—

প্রভাস আনন্দে গলে গিয়ে বললে, কি চমৎকার মানিয়েছে আপনার আঙুলে।

শরৎ ছেলেমানুষের মত খুসিতে নিজের আঙুলের দিকে বার বার চেয়ে দেখতে লাগল।

প্রভাস বললে, আচ্ছা, আপনি একা থাকেন কাকা বেরিয়ে গেলে ভয় করে না আপনার?

—ভয় করলেই বা করছি কি বলুন—উপায় তো নেই। বাবা লুকিয়ে পর্য্যন্ত পালিয়ে যান, পাছে আমি আটকে রাখি। ওঁর ছেলেমানুষি স্বভাব—দেখে আসচি এতটুকু বেলা থেকে। মা বেঁচে থাকতেও ঠিক অমনি করতেন—

—আচ্ছা, আপনি কখনো কলকাতা দেখেচেন?

শরৎ ঠোঁট উল্টে হেসে বললে, কলকাতা। উঃ—তা আর জানিনে! কখনো জীবনে গোয়াড়ি কেষ্টনগর কি নবদ্বীপ দেখলাম না আর কলকাতা। আমি এই গড়ের খালের জঙ্গলে কাটালাম সারা জীবনটা প্রভাস-দা—সত্যি বলচি ভাল লাগে না।

প্রভাস যেন বড় উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল—পরক্ষণেই আবার সে ভাবটা

চেপে সহজ তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, এ আর কি কঠিন আপনার কলকাতা দেখা? যেদিন মন করবেন, সেদিনই হ'তে পারে।

শরৎ হর্ষদীপ্ত স্বরে বললে, আপনি নিয়ে যাবেন প্রভাস-দা?

প্রভাস সোৎসাহে বললে, কেন নিয়ে যাব না? বলুন না আপনি কবে যাবেন? মোটর তো রয়েচে—টানা মোটরে বেড়িয়ে আসবেন কলকাতা।

খুব ভাল কথা প্রভাস-দা। যাব এর মধ্যে একদিন। একঘেয়েমি বরদাস্ত হয় না আর।

প্রভাস একহাত জমি শরতের দিকে এগিয়ে বসল উৎসাহের ঝোঁকে। বললে—আপনাকে আজ নতুন দেখচি বটে, কিন্তু মনে হয় যেন আপনার সঙ্গে আমার আলাপ আজকার নয়, অনেক পুরোনো।

কি জানি কেন, এ কথা শরতের কানে ভাল শোনালো না—সে নিজেকে কিছু দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। প্রভাসের কথার কোনো উত্তর সে দিলে না।

প্রভাস বোধ হয় শরতের এ ভাব লক্ষ্য করলে। সে সুর বদলে বললে—আপনার বাবা বড় ভাল লোক, ওঁকে আমার নিজের বাবার মত ভাবি।

বাবার প্রশংসা শুনে শরতের মন আহ্লাদে পূর্ণ হয়ে গেল। তার বাবাকে গ্রামের কেউ প্রশংসা করে না, অন্ততঃ সে তো বড় একটা শোনে নি কখনো কারো মুখে এক রাজলক্ষ্মী ছাড়া। কিন্তু রাজলক্ষ্মী বালিকা মাত্র, তার মতামতের মূল্য কি?

শরৎ বললে, বাবার মত মানুষ একালে হয় না। একেবারে সাদাসিদে, কিছুই বোঝেন না ঘোরপেঁচ, গাঁয়ের লোক কত রকম কি বলে, মজা দেখবার জন্যে ওঁকে নাচিয়ে দিয়ে কত রকম কি করে—সে সব দিকে খেয়াল নেই। দেখুন প্রভাস-দা, আমাদের অতিথিশালা

আছে বলে গাঁয়ের লোক ইচ্ছে করে বাইরের লোক এনে বাবার ঘাড়ে চাপাবে। আমাদের অবস্থা সবাই অথচ জানে—কিন্তু বাবাকে জব্দ করা তো চাই! আমার এত দুঃখু হয় সময়ে সময়ে!

—আপনি বলেন না, কেন কাকাকে বুঝিয়ে?

—আমার কথা উনি শোনেন না কখনো শুনেচেন? যাকেই বড় গেরাজিা করতেন, তার আমি! যা খেয়াল ধরবেন, তাই করবেন।

—আচ্ছা, আজ উঠি তা হোলে। আর এক দিন আসবো এখন। কলকাতা যাওয়ার কথা মনে আছে তো? এক দিন নিয়ে যেতে আসবো কিন্তু।

প্রভাস চলে গেলে শরৎ গৃহকর্ম্ম শেষ করে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বাললে। চারি দিকে বনে-বাদাড়ে ঘেরা উঠোন, বেশ একটু শীত পড়েচে—হেমন্ত কাল শেষ হতে চলেচে।

শরৎ উত্তর-দেউলে প্রদীপ দিয়ে এসে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকলো। বাবা কত রাত্রে ফিরবেন, ঠিক নেই—সে রান্না শেষ করে বসে থাকবে। একলা থেকে থেকে ভাল লাগে না সত্যি—এই নিবান্ধা পুরীতে, এই বন-বাদাড়ের মধ্যে।

তার মন চায় একটু মানুষ জনের সঙ্গ, কারো সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা কওয়া যায়, কেউ একটা মজার গল্প বলে। তবুও কলকাতা থেকে প্রভাস-দা এসেছিল, খানিকটা সময় কাটলো।

এই সময় যদি একবার রাজলক্ষ্মী আসতো?

রান্না করতে করতে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে গল্প করা যেতো তা হোলে। মুখটি বুঁজে কি করে মানুষ থাকতে পারে সারাদিন?

বাবা বৃদ্ধ হয়ে পড়েচেন, সব জিনিস হয় ত ঠিক মত বুঝতে পারেন না—তাঁকে আগলে বেড়ানো উচিত সব সময়।

মা যখন নেই, তখন তাকেই করতে হবে বাবার সব কাজ। তাঁর সব সুখ-সুবিধে তাকেই দেখতে হবে। বাবাকে ফেলে তার মরেও সুখ নেই।

এ অভাবের সংসারে সে যে কত জায়গা থেকে জিনিসপত্র জুটিয়ে আনে, বাবা কি তার কোনো খবর রাখেন?

তিনি দুবেলা ঠিক খাবার সময় এসে বলবেন—শরৎ ভাত হয়েচে? ভাত দে মা। চাল যে কতদিন বাড়ন্ত থাকে, তেল-নুনের অভাবে রান্না হয় না—বাবা কখনো রেখেচেন সে সন্ধান?

রাজকন্যার গর্ব্ব তখন খসে পড়ে, রাজকন্যা তখন এক গরীব গৃহস্থের ছেঁড়া শাড়ী-পরা মেয়ে হয়ে কাঠা হাতে তেলের বাটি হাতে ছোটে ধর্ম্মদাস-কাকাদের বাড়ী, রাজলক্ষ্মীদের বাড়ী...সাজিয়ে বানিয়ে কত মিষ্টি মিষ্টি মিথ্যে কথা সেখানে বলে, মানকে জলে ভাসিয়ে দেয়, চক্ষুলজ্জাকে আমল দিতে চায় না।

যখন আরও বয়েস কম ছিল, মাঝে মাঝে কিন্তু সত্যিকার রাজকন্যা হোতে তার ইচ্ছে জাগতো মনে। গড়বাড়ীর পুকুরপাড়, বন, জংলী লতায় ঢাকা ইটের স্তূপ চাঁদের আলোয় ফুটফুট করচে, তার স্বাস্থ্য-ভরা দেহের প্রতি পদক্ষেপে গর্ব্ব ও আনন্দ, প্রাণে অফুরন্ত গানের ঝঙ্কার, মুকুলিত প্রথম যৌবনের অপরিসীম স্বপ্ন তার চোখের চাউনিতে—তখন একদিন এক দেশের রাজপুত্র এলেন ঘোড়ায় চেপে, তার রূপের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েচে যে। না এসে কে থাকতে পারবে?

বিয়ে তোমার আমি করবো না রাজপুত্তুর—

ওমা, সে কি সর্ব্বনাশ! তুমি বলো কি রাজকন্যে, আমার ঘোড়ার দিকে চেয়ে দেখ, ঘেমে উঠেচে। কদ্দুর থেকে ছুটে আসচি যে তোমার জন্যে—আর তুমি বলো কি না—

বাজে কথা বলে লাভ কি রাজপুত্তুর। ফিরে যাও—

কেন বলো না? কি হয়েচে?

আমরা মস্ত বড় বংশ, তার ওপরে ব্রাহ্মণ—তোমার কোন্ দেশে ঘর, কি বংশ তার নেই ঠিকানা—আমায় কত হীরামতির গহনা দিতে হবে জানো? আমার বাবাকে এক গাদা টাকা দিতে হবে জানো?… বাবা দোকান করবেন।

এই কথা! কত টাকা দিতে হবে তোমার বাবাকে? কিসের দোকান করবেন তিনি?

দাও দু হাজার পাঁচ হাজার। চাল, ডাল, ঘি, তেলের প্রকাণ্ড মুদিখানার দোকান—ছিবাস-কাকার দোকানের চেয়ে অনেক, অনেক বড়—বাবার কষ্ট যে দূর করবে, সে আমায় নিয়ে যাবে—

কেদার এসে ডাক দিলেন—ও মা, ওঠ্—ও শরৎ— উঠে পড়ো—

আঁচল বিছিয়ে কখন শরৎ উনুনের সামনে রান্নার পিঁড়ির পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েচে। বাবার ডাকে সে ধড়মড় করে উঠে পড়লো।

নাঃ, তুই কোন্ দিন পুড়ে মরবি দেখচি, আচ্ছা রাঁধতে রাঁধতে অমন করে উনুনের সামনে শোয়? যদি আঁচলখানা উড়ে পড়তো আগুনে? ঘুম ধরলে তোর আর জ্ঞানকাণ্ড থাকে না—

শরৎ একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল, ঘুমজড়িত কণ্ঠে বললে, কি হয়েচে?…আঁচল উড়ে পড়তো তো বেশ ভালই হোত। তোমার হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে স্বর্গে চলে যেতাম—বাবাঃ—রাত্তিরে একটু ঘুমুবারও যো নেই—বেশ যাও—

কথা শেষ করেই শরৎ আবার তখুনি মেঝের ওপর শুয়ে পড়লো।

কেদার জানেন, মেয়ের ঘুমের ঘোর এখনও কাটেনি—এই রকমই হয় প্রায় প্রতিদিন, তিনি দেখে আসচেন। ভারী ঘুমকাতুরে মেয়ে।

তিনি আবার ডাক দিলেন—ও শরৎ—মা আমার ওঠো—এই যে

কলকাতায় চাকরী করতো। চল্লিশ টাকা মাইনে। বেড়ে নাকি হোতে পারে একশো টাকা। তাদের পৈতৃক বাড়ী কোন্নগর, চাকুরী উপলক্ষে কলকাতায় আছে অনেক দিন।

সম্বন্ধটি রাজলক্ষ্মীর মনে ধরেছিল। ছেলেটিও দেখতে নাকি ভালই ছিল। কি দেনা-পাওনার গণ্ডগোলে সম্বন্ধ ভেঙে গিয়েছিল।

মাস দুই ধরে কথাবার্ত্তা চলবার ফলে রাজলক্ষ্মীর মন অনেকবার নানা রঙীন স্বপ্ন বুনে ছিল সেটা ঘিরে। কথনো যে কলকাতা সে দেখেনি এবং হয়তো দেখবেও না কথনো ভবিষ্যতে, সেই কলকাতা সহরের একটা বাড়ীর দোতলার ঘরে খাট টেবিল চেয়ার সাজানো তাদের ঘরকন্না, দালানের এক কোণে ছোট্ট একটি খাঁচায় টিয়া কি ময়না পাখী, মাটি-দেওয়া টিনের টবে তুলসী গাছ, একটা ঘেরাটোপ-মোড়া সেলাইয়ের কলটা টেবিলের এক পাশে—নিস্তব্ধ দুপুরে বসে সে হয়তো কিছু একটা বুনচে কি সেলাই করচে—উনি গিয়েচেন আপিসে—বাসায় শ্বশুর-শাশুড়ী বা ও ধরণের কোনো ঝামেলা নেই—সে আছে একাই—নিজেকে কত মনে মনে সেই কল্পনীয় ঘরকন্নাটিতে ডুবিয়ে দিয়েচে সে, সে ঘরের খুঁটিনাটি কত কি পরিচিত হয়ে উঠেছিল তার মনের মধ্যে—দেখলেই যেন চিনে নিতে পারতো ঘরটা—কিন্তু কোথায় কি হয়ে গেল, সে ঘরে গিয়ে ওঠা তার আর ঘটে উঠলো না।

শরৎ-দিদির কথায় সে অল্পক্ষণের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, শেষের দিকের প্রশ্নের মানে সে ভাল করে না বুঝে শূন্যদৃষ্টিতে শরতের মুখের দিকে চেয়ে বললে—কি বললে শরৎ-দি? মজা?...ও, মজা হবে না আবার? খুব হবে। সত্যি কথা বলতে কি, এখান থেকে যেখানে বেরুবে সেখানেই ভাল লাগবে। একঘেয়ে দিন যেন আর কাটতে চায় না। অসহ্যি হয়ে উঠছে দিন দিন। দুপুরে যে তোমার এখেনে নিশ্চিন্দি হয়ে বসবো তার উপায় নেই এতক্ষণ কাকীমা ঘুম

থেকে উঠলেন, যদি দেখেন এখনও এটো বাসন মাজা হয় নি, রান্নাঘর ধোয়া হয় নি, তবে সন্দে পজ্জন্ত বকুনি চলবে।

শরৎ হাসিমুখে বললে, তাহোলে তুই ঝগড়া করে এসেচিস্ বাড়ী থেকে ঠিক বললাম। হাঁ কি না বল?

রাজলক্ষ্মী চুপ করে রইল।

শরৎ বললে, তাই বুঝলাম এতক্ষণ পরে। নইলে ঠিক দুপুর বেলা তুমি আসবার মেয়েই আর কি! ভাত খেয়ে এসেচিস না আসিস্ নি, সত্যি কথা বল—আমার মাথার দিব্যি—আমার মরা মুখ দেখিস্—

—না তা নয়। তেমন ঝগড়া নয়। ভাত খেয়েচি বৈকি—

—সত্যি বলচিস্?

—মিথ্যে কথা বলবো না, শরৎ-দি, তুমি যখন অমন দিব্যি দিলে। না, সে খাওয়ার কথা নিয়ে নয়—ঝগড়া নিয়েও নয়, সত্যিই এত এক-ঘেয়ে হয়ে উঠেচে এখানে—ইচ্ছে হয় যেদিকে দু-চোখ যায় ছুটে যাই—

—সত্যি, যা বললি ভাই, আমারও বড় একঘেয়ে লাগে। সেই সকাল থেকে বিকেল পজ্জন্ত একই হাঁড়ি হেঁসেল নিয়ে নাড়চি আর একই দীঘির ঘাটে সতেরো বার দৌড়ুচ্চি, তার পর কেবল নাই আর নেই—

কিন্তু তরুণী রাজলক্ষ্মীর মন যা চায়, যে জন্যে ব্যাকুল শরৎ তা ঠিক বুঝতে পারে নি। রাজলক্ষ্মীও ঠিক মত বোঝাতে পারে না,. তাই নিয়েই তো আজ বাড়ীতে কাকীমার বকুনি খেতে হোল। সে সর্ব্বদা নাকি থাকে অন্যমনস্ক, কি তাকে বলা হয়, নাকি তার কানে যায় না—ইত্যাদি তার বিরুদ্ধে বাড়ীর লোকের অভিযোগ। শরৎও বুঝতে পারে না ওর দুঃখ। ঘরকন্না করে করে শরতের মন বসে গিয়েচে এই সংসারেই, যেমন তাদের বংশের পুরোনো আমলের পাথরের থাম আর ভাঙা মূর্ত্তিগুলো ক্রমশঃ মাটির ওপর চেপে বসতে বসতে ভেতরে সেঁধিয়ে যাচ্চে।

কালো বীচির রাশি ছড়িয়ে আছে। উইয়ের ঢিবির পাশে বনধুন্দুরার ঝোপ। শরৎ তন্ময় হয়ে শুনতো।···

অন্য এক জীবন, অন্য এক অস্তিত্বের বার্ত্তা বহন করে আনতো এ সব গল্প। আজ সে মেয়ে হয়ে জন্মেচে তার হাত-পা বাঁধা, কোথাও যাবার উপায় নেই, কিছু দেখবার উপায় নেই—তার ওপর রয়েচেন বাবা, বৃদ্ধ, সদানন্দ বালকের মত সরল, নির্ব্বিকার।

তারপরে এল প্রভাস-দা।

প্রভাস-দা এল আর এক জীবনের বার্ত্তা নিয়ে। সহরের সহস্র বৈচিত্র্য ও জাঁকজমক আছে সে কাহিনীর মধ্যে। মানুষ যেখানে থাকে অত অদ্ভুত আমোদ-প্রমোদের মধ্যে ডুবে—নিত্য নতুন আনন্দের মধ্যে যেখানে দিন কাটে, দেখতে ইচ্ছে হয় শরতের সে দেশ কেমন! খুব বড় একটা আশা ও আকাঙ্ক্ষা শরতের মনে জেগেচে প্রভাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর থেকে।

তারপর এই রাজলক্ষ্মী, ষোল বছরের কিশোরী মেয়ে তো মোটে—এরও নাকি একঘেয়ে লাগচে আজকাল গড়শিবপুরের জীবন। ওর বয়েসে শরৎ শুধু শিবপূজো করেচে বসে বসে দীঘির ঘাটে বোধনের বেলতলায়, অত সে বুঝতোও না, জানতোও না।

কিন্তু আজকালের মেয়েদের মন আলাদা। শরৎ যে কালের মেয়ে, সে কাল কি আছে?

রাজলক্ষ্মী শরতের দিকে চেয়ে হঠাৎ বলে উঠলো—সত্যি শরৎ-দি···

শরৎ মুখ নিচু করে বাসন মাজছিল, মুখ তুলে ওর দিকে চেয়ে বিস্ময়ের সুরে বললে, কি-রে?

আচ্ছা, তোমার চেহারা দেখলে কে বলবে তোমার বয়েস হয়েচে! তোমাকে দেখে আমি মেয়েমানুষ, আমারই চোখের পলক পড়ে না শরৎ-দি—সত্যি, সত্যি বলচি। রাজকন্যে মানায় বটে।

শরৎ সলজ্জ হেসে বললে, দূর—বাঁদরী !

মিথ্যে বলিনি শরৎ-দি—এতটুকু বাড়িয়ে বলচি নে—

কেন নিজের দিকে তাকিয়ে বুঝি কথা বলিস নে ?

আর লজ্জা দিও না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি। অনেক তাকিয়ে দেখেচি, কাজেই ওকথা মনে সর্ব্বদাই জেগে থাকে। ওকথা তুলে আর কেন মন খারাপ করিয়ে দেও ?

শরৎ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটু ইতস্ততঃ করে বললে—একটা কথা বলবো রাজলক্ষ্মী ?

—কি শরৎ-দি ?

—আমায় অমন কথা আর বলিস নে। কে কোথা থেকে শুনবে আর কি ভাববে। এ গাঁ বড় খারাপ হয়ে উঠেচে ভাই

—কেন শরৎ-দি একথা বললে ?

—তোকে এতদিন বলিনি, কাউক্কে বলিনি বুঝলি ? কিন্তু যখন কথাটা উঠলোই, তখন তোর কাছে বলি।

কি কথা বলে ফেলো না ঝাঁ করে। হাঁ করে তোমার মুখের দিকে কতক্ষণ চেয়ে থাকবো—

এগাঁয়ে কতকগুলো পোড়ার মুখো ড্যাকরা জুটেচে, তাদের মা বোন জ্ঞান নেই—সেগুলোর জ্বালায় আমার সন্দের সময় উত্তর-দেউলে পিদিম দিতে যাবার যদি যো থাকে —সেগুলো কবে ষাঁড়তলার ঘাটসই হবে তাই ভাবি—

রাজলক্ষ্মী অবাক হয়ে শরতের মুখের দিকে চেয়ে বললে, বলো কি শরৎ-দি ! এ কথা তো কোনো দিন শুনি নি তোমার মুখে !…কবে দেখেচ ? কি করে তারা ?

কি করে আবার—উত্তর-দেউলে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে, ছাতিম

শরৎ দুষ্টুমির হাসি হেসে রাজলক্ষ্মীর মুখের দিকে সুন্দর ভঙ্গিতে চেয়ে বললে—ইস্! বলিস কি রে! সত্যি? সত্যি নাকি?

রাজলক্ষ্মীও উৎসাহের সুরে হাসিমুখে বললে, বাঃ, কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায় শরৎ-দিদি? কি চমৎকার ভাবে চাইলে? আমারই মন কেমন করে ওঠে তবুও আমি মেয়ে মানুষ।

শরৎ কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বললে, আবার! বারণ করে দিলাম না? ও সব কথা বলবি নে। মেয়ের এদিকে নেই ওদিকে আছে? চল্ বাসনগুলো কিছু নে দিকি হাতে করে—বেলা আর নেই। এখনও ছিষ্টির কাজ বাকি

বাড়ী ফিরে রাজলক্ষ্মী বললে, চলে যাই শরৎ-দিদি—সন্দে হোলে যেতে ভয় করবে।

শরৎ তাকে যেতে দিলে না। বললে—ও কিরে! তোকে কিছু খেতে দিলাম না যে? তা হবে না। এইবার চা করি, আর কিছু খাবার করি।

—না শরৎ-দি, পায়ে পড়ি ছেড়ে দাও আজ। আর একদিন এসে খাবো এখন।

শরৎ কিছুতেই শুনলে না—কখনো সে রাজলক্ষ্মীকে কিছু না খাইয়ে ছেড়ে দেয় না, নিজে সে গরীব, গরীব ঘরের মেয়ে রাজলক্ষ্মীর দুঃখ ভাল করেই বোঝে। বাড়ীতে হয়তো বিকেলে খাবার কিছুই জোটে না—আসে এখানে, গল্প করে—ওকে খাওয়াতে পারলে শরতের মনে তৃপ্তি হয় বড়। শরৎ চা করে ওকে দিলে, নিজের জন্যে একটা কাঁসার গ্লাসে ঢেলে নিলে। হালুয়া করে ওকে কিছু দিয়ে বাকিটা বাবার জন্যে রেখে দিলে।

রাজলক্ষ্মী বললে, ওকি শরৎ-দি, তুমি নিলে না?

আমি একেবারে সন্দের পরই তো খাবো। এখন খেলে আর খিদে পায় না, তুই খা—

রাজলক্ষ্মী চা ও খাবার পেয়ে বেশ একটু খুসিই হোল। বললে, কি সুন্দর হালুয়া তুমি কর শরৎ-দি—

—যাঃ আমার সবই তো তোর ভালো।

—তা ভালো লাগলে ভালো বলবো না? বা—রে—তোমার সবই আমার যদি ভালো লাগে, তবে কি করি বলো না?

—আমারও ভাল লাগে তুই এলে বুঝলি? এই নিবান্ধা পুরীর মধ্যে একা মুখটি বুজে সদাসর্ব্বদা থাকি, কেউ এলে গেলে বড় ভাল লাগে। বাবা তো সব সময় বাড়ী থাকেন না তোর সঙ্গে বেশ একটু গল্পগুজব করে বড় আমোদ পাই।

আমারও শরৎ-দি। গাঁয়ের আর কোনো মেয়ের সঙ্গে মিশে তেমন আমোদ পাইনে, তাই তো তোমার কাছে আসি।

রাজলক্ষ্মীর বিবাহের বয়স পার হয়েচে—কিন্তু বাপ-মায়ের পয়সার জোর না থাকায় এখনও কিছু ঠিকঠাক হয় নি। শরতের মনে এটা সর্ব্বদাই ওঠে, যেন তার নিজেরই কন্যাদায় উপস্থিত।

কেদারকে দিয়ে শরৎ দু-এক-জায়গায় কথাবার্ত্তা তুলেছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পয়সা-কড়ির জন্যে সে সব সম্বন্ধ ভেঙে যায়। আজ দিন দশ-বারো হোল, কেদার আর একটা সম্বন্ধ এনেছিলেন—শরতেরও শুনে মনে হয়েচে সেখানে হোলে ভালই হয়। পূর্ব্বে এ নিয়ে একবার দুই সখীর মধ্যে কথাবার্ত্তা হয়েচে।

আজও শরৎ বললে—ভালো কথা, রাজলক্ষ্মী—আসল ব্যাপারের কি করবি বল—

রাজলক্ষ্মী না বুঝতে পারার ভান করে বললে—কি ব্যাপার আসল?

থাকলে মা ভারি বকবে। একলাটি অন্ধকারে যেতে ভয়ও করে। কেদার-জ্যাঠার আসবার ভরসায় থাকতে গেলে দুপুর রাত হয়ে যাবে, বাপরে!

কেরোসিনের টেমি ধরে শরৎ গড়ের খাল পর্য্যন্ত রাজলক্ষ্মীকে এগিয়ে দিলে। রাজলক্ষ্মী খাল পার হয়ে ওপারের রাস্তায় উঠে বললে, তুমি যাও শরৎ-দি, গোয়ালাদের বাড়ীর আলো দেখা যাচ্চে—আর ভয় নেই।

যেতে যেতে সে ভাবছিল, নৈহাটি কেমন জায়গা না জানি।

সংসারে বেশী ঝামেলা না থাকাই ভালো।

ম্যাট্রিক পাশ ছেলে মন্দ নয়।

ছেলের রংটা কালো না ফর্সা?

চার

শীত কমে গিয়েছে—বসন্তের হাওয়া দিতে সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সজনে গাছে থোকা থোকা ফুল দেখা দিয়েচে।

কেদার নিজের গ্রামেই একটি কৃষ্ণযাত্রার দল খুলেচেন। সম্প্রতি এ অঞ্চলে কৃষ্ণযাত্রার একটা হিড়িক এসে পড়েচে—গত পুজোর সময় থেকে এর প্রথম সূত্রপাত ঘটে, বর্ত্তমানে মহামারীর মত গ্রামে গ্রামে হুজুক ছড়িয়ে পড়েচে। কেদার হটবার পাত্র নন, তাঁর গ্রামকে ছোট হয়ে থাকতে দেবেন কেন—জেলেপাড়া, কামারপাড়া এবং কুমোর পাড়ার লোকজন জুটিয়ে তিনিও এক দল খুলে মহা উৎসাহে মহলা আরম্ভ করচেন। স্নানাহারের সময় নেই তাঁর, ভারি ব্যস্ত। সম্প্রতি

তাঁর দলের গাওনা হবে চৈত্রমাসে অন্নপূর্ণা পুজার দিন গ্রামে বারোয়ারি তলায়। বেশি দেরি নেই, দেড় মাস মাত্র।

সীতানাথ জেলের বাড়ীর বাইরে বড় ছ-চালা ঘর। যাত্রার দলের মহলা এখানেই রোজ বসে! অন্য সকলের আসতে একটু রাত হয়, কারণ সবাই কাজের লোক—কাজকর্ম্ম সেরে আসতে একটু দেরিই হ'য়ে পড়ে। কেদারের কিন্তু সন্ধ্যা হোতে দেরি সয় না, তিনি সকলের আগে এসে বসে থাকেন।

সীতানাথ বাড়ী নেই—শীতকালের মাঝামাঝি নৌকো করে এখান থেকে পাঁচ দিনের পথ চুর্ণী নদীতে মাছ ধরতে গিয়েচে—এখনও দেশে ফেরে নি।

সীতানাথের বড় ছেলে মাণিক বাড়ীতে থাকে ও গ্রামের নদীতেই মাছ ধরে স্থানীয় হাটে বিক্রী করে সংসার চালায়। আজ পুরো মহলা হবে বলে সে সকাল সকাল নদী থেকে ফিরে এসে বাইরের ঘরে বড় বড় খানকতক মাদুর ও চট পেতে আসর করে রেখেচে।

কেদারকে বললে, বাবাঠাকুর, তামাক কি আর এক বার ইচ্ছে করবেন?

তা সাজ না হয় একবার। হাঁরে মাণ্কে, এরা এখনো সব এল না কেন?

আসচে বাবাঠাকুর, সবাই কাজ সেরে আসচে তো, একটু দেরি হবে।

তুই তামাক সেজে একবার দেখে আয় দিকি বিশু কুমোরের বাড়ী। ওর ছেলেটাকে না হয় ডেকে আন। সে রাধিকা সাজবে, তার গানগুলো ততক্ষণ বেহালায় রপ্ত করে দিই—

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে জন দুই অভিনেতা ঘরে ঢুকলো—এক জন ছিবাস মুদী আর এক জন হৃষীকেশ কর্ম্মকার।

গানে বাজনায় বক্তৃতায় গল্পে এবং সঙ্গে সঙ্গে তামাক ও বিড়ির ধোঁয়ায় মহলাঘরের বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেচে, এমন সময় দূরে কিসের চীৎকার শোনা গেল।

কে একজন বললে, ও ছিবাস জ্যাঠা—চৌকিদার হাঁকচে যে বামুন পাড়ায়, অনেক রাত হয়েচে তবে!

দু-এক জন উৎকর্ণ হয়ে শুনে বললে, তাই তো রাতটা বেশি হয়ে গিয়েচে। বাবাঠাকুর, আজ বন্ধ করে দিলে হোত না। আপুনি আবার এতটা পথ যাবেন—

বিশু কুমোরের ছেলে এ পর্য্যন্ত গোটা আষ্টেক গানের তালিম দিয়ে এবং কেদারের কাছে বিস্তর ধমক খেয়ে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল—সে করুণ দৃষ্টিতে কেদারের দিকে চাইলে।

কেদার বললেন, ঘুম আসচে, না? তোর কিছু হবে না বাবা। কুমোরের ছেলে, চাক ঘোরাবি, ভাঁড় আর তিজল হাঁড়ি গড়বি, তোর এ বিড়ম্বনা কেন বল দিকি বাপু? সেই সন্দে থেকে তোকে পাখীপড়া করচি, এখনও একটা গানও নিখুঁত করে গলায় আনতে পারলি নে—তোর গলায় নেই সুর তার কোথেকে কি হবে? বেসুরো গলা নিয়ে গান গাওয়া চলে

আসলে তো একথা ঠিক নয়। বিশু ছেলেটি বেশ সুকণ্ঠ গায়ক, সবাই জানে, কেদারও তা ভালই জানেন—কিন্তু তিনি বড় কড়া মাষ্টার এবং তাঁর কথা বলবার ধরণই এই। ছেলেটির এ রকম তিরস্কার গা-সওয়া হয়ে গিয়েচে, সুতরাং সে কেদারের কথায় দুঃখিত না হয়ে বললে—দাদাঠাকুর, বাড়ীতে মার অসুখ—সকাল সকাল যেতি বাবা বলে দিয়েল—

তা যা যা। আজ তবে থাক এই পর্য্যন্ত। কাল সবাই সকালে সকালে আসা হয় যেন। চল হে ছিবাস, চল হে রিষিকেশ—

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে কেদার উঠে পড়লেন, হুস্ না করিয়ে দিলে তিনি আরও কতক্ষণ এখানে থাকতেন কে জানে।

কিন্তু মহলা ঘরের বাইরে পা দিয়ে তিনি একটু অবাক হয়ে বললেন, একি হ্যাঁ ছিবাস, জ্যোৎস্না উঠে গিয়েচে যে!

আজ্ঞে হ্যাঁ বাবাঠাকুর, তাই তো দেখচি—

তাই তো হে, আজ নবমী না? কৃষ্ণপক্ষের নবমী—ওঃ অনেক রাত হয়ে গিয়েচে তা হলে।

পথে কিছুদূর পর্য্যন্ত এক সঙ্গে এসে বিভিন্ন পাড়ার দিকে একে একে সবাই বেরিয়ে গেল কেদারকে ফেলে। দু-তিনজন কেদারকে বাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে চাইলে—কিন্তু কেদার সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে একাই বাড়ীর দিকে চললেন। গড়ের খাল পার হবার সময় নিশীথ রাত্রির জোৎস্নালোকিত বন-ঝোপের দিকে চেয়ে চেয়ে কেদারের বেশ লাগল। কেদারের পিতামহ রাজা বিষ্ণুরামের স্বহস্তে রোপিত বোম্বাই আমের গাছে প্রচুর বউল এসেচে এবার—তার ঘন সুগন্ধে মাঝ রাত্রির জ্যোৎস্নাভরা বাতাস যেন নেশায় ভরপুর, ভারি আনন্দে জীবনের দিন-গুলো কেটে যাচ্ছে মোটের উপর তাঁর। সকাল থেকে এত রাত পর্য্যন্ত সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যায় তা তিনি বুঝতেই পারেন না।

কি চমৎকার দেখাচ্ছে জোৎস্নায় এই গড়বাড়ীর জঙ্গল, ভাঙা ইট-পাথরের ঢিবিগুলো! সবাই বলে নাকি অপদেবতা আছে, তিনি বিশ্বাস করেন না! সব বাজে কথা!

কই এত রাত পর্য্যন্ত তো তিনি বাইরে থাকেন, একাই আসেন বাড়ী, কখনো কিছু তো দেখেন নি! বাল্যকাল থেকে এই বনে ঘেরা ভাঙা বাড়ীতে মানুষ হয়েছেন, এর প্রত্যেক ইটখানা, প্রত্যেক গাছটি, বনের লতাটি তাঁর প্রিয় ও পরিচিত! তাঁর অস্তিত্বের সঙ্গে এরা জড়ান, তিনি যে চোখে এদের দেখেন, অন্য লোকে সে চোখ পাবে কোথায়?

কষ্ট হয় শরতের জন্যে!

ওকে তিনি কোনো সুখে সুখী করতে পারলেন না। ছেলে মানুষ, ওর জীবনের কোন সাধ পুরলো না। সারাদিনের কাজকর্ম ও আমোদ-প্রমোদের ফাঁকে ফাঁকে শরতের মুখখানা যেন তাঁর মনে পড়ে হঠাৎ তখন বড় অন্যমনস্ক হয়ে যান কেদার! যেখানেই থাকুন, মনে হয় এখনি ছুটে একবার তার কাছে চলে যান!

আহা, এত রাত পর্য্যন্ত মেয়েটা একা এই জঙ্গলে ঘেরা বাড়ীর মধ্যে থাকে, কাজটা ভাল হচ্ছে না—ঠিক নয় কেদারের এতক্ষণ বাইরে থাকা!

দোরে ঘা দিয়ে কেদার ডাকলেন, ও শরৎ, মা ওঠো, দোর খোলো—

দু-তিনবার ডাকের পর শরতের ঘুমজড়িত কণ্ঠের ক্ষীণ সাড়া পাওয়া গেল।

—উঠে দোর খুলে দে—ও শরৎ—

শরৎ বিরক্তিভরা মুখে দোর খুলতে খুলতে বললে, আমি মরবো মাথা কুটে কুটে তোমার সামনে বাবা। পারি নে আর—সন্দে হয়েছে কি এ যুগে! রাত কাবার হয়ে গেল—এখন তুমি বাড়ী এলে। পূবে ফর্সা হবার আর বাকি আছে?

—না না, আরে এই তো বামুন পাড়ার চৌকিদার হেঁকে গেল— রাত এখনও অনেক আছে। আর বকিস নে, এখন ভাত দে দিকি। খিদে পেয়েছে মা—

কেদার খেতে বসলে শরৎ ঝাঁঝের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

কোথায় আবার থাকবো? আমাদের দলের মহলা হচ্ছে, সেখানে আমি না থাকলেই সব মাটি। যেদিকে আমি না যাবো সেদিকেই কোনো কাজ হবে না।

শরৎ একটু নরম সুরে বললে, কোথায় যাত্রা হবে? আমি কিন্তু যাবো তোমার সঙ্গে।

—তা ভালই তো। বাড়ীর মেয়েদের জন্যে চিক দিয়ে দেবে, যাবি তো ভালই।

শরৎ একটু চুপ করে থেকে বললে, বাবা, আজ প্রভাস-দা এসেছিল।

কেদার বিস্ময়ের সুরে বললেন, কোথায়? কখন?

—তুমি বেরিয়ে চলে গেলে তার একটু পরেই। এখানে এসে বসলো। তার সঙ্গে আর একজন ওর বন্ধু। দু-জনকে চা করে দিলাম—খাবার কিছু নেই, কি করি একটুখানি ময়দা পড়েছিল, তাই দিয়ে খানকতক পরোটা ভেজে দিলাম।

বেশ বেশ। কতক্ষণ ছিল?

—তা অনেকক্ষণ—প্রায় ঘণ্টাতিনেক। সন্ধ্যা হবার পরও খানিকক্ষণ ছিল।

—কি বলে গেল?

—বেড়াতে এসেছিল। প্রভাস-দা'র বন্ধু কলকাতার কোন বড়লোকের ছেলে, বেশ চেহারা। নাম অরুণ মুখুয্যে। আমাদের গড়বাড়ীর গল্প শুনে সে এসেছিল প্রভাস-দা'র সঙ্গে দেখতে। অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখলে।

বড়লোকের কাণ্ড, তুইও যেমন! ঘরে পয়সা থাকলেই মাথায় নানা রকম খেয়াল গজায়। তারপর দেখে কি বললে?

—খুব খুসি। আমাদের এখানে এসে কত রকম কথা বলতে লাগলো, অরুণবাবু আবার আসবে, ফটোগ্রাফ নিয়ে যাবে। কি লিখবে নাকি আমাদের গড়বাড়ী নিয়ে। আমায় তো একেবারে মাথায় তুললে।

—ওই তো বললাম বড় লোকের যখন যেটি খেয়াল চাপবে। কলকাতায় মানুষের নেই অভাব—আমাদের মত দুঃখ-ধান্দা করে যদি খেতে হোত—

শরতের হাসি পেল বাবার দুঃখ-ধান্দা করে খাবার কথায়। জীবনে তিনি তা কখনো করেন নি। কাকে বলে তা এখনও জানেন না। কিসে কি হয় তা শরৎ ভাল করেই জানে।

যেমন আজকের দিনের কথা। শরৎ হুবুহু সত্য কথা বলে নি। ঘরে কিছুই ছিল না। ওরা গেল ভাঙা ইট কাঠ দেখতে, গড়বাড়ী ঘুরতে—সেই ফাঁকে শরৎকে উদ্ধশ্বাসে ছুটতে হোল রাজলক্ষ্মীদের বাড়ী ময়দা ও ঘি ধার করতে। সেখানে পাওয়া গেল তাই মান রক্ষে। সব দিন আবার সেখানেও পাওয়া যায় না।

রাজলক্ষ্মী ওদের কথা শুনে দেখতে এসেছিল। সেই চা ও খাবার পরিবেশন করেছিল প্রভাস ও তার বন্ধুকে।

আর একটা কথা শরৎ বলেনি বাবাকে। প্রভাস ওকে একটা মখমলের বাক্স দিয়ে গিয়েছে। কেমন চমৎকার বাক্সটা। তার মধ্যে গন্ধতেল, এসেন্স, পাউডার আরও সব কি কি? না নিলে প্রভাস-দা কি মনে করবে, সে বাক্সটা হাত পেতে নিয়েছিল—কলকাতার ছেলে, ওরা হয় তো বোঝে না যে বিধবা মানুষের ওসব ব্যবহার করতে নেই। তার যে কোনো বিষয়ে কোনো সাধ আহ্লাদ নেই, সব বিষয়ে সে নিস্পৃহ, উদাসী—কেমন এক ধরণের এ বয়সেই মেয়ের সন্ন্যাসিনী মূর্তি তার বাবার ভাল লাগে না। শরৎ তা জানে। বাবাকে বলে কি হবে বাক্সটার কথা, যখন সেটা সে রাখবে না।

কেদার আহারান্তে তামাক খেতে বসলেন বাইরের দাওয়ায়।

শরৎ বলল, বাইরে কেন বাবা, ঘরে বসে খাও না তামাক, আজকাল রাত্তিরে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। দিনে গরম, রাতে ঠাণ্ডা যত অসুখের কুটি।

গভীর রাত্রি।

বিছানায় শুয়ে একটা কথা তার মনে হোল বার বার। এর আগেও অনেক বার মনে হয়েছে। প্রভাস-দার বন্ধু অরুণবাবুর চেহারা বেশ সুন্দর, অবস্থাও ভাল। রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে ওর বিয়ে দেওয়া যেত?

রাজলক্ষ্মী এল তিনদিন পরে।

সে গড়ের বনে সজনে ফুল কুড়ুতে এসেছিল, কোঁচড় ভর্ত্তি করে ফুল কুড়িয়ে বাড়ী ফিরবার পথে শরতের রান্নাঘরে উঁকি মেরে বললে, ও শরৎ-দি, সজনে ফুল রাখবে নাকি? কত ফুল কুড়িয়েছি দ্যাখো—তোমাদের ওই পুকুরের কোণের গাছে।

শরৎ রান্না চড়িয়ে ছিল, ব্যস্তভাবে খুসির সুরে বললে, ও রাজলক্ষ্মী আয়, আয় দেখি কেমন ফুল? আয় তোকে আমি খুঁজছি ক'দিন। কথা আছে তোর সঙ্গে।

একটা ছোট চুবড়ি এনে বললে, দে এতে চাট্টি ফুল। বেশ কুঁড়ি কুঁড়ি ফুলগুলো, ভাজবো এখন। বাবা বড্ড খেতে ভালবাসেন।

শরৎ-দি, আমাদের ওদিকে তুমিও তো যাও নি ক'দিন

না ভাই, বাবার পায়ে বাত মত হয়ে কদিন কষ্ট পেলেন। তাঁর তাপ-সেঁক—আবার এ দিকে সংসারের ছিষ্টি কাজ, এর পরে সময় পাই কখন যে যাবো বল। চা খাবি?

না শরৎ-দি, বেলা হয়ে গেল—আর বেশিক্ষণ থাকলে এ বেলা ফুলগুলো ভাজা হবে কখন? এ বেলা যাই—ও বেলা বরং আসবো।

দাঁড়া, তোর জন্যে একটা জিনিস রেখে দিয়েচি, নিয়ে যা—

শরৎ মখমলের বাক্সটা এনে ওর হাতে দিয়ে বললে, ছাখ্ তো কেমন? খুলে ছাখ্—

অপ্রত্যাশিত আনন্দে ও বিস্ময়ে রাজলক্ষ্মীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এক মুহূর্তে। বাক্সটা খুলতে খুলতে বললে, কোথায় পেলে শরৎ-দি?

প্রভাস-দা দিয়ে গিয়েছিল সেদিন।

রাজলক্ষ্মী শরতের মুখের দিকে চেয়ে বললে, তা তুমি রাখলে না?

শরৎ মৃদু হেসে বললে, ওর মধ্যে ছাখ না কত কি—সাবান, পাউডার, মুখে মাখাবার ক্রিম্—আমি কি করবো ও সব। তুই নিয়ে গিয়ে মাখলে আমার আনন্দ হবে।

রাজলক্ষ্মী কিছু ভেবে বললে, যদি মা জিগ্যেস করে কোথায় পেলি?

বলিস আমি দিয়েচি।

এ নিয়ে কেউ কিছু বলবে না তো? জানো তো নিমু ঠাকরুণকে, গাঁয়ের গেজেট। প্রভাসবাবুর কথা বলবো না—কি বলো?

সত্যি কথা বলচি, এতে আর ভয় কি? নিমু ঠানদি এতে বলবে কি? বলিস প্রভাসবাবু দিয়েছিল শরৎ-দিকে।

ভারি খারাপ মানুষ সব শরৎ-দি। তুমি যত সহজ আর ভালো ভাবো সবাইকে অত ভালো কেউ নয়। আমার আর জানতে বাকি নেই। সেবার যে এখানে প্রভাসবাবু এসেছিল, এ কথা গাঁয়ে রটনা হয়ে গিয়েচে। কাল যে এসেছিল আবার—তা নিয়েও কাল কথা হয়েচে।

শরৎ বিস্ময়ের সুরে বললে, বলিস কি রে? কি কথা হয়েচে?

—অন্য কথা কিছু নয় শরৎ দিদি। শুধু এই কথা যে প্রভাস-দা তোমাদের বাড়ী আসা যাওয়া করচে আজকাল। তুমি না হোয়ে অন্য মেয়ে যদি হোত, তা হোলে অনেক অন্য রকম কথাও ওঠাতো নিমু ঠাকরুণ, আমার জ্যাঠাই মা, হীরেন কাকার মা, জগন্নাথ দাদু—এরা। কিন্তু তুমি বলেই কেউ কিছু বলতে সাহস করে না।

শরৎ যাত্রার দলের সুর নকল করে টেনে টেনে হাত নেড়ে বললে,

দেশের রাজকন্যার নামে অপকলঙ্ক রটাবে, কার ঘাড়ে কটা মাথা? সব তা হোলে গর্দ্দান নেবো না দুরাচারদের?

রাজলক্ষ্মী হি হি করে হেসে লুটিয়ে পড়ে আর কি! মুখে কাপড় গুঁজে হাসতে হাসতে বললে, উঃ এত মজাও তুমি করতে জানো শরৎ-দি! হাসিয়ে মারলে—মাগোঃ—

শরৎ হাসিমুখে বললে, তবে একটু বসে যা লক্ষ্মী দিদি আমার। দুটো মুড়ি খেয়ে যা—

রাজলক্ষ্মী দুর্ব্বল সুরের প্রতিবাদ জানিয়ে বললে, না, শরৎ-দি—ফুল ভাজা হবে কখন তা হোলে এবেলা? আমায় আটকো না—

—বোস্। আমিও খাচ্চি দুটো মুড়ি—নারকোল কোরা দিয়ে। তুইও খাবি। যেতে দিলে তো? সজনে ফুলের দুর্ভিক্ষ লাগেনি গড় শিবপুরে—

খানিক পরে শরৎ মুড়ি খেতে খেতে বললে, শোন রে, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে। অরুণবাবু এসেছিল প্রভাস-দার সঙ্গে, দেখেচিস তো? ওর সঙ্গে তোর বিয়ের কথা পাড়বো প্রভাস-দার কাছে? অরুণবাবুরা বেশ অবস্থাপন্ন। বেশ ভাল হবে।

রাজলক্ষ্মী সলজ্জ দৃষ্টিতে শরতের মুখের দিকে চেয়ে বললে, কি যে তুমি বলো শরৎ-দি! এক-এক সময় এমন ছেলেমানুষ হয়ে যাও!

—ছেলে মানুষ হওয়া কি দেখলি?

—ওরা আমায় নেবে কেন? আমার কি রূপগুণ আছে বলো। তুমি যে চোখে আমায় দেখো—সকলে কি সে চোখে দেখবে?

—সে ভাবনায় তোর দরকার নেই। তুই শুধু আমায় বল প্রভাস-দার কাছে কথা আমি পাড়বো কি না। অরুণবাবুকে পছন্দ হয়?

—দূর—কি যে বলো? শরৎ-দি একটা পাগল—

—সোজা কথাটা কি বল না?

—ধরো যদি বলি হয়—তুমি কি করবে?

—তাই বল! আমি প্রভাস-দার কাছে তা হোলে কথাটা পেড়ে ফেলি।

রাজলক্ষ্মী চুপ করে রইল। শরৎ বললে, বাড়ীতে বা অন্য কারো কাছে বলিস নে কোনো কথা এখন।

রাজলক্ষ্মী হাত নেড়ে বললে, হ্যাঁ, আমি বলে বেড়াতে যাই, ওগো আমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্চে সবাই শোনো গো। একটা কথা, জ্যাঠামশাইকে যেন বোলো না শরৎ-দি?

—বাবাকে? ও বাপরে! এখুনি সারা গাঁ পরগনা রটে যাবে তা হোলে। পাগল তুই, তা কখনো বলি?

রাজলক্ষ্মী বিদায় নিয়ে বাড়ী যাবার পথে গড়ের খাল পার হয়ে দেখলে কেদার একটা চুপড়িতে আধ চুপড়ি বেগুন নিয়ে হন্ হন্ করে আসচেন।

ওকে দেখে বললেন, ও বুড়ি, ওঃ কত সজনে ফুল যে!—কোথেকে? তা বেশ। শরতের সঙ্গে দেখা করে এলি তো?

—হ্যাঁ জ্যাঠামশায় শরৎ-দির সঙ্গে দেখা না করে আসবার যো আছে? আর না খাইয়ে কখনো ছাড়বে না।

—হ্যাঃ, ভারি তো খাওয়া? কি খেতে দিলে?

—মুড়ি মাখলে, ও খেলে, আমি খেলাম।

—তা যা মা—বেলা হয়ে গেল আবার—

রাজলক্ষ্মী দূর থেকে কেদারকে আসতে দেখে মখমলের বাক্সটা কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছিল—সে একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। কথা শেষ করে কেদারের সামনে থেকে পালিয়ে বাঁচলো সে।

কিন্তু কিছু দূর যেতেই সে শুনলে কেদার তাকে পেছন থেকে ডাকচেন—ও বুড়ি, শুনে যা। একটু দাঁড়িয়ে যা—

—কি জ্যাঠামশায় ?

—এই বেগুন ক'টা আনলাম গোঁয়োহাটির তারক কাপালীর বাড়ী থেকে। তুই নিয়ে যা ছুটো। সজনে ফুলের সঙ্গে বেশ হবে এখন—

রাজলক্ষ্মী বিব্রত হয়ে পড়লো। এক হাতে সে বাক্সটা ধরে আছে, অন্য হাতে ফুলে ভর্তি আঁচল। বেগুন নেয় কোন হাতে? কিন্তু কেদার সদাই অন্যমনস্ক, কোনোদিকে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখবার তাঁর সময় নেই। কোনো রকমে গোটা চারেক বেগুন রাজলক্ষ্মীর সামনে নামিয়ে রেখে তিনি চলে যেতে পারলে যেন বাঁচেন এমন ভাব দেখালেন।

রাজলক্ষ্মী ভাবলে—জ্যাঠামশায় বড় ভাল। এ গাঁয়ে ওদের মত মানুষ নেই। শরৎ-দি কি ভালই বাসে আমায়। এ গাঁ থেকে যদি বিয়ে হয়ে অন্য জায়গায় চলে যাই, শরৎ-দিকে না দেখে কি করে থাকবো তাই ভাবি! পাছে বাড়ীতে জ্যাঠাইমা টের পায়, এজন্যে রাজলক্ষ্মী বাক্সটা সন্তর্পণে লুকিয়ে বাড়ী ঢুকলো। মাকে ডেকে বললে, এই দেখো মা—

রাজলক্ষ্মীর মা বাক্সটা হাতে নিয়ে বললেন, বাঃ দেখি, দেখি—কোথায় পেলি রে? শরৎ দিলে? চমৎকার জিনিসটা। আমরা বাপু সেকেলে লোক, কখনো চক্ষেও দেখিনি এসব। শরৎ কোথায় পেলে রে?

রাজলক্ষ্মী বললে, ওকে প্রভাস-দা কাল দিয়েছিল। তা ও তো এসব মাখবে না—জানো তো ওকে। তাই আমায় বললে, তুই নিয়ে যা। এ কথা কাউকে বোলো না কিন্তু মা।

দু-দিন পরে কেদার একদিন সকালে বললেন, শরৎ মা, আমি আজকে একবার তালপুকুর যাবো খাজনা আদায় করতে,

ঘন নিবিড় বনের মধ্যে ঢুকে রাজলক্ষ্মীর গা ছম ছম করতে লাগলো। শরৎদি শক্ত মেয়েমানুষ, ওর সাহস বলিহারি—ও সব পারে। বাবাঃ, এই বনে মানুষ ঢোকে পাতাল কোঁড়ের লোভে?

—ও শরৎদিদি, সাপে খাবে না তো? তোমাদের গড়ের ইটের ফাটলে ফাটলে সাপ বাবা—

শরৎ কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বললে, অমন করে আমার বাপের বাড়ীর নিন্দে করতে দেবো না তোকে—আমাদের এখানে যদি সাপ থাকতো তবে আমার এতদিন আস্ত থাকতে হোত না। আমার মতো বনে-জঙ্গলে তো তুমি ঘোরো না? কি বর্ষা, কি গরমকাল, ঝড় নেই, বিষ্টি নেই, অন্ধকার নেই—একলাটি বনের মধ্যে দিয়ে যাবো উত্তর-দেউলে সন্দে পিদিম দিতে—তা ছাড়া এই বনে কাঠ কুড়িয়ে বেড়াই, বাবা কি যোগাড় করে দেন?

এক জায়গায় রাজলক্ষ্মী থমকে দাঁড়িয়ে বললে, ছাখো ছাখো শরৎ-দিদি, কত পাতাল কোঁড়ে—বেশ বড় বড়—

শরৎ তাড়াতাড়ি এসে বললে, কই দেখি?...

পরে হেসে বলে উঠলো—দূর! ছাই পাতাল কোঁড়—ও সব ব্যাঙের ছাতা, অত বড় হয় না পাতাল কোঁড়—ও খেলে মরে যায় জানিস? বিষ—

—সত্যি শরৎদি?

—মিথ্যে বলচি? ব্যাঙের ছাতা বিষ—

—আমি খেলে মরে যাবো—

—বালাই ষাট—কি দুঃখে?

—বেঁচে বা কি সুখ শরৎদি? সত্যি বলচি—

—কেন, জীবনের উপর এত বিতেষ্টা হোল যে হঠাৎ?

—অনেকদিন থেকেই আছে। এক এক সময় ভাবি আমাদের মত

মেয়ের বেঁচে কি হবে শরৎদি? না আছে রূপ, না আছে গুণ—এমনি ক'রে কষ্টস্রেষ্ট করে ঘুঁটে কুড়িয়ে আর বাসন মেজেই তো সারাজীবন কাটবে?

—সুখ যদি জুটিয়ে দিই? তা হোলে কিন্তু—

—তোমার সেই সেদিনের কথা তো? তুমি পাগল শরৎ-দি—

—তুই রাজি হয়ে যা না?

—সেই জন্যে আটকে রয়েচে! তোমার যেমন কথা—

—এবার প্রভাস-দাকে বলবো দেখিস হয় কি না—

হঠাৎ রাজলক্ষ্মী উৎকর্ণ হয়ে বললে, চুপ শরৎ-দি, বনের মধ্যে কারা আসচে—

শরতেরও তাই মনে হোল। কাদের পায়ের শব্দ বনের ওপাশে। শরৎ ও রাজলক্ষ্মী একটা গাছের আড়ালে লুকুলো। দু-জন লোক বনের মধ্যে কি করচে। কিসের শব্দ হচ্চে যেন। শরৎ চুপি চুপি বললে, কারা দেখতে পাচ্চিস?

—না, শরৎ-দি চলো পালাই—

—পালাবো কেন? বাঘভাল্লুক তো নয়—তুই দাঁড়া না—

একটু পরে শরৎ আবার বললে, দেখেচিস মজা? রামলাল কাকার ছেলে সিদু আর ওপাড়ার জীব শুঁড়ির ভাই হরে শুঁড়ি।

হঠাৎ শরৎ কড়া গলায় সুর চড়িয়ে বললে, কে ওখানে?

দুপ-দুপ দ্রুত পদশব্দ। তারপর সব চুপচাপ।

শরৎ বললে, আয় তো গিয়ে দেখি—কি করছিল মুখপোড়ারা—

রাজলক্ষ্মী চেয়ে দেখলে শরতের যেন বনরঙ্গিণী মূর্ত্তি। ভয় ও সঙ্কোচ এক মুহূর্ত্তে চলে গিয়েছে তার চোখমুখ থেকে। রাজলক্ষ্মী ভয় পেয়ে বললে, ও শরৎ-দি, ওদিকে যেও না—পরে শরৎ নিতান্তই গেল দেখে সে নিজেও সঙ্গে সঙ্গে চললো। খানিকদূর গিয়ে দু-জনেই দেখলে

যেখানে উত্তর-দেউলের পূব কোণে একটা ভাঙ্গা পাথরে মুর্ত্তি পড়ে আছে ঘন লতাপাতার ঝোপের মধ্যে—সেখানে একটা লোহার শাবল পড়ে আছে, কারা খানিকটা গর্ত্ত খুঁড়েচে আর কতকগুলো মাটীতে পোঁতা ইট সরিয়েচে।

শরৎ খিল খিল করে হেসে উঠে বললে, মুখপোড়াদের বিশ্বাস গড়ের জঙ্গলে সর্ব্বত্র ওদের জন্যে টাকার হাঁড়ি পোঁতা রয়েচে। গুপ্তধন তুলতে এসেছিল হতচ্ছাড়া ড্যাকরারা, এরকম দেখে আসচি ছেলেবেলা থেকে। কেউ এখানে খুঁড়েচে, কেউ ওখানে খুঁড়েচে—আর সব খুঁড়বে কিন্তু লুকিয়ে। পাছে ভাগ দিতে হয়? যাক—শাবল খানা লাভ হয়ে গেল। চল্ নিয়ে চল—

রাজলক্ষ্মীও হেসে কুটিপাটি। বললে, ভারি শাবলখানা নিয়ে পালাতে পারলে না। তোমার গলা শুনেই পালিয়েছে—তোমাকে সবাই ভয় করে শরৎ-দি—

বনের পথ দিয়ে ওরা। আবার যখন দীঘির ঘাটে এসে পৌছলো, তখন বেলা বেশ পড়ে এসেচে। আর রোদ নেই ঘাটের সিঁড়িতে, তেঁতুল গাছের ডালে দু-একটা বাদুড় এসে ঝুলতে সুরু করেচে। ওরা তাড়াতাড়ি বাসন মেজে নিয়ে বাড়ীর দিকে চললো।

শরৎ বললে, এবার কিছু খা—তারপর বাড়ী গিয়ে বলে আয় খুড়ী-মাকে এখানে থাকবার কথা রাতে।

রাজলক্ষ্মী ব্যস্তভাবে বললে, না শরৎ-দি, সন্দের আর দেরী নেই। আমি আগে বাড়ী যাই। অনেকক্ষণ বেরেয়েচি বাড়ী থেকে, মা হয় তো ভাবচে—

—বোস আর একটু—একটু চা করি, খেয়ে যা—

শাবল ফেলে ওদের পালানো ব্যাপারটাতে শরৎ ও রাজলক্ষ্মী খুব মজা পেয়েচে। তাই নিয়ে হাসিখুসি ওদের যেন আর ফুরোনে চায় না।

রাজলক্ষ্মী বললে, তোমার সাহস আছে শরৎ-দিদি, আমি হোলে পালিয়ে আসতাম--

—ওই রকম না করলে হয় না, বুঝলি? সব সময় ভীতু হয়ে থাকলে সবাই পেয়ে বসে—আর কখনো ওরা আসবে না দেখিস।

—যদি আমার না আসা হয়, একলা থাকতে পারবে শরৎ-দি?

শরৎ হেসে বললে, কতবার তো থেকেচি। এমনিতেই বাবা এত রাত করে বাড়ী ফেরেন, এক একদিন আমার একঘুম হয়ে যায়। বাবার কি কোন খেয়াল আছে নাকি?

তারপর সে ঈষৎ লাজুক মুখে মুখ নীচু করে ব'ললে, বাবার জন্যে মন কেমন করচে—

—ওমা, সে কি শরৎ-দিদি! আজ তো জ্যাঠামশায় সবে গেলেন—

—সে জন্যে না। বিদেশে কোথায় থাবেন কোথায় শোবেন, উনি বাড়ী থেকে বেরুলেই আমার কেবল সেই ভাবনা।

—জলে তো আর পড়ে নেই? লোকের বাড়ী গিয়েই উঠেচেন তো—

—তুই জানিস নে ভাই—ওঁর নানান্ বাচবিচার। এটা খাবে না ওটা খাবে না—দুনিয়ার আদ্ধেক জিনিষ তাঁর মুখে রোচে না। আমায় যে কত সাবধানে থাকতে হয়, তা যদি জানতিস। পান থেকে চুণ খসলেই অমনি ভাতের থালা ফেলে উঠে গেলেন। আমার হয়েচে ওঁকে নিয়ে সব চেয়ে বড় ভাবনা। একেবারে ছেলে মানুষের মত।

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বললে, তোমার বুড়ো ছেলেটি শরৎ-দিদি—আহা, কোথায় গেল, মায়ের প্রাণ, ভাবনা হবে না?

শরতের চোখ ছলছল করে উঠলো। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললে, তাই এক এক সময় ভাবি ভগবান আমায় যেন এর মধ্যে টেনে নিও না। বুড়ো বয়সে বাবা বড় কষ্ট পাবেন। ওঁকে ফেলে আমার স্বর্গে

গিয়েও সুখ হবে না—উনি মারা যান আগে, তারপর আমি কষ্ট পাই দুঃখ পাই, যা থাকে আমার ভাগ্যে।

—আমি এবার যাই শরৎ-দি—সন্দের আর দেরি কি?

—তুই কিন্তু আসবি ঠিক—খুব চেষ্টা করবি, কেমন তো? একলা আমি থাকতে পারি, সেজন্যে না। দু জনে থাকলে বেশ একটু গল্পগুজব করা যেতো—মুখ বুজে এই নিবান্ধা পুরীর মধ্যে থাকতে বড় কষ্ট হয়।

রাজলক্ষ্মী চলে গেলে শরৎ সলতে পাকাতে বসলো—তারপর শাঁখ বাজিয়ে চৌকাঠে জলের ধারা দিয়ে তার অভ্যাস মত ছোট্ট একটী মাটীর প্রদীপ জ্বেলে নিয়ে উত্তর দেউলে সন্ধ্যাদীপ দিতে চললো। সঙ্গে দেশলাই নিয়ে গিয়ে দেউলে বসে প্রদীপ জ্বালাও চলে বটে, কিন্তু এদের বংশের নিয়ম ঘরের সন্ধ্যাদীপ থেকে জ্বালিয়ে নিয়ে যেতে হয় মন্দিরের প্রদীপ। তবে যদি ঝড়েবৃষ্টিতে পথে সেটা নিবে যায়, অগত্যা সেখানে বসেই জ্বালাতে হয়—উপায় কি?

উত্তর দেউলের পথে শরতের কেবলই মনে হচ্ছিল, আবার হয় তো ওরা সেই খানে খুঁড়তে আরম্ভ করেচে। সে একবার গিয়ে দেখবে নাকি? তা হোলে বেশ মজা হয়—

কথাটা মনে আসতেই শরৎ আপন মনেই হি-হি করে হেসে উঠলো।

—উঃ, শাবল ফেলেই ছুট্ দিলে! এ গুপ্তধন না তুললে নয় মুখপোড়াদের! ওদের জন্যে আমার বাপ ঠাকুরদাদা কলসী কলসী মোহর পুঁতে রেখে গিয়েচে। যদি থাকে তো আমরা নেবো, আমাদের জিনিস—তোরা মরতে আসিস কেন হতভাগারা?

শরৎ হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো এবং একটু অবাক হয়ে চেয়ে দেখলে একটা নতুন সিগারেটের বাক্স পড়ে আছে উত্তর-দেউলের পৈঠার ওপরেই। এ বনের মধ্যে সন্ধ্যাবেলা সিগারেট খেয়েচে কে? এখানকার

লোকে সিগারেট খাবে না, তাদের তামাক জোটে না সিগারেট তো দূরের কথা। বাক্সটা হেলাগোছা ভাবে ফেলা নয়, কে যেন তার যাবার পথে ইচ্ছে করে রেখেচে।

প্রদীপ দেখিয়ে এসে ও সিগারেটের বাক্সটা হাতে তুলে নিলে, খালি বাক্স অবশ্যি।

রাংতাটা আছে ভেতরে। বেশ পাওয়া গিয়েচে। সিগারেটের রাংতা বেশ জিনিস। তবে এ গাঁয়ে মেলে না, কে আর সিগারেট খাচ্চে।

শরতের হাত থেকে সিগারেটের বাক্সটা পড়ে গেল। তার মধ্যে একখানা চিঠি! শরৎ বিস্ময়ে ও কৌতূহলে পড়ে দেখলে লেখা আছে—

> আমি তোমার জন্যে জঙ্গলের মধ্যে ভাঙ্গা মন্দিরের পেছনে কতক্ষণ বসেছিলাম। তুমি এলে না। তোমাকে কত ভালবাসি, তা তুমি জানো না। যদি সাহস দেও লক্ষ্মীটি, তবে কালও এই সময় এই খানেই থাকবো।

শরৎ খানিকটা অবাক হয়ে থেকে চারিদিকে চেয়ে চেঁচিয়েই বললে, আ মরণ চুলোমুখো আপদগুলো! আচ্ছা, আবার চিঠি লেখা পর্য্যন্ত সুরু করেচে—হ্যাঁ? এ সব কি কম খ্যাংরার কাজ? কাল এসো, থেকো না জঙ্গলের মধ্যে থেকো। বঁটি দিয়ে একটা নাক যদি কেটে না নি তবে আমার নাম নেই—যমে ভুলে আছে কেন তোমাদের, ও মুখপোড়ারা?

রাগে গরগর করতে করতে শরৎ বাড়ী এসে দেখলে রাজলক্ষ্মী বসে আছে। বাড়ী থেকে সে একটা লণ্ঠন নিয়ে এসেচে। শরৎ খুসি হয়ে বললে, এসেচিস ভাই!

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে, না, একেবারে আসিনি শরৎ-দিদি। মা বললে বলে আয়, রাত্তিরে থাকা হবে না।

—সত্যি ?

—সত্যি শরৎ-দি। আমি কি বাজে কথা বলচি ?

—তবে তুই আর কষ্ট করে এলি কেন ?

—কথাটা বলতে এলাম শরৎ-দিদি। তুমি আবার হয়তো কি মনে করবে, তাই। রাজকন্তে তুমি।

রাজলক্ষ্মীর কথা বলার ধরণে শরতের সন্দেহ হোল। সে হেসে বললে, যাঃ আর চালাকি করতে হবে না। আমি আর অত বোকা নই—বুঝলি ?

রাজলক্ষ্মী খিল খিল করে হেসে উঠে বললে, কিন্তু তোমায় প্রথমটা কেমন ভাবিয়েছিলাম বলো না ?

শরৎ বললে, যাঃ, আমি গোড়া থেকেই জানি। খুড়ীমা এখানে রাত্তিরে থাকতে না দিলে তোকে আলো নিয়ে আসতে দিতেন না। ও রাজলক্ষ্মী...একটা মজা দেখবি ভাই ?

বলেই শরৎ চিঠিখানা রাজলক্ষ্মীর হাতে দিয়ে বললে, পড়ে গ্যাখ—

রাজলক্ষ্মী পড়ে বললে, এ কোথায় পেলে ?

—উত্তর-দেউলের সিঁড়ির ওপর একটা সিগারেটের খোলের মধ্যে ছিল।

—আশ্চর্য্য, আচ্ছা কে লিখলে বলো তো শরৎদি ?

—তাই যদি জানবো তাহলে তো একেবারে শ্রাদ্ধের চাল চড়িয়ে দিই তাদের—

—তুমি আগে যাদের কথা বলেছিলে—

—তারাই হবে হয় তো। নাও হতে পারে। সিগারেট খাবে কে এ গাঁয়ে।

—কাউকে দেখলে, কি পায়ের শব্দ শুনলে ?

—শরৎ সুর বদলে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, বাদ দে ও সব

কথা! বাবা নেই কিনা বাড়ীতে, বাবা না থাকলেই ওদের বিদ্ধি বাড়ে আমি জানি। যদি দেখতে পেতাম তবে না কথা ছিল!

রাজলক্ষ্মী বললে, আচ্ছা যদি আমি না আসতাম, তবে তুমি ভয় পেতে না শরৎ-দি, এই সব চিঠি পেয়ে—জ্যাঠামশায় নেই বাড়ী—

—দূর, কি আর ভয়! আমার ওসব গা-সওয়া হয়ে গিয়েচে—

—একলাটি তো থাকতে হোত?

—থাকিই তো। ভয় কোরে কি করবো? চিরদিনই যখন একা—

—তোমার বলিহারি সাহস শরৎ-দি! এই অরুণ্যি কি বনের মধ্যে—

—ঘরে বঁটি আছে, দা আছে—এগুক দিকি কে এগুবে শরৎ বামণীর সামনে—ঠাণ্ডা করে ছেড়ে দেবো না? কি খাবি বল রাত্রে—ও কথা যাক। ভাত না রুটি?

—যা হয় করো। তুমি তো ভাত খাবে না, তবে রুটিই করো—দু-জনে মিলে তাই খাবো।

—বাইরে বসে আটাটা মেখে ফেলি—

—তুমি যাও শরৎ-দি, আমি মাখচি আটা—

দু'জনে গল্পগুজবে রাঁধতে খেতে অনেক রাত করে ফেললে। তারপর দোর বন্ধ করে দু'জনে যখন শুয়ে পড়লো, তখন খুব সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেচে। বেশি রাত্রে শরৎ ঘুম ভেঙ্গে উঠে রাজলক্ষ্মীর গা ঠেলে চুপি চুপি বললে, ও রাজলক্ষ্মী, ওঠ্—বাইরে কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে যেন—

—রাজলক্ষ্মী ঘুমে জড়িত কণ্ঠে ভয়ের সুরে বললে, কোথায় শরৎ-দি?

—চুপ, চুপ, ওই শোন্ না—

রাজলক্ষ্মী বিছানায় উঠে বসে উৎকর্ণ হয়ে শোনবার চেষ্টা করেও কিছু শুনতে পেলে না !

শরৎ উঠে আলো জ্বাললে। তার ভয় ভয় করছিল। তবু সে সাহস করে আলো হাতে দোর খুলে বাইরে যাবার চেষ্টা করাতে রাজলক্ষ্মী ছুটে এসে ওর হাত ধরে বললে, খবরদার বাইরে যেও না শরৎ-দি. কার মনে কি আছে বলা যায় না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি—

শরৎ কিন্তু ওর কথা না শুনেই দোর খুলে দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়ালো। ফুট ফুট করচে জ্যোৎস্না, কেউ কোথাও নেই ! তবুও তার স্পষ্ট মনে হোল খানিক আগে কেউ এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তার কোন ভুল নেই।

হঠাৎ তার মনে পড়লো, আজ একাদশী তিথি !

তাদের এখানে প্রবাদ আছে, বারাহী দেবীর পাষাণ মূর্ত্তি ত্রয়োদশী থেকে পূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত তিন দিন, গভীর রাত্রিকালে নিজের জায়গা থেকে নড়ে'চড়ে বেড়ায় গড়বাড়ীর নির্জ্জন বনজঙ্গলের মধ্যে। সেই সময় যে সামনে পড়ে, তার বড় অশুভ দিন।

শরতের সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

যদি সত্যিই তাই হয় ?

যদি সত্যিই বারাহী দেবীর বুভুক্ষু ভগ্ন পাষাণ বিগ্রহ রক্তের পিপাসায় তাদেরই ঘরের আনেচে কানাচে শিকার খুঁজে বেড়াতে বার হয়ে থাকে ?

শরৎ ভয় পেলেও মুখে কিছু বললে না। ধীরভাবে ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করে দিলে।

রাজলক্ষ্মী কলসী থেকে জল গড়িয়ে খাচ্ছিল, বললে, কিছু দেখলে শরৎ-দি ?

—না কিছু না। তুই শুয়ে পড়।

• • •

পরদিন বৈকালের দিকে প্রভাস ও আর একটি তরুণ সুদর্শন যুবক হঠাৎ এসে হাজির।

রাজলক্ষ্মী তখন সবে কি একটা ঘরের কাজ সেরে দীঘির ঘাটে শরতের কাছে যাবার যোগাড় করেচে—এমন সময় ওদের দেখে জড়সড় হয়ে উঠলো।

প্রভাস বললে, খুকী, তুমি কি এ বাড়ীর মেয়ে? না, তোমাকে তো কখনো দেখিনি? বাড়ীর মানুষ সব গেল কোথায়?

রাজলক্ষ্মী সলজ্জমুখে বললে, শরৎ-দি দীঘির পাড়ে। ডেকে আনচি।

—হ্যাঁ গিয়ে বলো প্রভাস আর অরুণবাবু এসেচে।

শেষের নামটা উচ্চারিত হতে শুনে রাজলক্ষ্মীর মুখ তার নিজের অজ্ঞাতসারে রাঙা হয়ে উঠলো। সে জড়িত পদে কোনো রকমে ওদের সামনে থেকে নিজেকে সরিয়ে আড়ালে এনে এক ছুটে ঘাটের পাড়ে গিয়ে খবরটা দিলে শরৎকে।

শরৎ অবাক হয়ে বললে, তুই দেখে এলি?

—ও মা, দেখে এলাম না তো কি? এসো না—

শরৎ ব্যস্তভাবে দীঘির ঘাট থেকে উঠে এল। প্রভাস ততক্ষণ নিজেই মাদুর পেতে বসে পড়েচে ওদের দাওয়ায়। হাসিমুখে বললে, আবার এসে পড়লাম। এখন একটু চা খাওয়াও তো দিদি—

—বসুন প্রভাস-দা। এক্ষুনি চা করে দিচ্চি—

প্রভাস পকেট থেকে একটা কাগজের প্যাকেট বার করে বললে, ভাল চা এনেচি। আর এতে আছে চিনি—

আবার ওসব কেন প্রভাস-দা? আমরা গরীব বলে কি একটু চা দিতে পারিনে আপনাদের?

—ছিঃ অমন কথা বলতে নেই। সে ভেবে আনিনি, এখানে সব

সময় ভাল চা তো পাওয়া যায় না পয়সা দিলেও। আর এ চিনি সে চিনি নয়, এ চায়ে খাওয়ার আলাদা চিনি। ত্থাখো না—এ পাড়াগাঁয়ে কোথায় পাবে এ চিনি ?

শরৎ হাতে করে দেখলে চৌকো চৌকো লোবাঞ্চুসের মত জিনিসটা। এ আবার কি ধরণের চিনি ! কখনো সে দেখেই নি। সহর বাজারে কত নতুন জিনিসই আছে !

প্রভাস বললে, কাকাবাবু কোথায় গেলেন ?

—বাবা গিয়েচেন খাজনার তাগাদায়। দু-তিন দিন দেরী হবে ফিরতে।

প্রভাস হতাশ মুখে বললে, তিনি বাড়ী নেই ! এঃ তবে তো সব দিকেই গোলমাল হয়ে গেল।

—কেন কি গোলমাল ?

—আমি এসেছিলাম তোমাদের কলকাতা ঘুরিয়ে আনতে। মোটর ছিল সাথে। সেই ভেবেই অরুণকে সাথে নিয়ে এলাম।

—তাই তো, সে এখন কি করে হয় ?

—নিতান্তই আমার অদৃষ্ট।

—সে কি, আপনার অদৃষ্ট কেন প্রভাস-দা, আমাদের অদৃষ্ট।

—তা নয় দিদি, মুখে যাই বলো, প্রাচীন রাজবংশের মেয়েকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে সব দেখিয়ে বেড়ানোর মধ্যে যে আনন্দ আছে—তা কি সকলের ভাগ্যে ঘটে শরৎ দি ? বিশেষ করে তুমি আর কাকাবাবু যখন কখনো কলকাতাতে যাও নি।

—কোথাও যাই নি—তায় কলকাতায়।

অরুণ এবার কথা বললে। সে অনেকক্ষণ থেকে একদৃষ্টে শরতের দিকে চেয়েছিল। শরতের কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে অরুণ জিভ ও তালুর সাহায্যে একপ্রকার খেদসূচক শব্দ উচ্চারণ করে বললে, ও ভাবলে

একদিকে কষ্ট হয়, একদিকে আনন্দ হয়। আপনার এই সরলতার তুলনা নেই। অভিজ্ঞতা সব জায়গাতেই যে পুজো পাবে তা পাবে না। অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক সময় অভিজ্ঞতার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি।

প্রভাস বললে, তাই তো, বড ভাবনায় পড়া গেল দেখচি।

—ভাবনা আর কি, অন্য এক সময় নিয়ে যাবেন প্রভাস-দা।

প্রভাস কিছুক্ষণ বসে ভেবে ভেবে বললে, আচ্ছা, কোনো রকমেই এখন যাওয়া হয় না? ধরো তুমি আর কাউকে নিয়ে না হয় আমাদেরই সঙ্গে গেলে—

আমি একাও আপনার সঙ্গে যেতে পারি প্রভাস-দা। আমার মন তেমন নীচ নয়। কিন্তু সে জন্যে নয়—বাবার বিনা অনুমতিতে কোথাও যেতে চাইনে। যদিও আমার মনে হয় আপনি নিয়ে গেলে বাবা তাতে অমত করবেন না।

অরুণ এবার বললে, তবে চলুন না কেন, গাড়ী রয়েচে—কাল সকালে বেরুলে বেলা বারোটার মধ্যে কলকাতা পৌছে যাওয়া যাবে। ইচ্ছে করেন, কাল রাতেই আবার আপনাকে এখানে পৌছে দেবো। কি বলেন প্রভাসবাবু?

প্রভাস ঘাড় নেড়ে বললে, তা তো বটেই। তাই চলো যাওয়া যাক —অবিশ্যি যদি তোমার মনের সঙ্গে খাপ খায়। কাল সকাল আমরা আসবো এখন আবার—

এরা উঠে গেলে রাজলক্ষ্মী দেখলে শরৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েচে। কি যেন ভাবচে আপন মনে। কিছুক্ষণ পরে শরৎ নিজেই বললে, তুই তো সব শুনলি, তোর কি মনে হয়—যাবো ওদের সঙ্গে? খুব ইচ্ছে করেচে। কখনো দেখিনি কলকাতা সহর—

—তোমার ইচ্ছে শরৎ-দি। তুমি আমার চেয়ে অনেক বুদ্ধিমতী।

—তুই যাবি?

—আমার যেতে খুব ইচ্ছে—কিন্তু আমার যাওয়া হবে না শরৎ-দি। বাবা মা যেতে দেবে না।

—আমার সঙ্গে যাবি, এতে আর দোষ কি?

—তুমি যদি যাও, লোকে কোনো কথা ওঠাতে সাহস করবে না শরৎ-দি। কিন্তু আমার কেউ ছেড়ে কথা বলবে না। শেষকালে বাপ মা মুস্কিলে পড়ে যাবে বিয়ে দেবার সময়।

—বাবাঃ, এর মধ্যে এত কথা আছে? ধন্যি সব মন বটে।

—তুমি থাকো গাঁয়ের বাইরে। তা ছাড়া তুমি যে বংশের মেয়ে, তোমার নামে এ অঞ্চলের লোকে কিছু রটাতে সাহস করবে না। আমার বেলায় তা তো হবে না!

আরও কিছুক্ষণ পরে রান্না শেষ হয়ে গেল। শরৎ রাজলক্ষ্মীকে খেতে দিয়ে নিজে একটা বাটিতে চিঁড়ে ভাজা তেল নুন দিয়ে মেখে নিয়ে খেতে বসলো।

রাজলক্ষ্মী খেতে খেতে বললে, ও সাত বাসি চিঁড়ে ভাজা কেন খাচ্চ শরৎ দি? আমার জন্যে তো সেই কষ্ট করলেই, রান্না করলে, এখন নিজের না হয় খানকতক পরোটা কি রুটি করে নিলেই পারতে?

শরৎ সলজ্জ হেসে বললে, ময়দা আর ছিল না। প্রভাস-দা আর অরুণবাবুকে তখন দু-খানা করে পরোটা করে দিলাম—যা ছিল সব ফুরিয়ে গেল।

—আমায় বললে না কেন শরৎ-দি? ওই তোমার বড় দোষ। আমায় বললে আমি বাড়ী থেকে নিয়ে আসতাম।

—থাক গে, খাওয়ার জন্যে কি? এখন কলকাতায় যাওয়ার কি করা যায় বল। আর শোন্ ওই অরুণবাবু, দেখলি তো? পছন্দ হয়? এবার তবে কথাটা পাড়ি প্রভাস-দা'র কাছে?

রাজলক্ষ্মী জবাব দিতে একটু ইতস্ততঃ করে সঙ্কোচের সঙ্গে বললে,

তা তোমার ইচ্ছে। কিন্তু ও আমাদের কখনো হয়? বলে বামন হয়ে চাঁদে হাত—

—যদি ঘটিয়ে দিতে পারি?

রাজলক্ষ্মী মনে মনে ভাবলে শরৎ-দি'র বয়েসই হয়েছে আমার চেয়ে বেশি। কিন্তু এদিকে সরলা। অনেক জিনিসই আমি যা বুঝি, ও তাও বোঝে না। চিরকাল গাঁয়ের বাইরে জঙ্গলের মধ্যে বাস করে এলো কি না।

সে মুখে বললে, দিতে পারো ভালই তো। বেশ কথা।

—ঘটকালির বখশিস্ দিবি কি?

—যা চাইবে শরৎ-দি।

—দেখিস তখন যেন আবার ভুলে যাস নে—

রাজলক্ষ্মীর খাওয়ার প্রবৃত্তি চলে গিয়েছিল শরৎকে বাসি চিঁড়ে ভাজা খেতে দেখে। তার ওপর যখন আবার শরৎ গরম দুধের বাটি এনে তার পাতের কাছে নামাতে গেল, সে একেবারে পিঁড়ির ওপর থেকে উঠে পড়লো। দুধটুকু থাকলে তবুও শরৎ-দি খেতে পাবে।

—ও কি, উঠলি যে?

রাজলক্ষ্মী ভাল করেই চেনে শরৎকে। সে যদি এখন আসল কথা বলে, তবে শরৎ ও দুধ ফেলে দেবে, তবু নিজে খাবে না। সুতরাং সে বললে, আর আমার খাওয়ার উপায় নেই শরৎ-দি, পেট খুব ভরে গিয়েছে। মরবো নাকি শেষে একরাশ খেয়ে?

—দুধ যে তোর জন্যে জ্বাল দিয়ে নিয়ে এলাম? কি হবে তবে?

রাজলক্ষ্মী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, কি হবে তা কি জানি। না হয় তুমি খেয়ে ফেল ওটুকু। আমার আর খাওয়ার উপায় দেখচি নে। জানোই তো আমার শরীর খারাপ, বেশি খেতে পারি নে।

অগত্যা শরৎকেই দুধটুকু খেয়ে ফেলতে হোল।

পর দিন সকালেই প্রভাস ও অরুণ আবার এসে হাজির।

প্রভাস বললে, কি ঠিক করলে দিদি ?

—ও এখন হয়ে উঠবে না প্রভাস-দা। আপনারা যাবেন না, বসুন। চা আর খাবার করে দি, বসে গল্প করুন।

শরৎ কাল রাত্রে ভেবে ঠিক করেচে রাজলক্ষ্মীর বিবাহের প্রস্তাবটা সে আজই প্রভাসের কাছে উত্থাপিত করে দেখবে কি দাঁড়ায়। রাজলক্ষ্মীকে এজন্যে সে সরিয়ে দেবার জন্যে বললে, ভাই, তোদের বাড়ী থেকে এত কটা আটা কি ময়দা দৌড়ে নিয়ে আয় তো ? কাল রাত্রে আমাদের ময়দা ফুরিয়েচে। প্রভাস-দা ও অরুণবাবুকে চায়ের সঙ্গে দু-খানা পরোটা ভেজে দিই।

প্রভাস যেন একটু হতাশের সুরে বললে, তা হোলে যাওয়া হোল না তোমার ? এবার গেলেই বেশ হোত।

শরৎ বললে না এবার হবে না।

—তোমার বন্ধুটিকে নিয়ে চলো না কেন ?

—কে ? রাজলক্ষ্মীর কথা বলচেন ? আচ্ছা, একটা কথা বলবো ? রাজলক্ষ্মীকে কেমন লাগলো আপনাদের ?

প্রভাস একটু বিস্ময়ের সুরে বললে, কেন বল তো ? ভালই লেগেচে।

—গরীব বাপ-মা, বিয়ে দিতে পারচে না। ওর জন্য একটা পাত্র দেখে দিন না কেন প্রভাস-দা ? বড্ড উপকার করা হবে। একটা কথা শুনুন প্রভাস-দা—

প্রভাস শরতের পিছু পিছু বাড়ীর পিছনদিকে গেল।

শরৎ বললে, আচ্ছা প্রভাস-দা, অরুণবাবুর সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর বিয়ে দিন না কেন ঘুটিয়ে ? পাল্টি ঘর। চমৎকার হবে—

প্রভাস যেন ঠিক এধরণের কথা আশা করে নি শরতের মুখ থেকে। সে আশাহতের সুরে বললে, তা—তা দেখলেও হয়।

শরতের যদি কিছুমাত্র সাংসারিক ও সামাজিক জ্ঞান থাকতো তবে প্রভাসকে চিনে নিতে সে পারতো এই এক মুহূর্ত্তেই। কিন্তু শরৎ যদিও বয়সে যুবতী, সারল্যে ও ব্যবহারিক অনভিজ্ঞতায় সে বালিকা। সুতরাং বয়সে সে প্রভাসের স্বরূপ ধরতে পারলে না।

সে আরও আগ্রহের সঙ্গে বললে—তাই দেখুন না প্রভাস-দা? আপনি করলে অনেক সহজ হয়ে যায় কাজটা—

প্রভাস অন্যমনস্কভাবে কি একটা কথা ভাবছিল। দু-একবার যেন কোনো একটা বলবার জন্যে শরতের মুখের দিকে চাইলেও—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বললে না।

দু-জনকে চা করে দিয়ে শরৎ পথের দিকে চেয়ে আছে—এমন সময় দেখা গেল রাজলক্ষ্মী ফিরে আসচে। সে দাওয়া থেকে নেমে রাজলক্ষ্মীর কাছে গিয়ে বললে—এনেছিস ময়দা? দে আমার কাছে।

—আমি যাই শরৎ-দি, মা বলে দিয়েচে বাড়ী ফিরতে—

—কেন বল তো? প্রভাস-দারা এখানে বসে আছে বলে?

রাজলক্ষ্মী অপ্রতিভ মুখে বললে—তাই শরৎ-দি, জানোই তো, আমরা গরীব, এখানে ওদের সঙ্গে বসে থাকলে হয়তো কথা উঠবে। মা বড় ভয় করে ওসব।

—তা হোলে তুই যা—গিয়ে মান বজায় রাখ্—

রাজলক্ষ্মী হাসতে হাসতে চলে গেল।

প্রভাসদের খাবার করে দিতে বেলা প্রায় আটটা বেজে গেল। ওরা উঠতে যাবে এমন সময় শরৎ গড়ের খালের দিকে চেয়ে আহ্লাদের সঙ্গে বলে উঠলো—বাবা আসচেন! প্রভাস ও অরুণ দুজনেই যেন চমকে

উঠে সেদিকে চেয়ে দেখলে। ওদের মুখ দেখে মনে হবার কথা নয় যে কেদারের অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্ত্তনে তারা খুব খুশী।

তবুও প্রভাস এগিয়ে গিয়ে হাসিমুখে কেদারের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। কেদার আনন্দের সঙ্গে বলে উঠলেন—এই যে প্রভাস কখন এলে? ভালো সব?...আমি—হ্যাঁ—তাই বেরিয়ে ছিলাম বটে। সাংকিনী আর মাকড়ার বিলে বাচ্ হচ্চে খবর পেলাম পথেই। খাজনা আদায় করতে যখন যাওয়া—আর সবই জেলে প্রজা—বাচ্ শেষ না হোলে কাউকে বাড়ী পাওয়া যাবে না তাও বটে—আর মস্ত কথা হচ্চে বাচ্ না মিটে গেলে ওদের হাতে পয়সা আসবে না। তাই ফিরে এলাম।

প্রভাস বললে, ভালই হলো। শরৎ তো ছোটবোনের মত—আপনাদের কলকাতা ঘুরিয়ে নিয়ে আসবো বলে মোটর এনেছি এবার। আপনি ছিলেন না বলে একটু মুস্কিল ছিল। শরৎ-দি বলেছিল যাবে। আমার সঙ্গে যাবে এ আর বেশি কথা কি? নিজের দাদার মত—তবুও আপনি এলেন—বড় ভালই হোল। কাল সকালে চলুন কাকাবাবু কলকাতায়

শরৎ প্রভাসের কথা শুনে একটু অবাক হয়ে ভাবলে—কই, সে কখন প্রভাস-দা'র সঙ্গে কলকাতায় যাবে বললে? প্রভাস-দা'র ভুল হয়েছে শুনতে—কিন্তু সে তো আজ দু'বার তিনবার বলেচে তার যাওয়া হবে না।

কেদার বললেন, তো বেশ কথা। চল না, ভালোই তো! অনেক-কাল থেকে কলকাতায় যাবো যাবো ভাবি তা হয়ে ওঠে না। মন্দ কি?

প্রভাস ও অরুণ একসঙ্গে খুশীর সঙ্গে বলে উঠলো—কাল সকালেই চলুন তবে! সে কথা তো আমরাও বলচি।

—কখন গিয়ে পৌঁচবো।

—বেলা বারোটার মধ্যে। কোনো কষ্ট হবে না আপনাদের যাতে সব রকম সুবিধে হয়—

এখানে কাল সকালে তোমরা খাবে—খেয়ে গাড়ীতে ওঠা যাবে

শরৎ বাবার অনুরোধে যোগ দিয়ে বললে হ্যাঁ প্রভাস-দা, অরুণ বাবুকে নিয়ে কাল সকালে এখানেই খাবেন। না, কোনো কথা শুনবো না। এখানে খেতেই হবে—

প্রভাস বললে, রাজলক্ষ্মী বলে সেই মেয়েটি যাবে না কি? তারও যায়গা হয়ে যাবে। বড় গাড়ী।

শরৎ বললে, না, তার যাবার সুবিধে হবে না। আমায় সে বলে গেল এই মাত্র।

প্রভাস বললে, তা হোলে কাকাবাবু কাল সকালেই আসবো তো?

—হ্যাঁ, এখানে তোমারা খাবে যে সকালে। তারপর রওনা হওয়া যাবে। অরুণকেও নিয়ে এসো—

দুপুরের পরে রাজলক্ষ্মী এল। শরৎ দাওয়ায় বসে পুরানো টিনের তোরঙটা থেকে তার ও বাবার কাপড় বার করতে ব্যস্ত। রাজলক্ষ্মীকে দেখে বললে এই যে আয় রাজলক্ষ্মী, সব কাপড়ই ছেঁড়া, যেটাতে হাত দিই। আমার তবু দু-খানা বেরিয়েচে, বাবার দেখচি আস্ত কাপড় বাক্সে একখানাও নেই। কি নিয়ে যে যাবেন কলকাতায়—

—তা হোলে যাচ্চ সত্যিই শরৎ-দি? কাকাবাবু কোথায়?

—যাই, একবার বেড়িয়েই আসি। বসে বসে বাবার কাপড়গুলো এখন সেলাই করবো—কেনবার পয়সা নেই যে নতুন একজোড়া ধুতি কিনে নেবো—বেশি ছেঁড়া নয়, একটু আধটু সেলাই করলে কেউ টেরও পাবে না। বাবা নেই বাড়ী। এই মাত্র পাড়ার দিকে গেলেন।

শরতের মনে খুব আনন্দ হয়েচে বাইরে বেড়াতে যাবার এই সুযোগ পেয়ে। সে বসে বসে কেবল সেই গল্পই করতে লাগল রাজলক্ষ্মীর কাছে। কতকাল আগে তার শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিল—ভাল মনেও পড়ে না—সে-ও তো বেশি দূরে নয়, টুঙি-মাজদে গ্রামের কাছে বল্লভপুরের ভাদুরীদের বাড়ী। মাজদিয়া ষ্টেশনে নেমে তিন ক্রোশ গরুর গাড়ীতে গিয়ে কি একটা ছোট্ট নদীর ধারে। তাদেরও অবস্থা খারাপ, আগে একসময় ও-অঞ্চলের ভাদুরীদের নামডাক ছিল, সে নাকি অনেককাল আগে। এখন সতেরো সরিকে ভাগ হয়ে আর সবাই মিলে বাড়ী বসে খেয়ে বেজায় গরীব হয়ে পড়েচে।

রাজলক্ষ্মী বললে, সেখানে তোমায় নিয়ে যায় না শরৎ-দি ?

—কে নিয়ে যাবে ভাই ?

—তোমার দেওর ভাসুর নেই ?

—আপন ভাসুরই তো রয়েচেন। হোলে হবে কি, তাঁর বেজায় গুষ্ঠী পাল্লা—সাত মেয়ে, পাঁচ ছেলে—নিজের গুলো সামলাতে পারেন না—খেতে দিতে পারেন না—আমাকে নিয়ে যাবেন। আজ তেরো বছর কপাল পুড়েচে, কখনও একখানা থান কাপড় দিয়ে খোঁজ করেননি আর খোঁজ করলেও কি হোত, আমি কি বাবাকে ফেলে সেখানে গিয়ে থাকতে পারি ? সে গাঁয়ে আমার মনও টেঁকে না।

—যদি এখন তারা নিতে আসে শরৎ-দি ?

—আমি ইচ্ছে করে যাইনে—তবে ভাসুর যদি পেড়াপীড়ি করেন —না গিয়ে আর উপায় কি ?

—কতদিন থাকতে পারো ? বলো না শরৎ-দি ?

—কেন বল্‌তো আজ আবার তুই আমার শ্বশুরবাড়ী নিয়ে পড়লি কেন ?

রাজলক্ষ্মী মুখে আঁচল দিয়ে দুষ্টুমির হাসি হেসে উঠলো। তারপর বল্লে, দাও গুছিয়ে দিই কি জিনিসপত্তর আছে—মা বলছিল—

—কি বলছিলেন খুড়ীমা?

—ভাগ্যিস্ কাকাবাবু এসে গিয়েচেন তাই। নইলে তোমার একা যাওয়া উচিত হোত না প্রভাসবাবুর সঙ্গে—

শরতের চোখ দুটি যেন ক্ষণ কালের জন্যে জ্বলে উঠলো। মুখের রং গেল বদলে—রাজলক্ষ্মী জানে শরৎ-দিদি রাগলে ওর মুখ রাঙা হয়ে ওঠে আগে। রাজলক্ষ্মী ভয় পেল মনে মনে, হয় তো তার এ কথা বলা উচিত হয়নি, কিন্তু বলতে তাকে হবেই শরৎ-দির ভালোর জন্যে। না বলে সে পারে না। কতবার তার মনে হয়েচে শরৎ-দিদি তার ছোট বোন, সে-ই এই সংসারানভিজ্ঞা, বালিকাপ্রকৃতির দিদিকে সব বিপদ থেকে, কলঙ্ক থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে বেড়াবে।

শরৎ কড়া সুরে বল্লে, কেন উচিত হোত না, একশো বার হোত। খুড়ীমাকে গিয়ে বোলো রাজলক্ষ্মী, শরৎ যেখানে ভাল ভাবে সেখানে আপনার লোকের মতই ব্যবহার করে—পর ভাবে না। তার মন যেখানে সায় দেয় সেখানে যেতে তার এতটুকু ভয় নেই—আমি কারো কথা—

রাজলক্ষ্মী সভয়ে বল্লে, ওকি শরৎ-দি, তোমার পায়ে পড়ি শরৎ-দি, অমন চটে যেও না ছিঃ—

—তবে তুই এমন কথা বলিস কেন, খুড়ীমাই বা কেন বলেন? তিনি কি ভাবেন—

—শোনো আমার কথা। মা সে কথা বলে নি। কিন্তু একা মেয়েমানুষ যদি বিপদে পড় তখন তোমায় দেখবে কে? সেই কথাই মা বলছিল। তুমি যত ভাল ভাবো লোককে সকলেই অত ভাল নয়। তুমি সংসারের কি বোঝ? মার বয়েস তোমার চেয়ে তো কত বেশি—

সেদিক থেকে মা যা বলেচে মিথ্যে বলে নি। লক্ষ্মী দিদি, অমন রাগে না, রাগলেই সংসারে কাজ চলে? আমি তোমায় কত ভালবাসি, মা কত ভালবাসে—তা তুমি বুঝি জানো না? মা আমায় গাঁয়ে কারোর বাড়ী যেতে দেয় না—কিন্তু তোমাদের বাড়ী আসতে চাইলে কখনো কোন আপত্তি করে নি।

শরতের রাগ ততক্ষণ চলে গিয়েচে। সে রাজলক্ষ্মীর হাত ধরে বল্লে, কিছু মনে করিসনে রাজি—

—না, মনে তো করি নে, আমি জানি শরৎদি ছেলেমানুষের মত, এই রেগে উঠলো, এই জল হয়ে গেল। রাগ তোমার বেশিক্ষণ শরীরে থাকে না—গঙ্গাজলে ধোয়া মন যে! সাধে কি বড়বংশের মেয়ে বলে তোমাকে শরৎ-দি?

শরৎ সলজ্জ-মুখে বললে, যা যা আর বকিস নে—থাম্ তুই।

এই সময় দূর থেকে কেদারকে আসতে দেখে রাজলক্ষ্মী বললে, কাকাবাবু আসচেন, শরৎদি—কথা থাক্, কি কি কাজ করতে হবে, কি গুছিয়ে দিতে হবে বলে দাও।

—কি আর গুছিয়ে দিবি! দু-পাচ দিনের জন্যে তো যাওয়া। হ্যারে উত্তর-দেউলে সন্দে-পিদিম দেওয়ার জন্যে বামী বাগ্দীকে ঠিক করে দিতে পারবি? আমি এসে তাকে চার আনা পয়সা দেবো।

রাজলক্ষ্মী বল্লে, বলে দেখবো—কিন্তু সে রাজি হবে না। সন্দে বেলা সে ঘেঁসবে উত্তর-দেউলের অরুণ্যি বিজেবনে? বাপ্ রে! তার চেয়ে এক কাজ করা যাক না কেন? আমি তোমার সন্দে দেবো রোজ রোজ—

শরৎ বিস্মিত হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, তুই দিবি সন্দে-পিদিম—উত্তর-দেউলে?

রাজলক্ষ্মী হেসে বল্লে, কেন হবে না? পানুকে সঙ্গে নিয়ে আসবো

—আর সন্ধের একঘণ্টা আগে আলো জ্বেলে রেখে চলে যাবো। তোমাদের ঘরবাড়ীও তো দেখাশুনো করতে হবে আমার? অমনি দিয়ে যাবো পিদিম জ্বেলে।

—তাহলে তো বেঁচে যাই রাজলক্ষ্মী। ওই একটা মস্ত ভাবনা আমার তা জানিস? মনে মনে ভাবি, আমি বেঁচে থাকতে পূর্ব্বপুরুষের দেউলে আলো জ্বালাব না—তা কখনই হতে দেবো না প্রাণ ধরে। আর একটা কথা শিখিয়ে দি, যখন পিদিম হাতে নিয়ে দেউলে যাবি—তখন বেতবনের জঙ্গলে বারাহী দেবীর যে ভাঙ্গা মূর্ত্তি আছে সেখানটাতে একবার উদ্দেশ্যে পিদিমটা তুলে দেখাবি।

রাজলক্ষ্মীর মুখে কেমন ভয়ের ছায়া নামলো—সে বললে, ওমা, ওই ভাঙ্গা কালীর মূর্ত্তি। ওখানে যেতে ভয় করে।

—কালী নয়—ও বারাহী বলে এক পুরোনো আমলের দেবীমূর্ত্তি। বহুকাল পুজোও হয়নি। কেমন চড়কের সময় সন্নিসিরা একবার ওখানে এসে নেচে যায় দেখিসনি?

—তা যাক নেচে। আমি ওখানে যেতে পারবো না শরৎ-দি। মাপ করো।

—তুই যদি না পারিস্—তবে আমার যাওয়া হবে না। আঃ বারাহী দেবীকে ফেলে রেখে যেতে পারবো না।

রাজলক্ষ্মী বললে, না দিদি, সত্যি কিছু ভাল লাগচে না। তুমি চলে যাবে, আমার মন কাঁদবে সত্যিই। তাই বলছিলাম পারবো না, যদি তোমার যাওয়ার বাধা দিতে পারি। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে, এ কাজ ভাল না। শরৎ-দিদি—কখনো কোনো জায়গায় যায় না, কিছু দেখেনি—ওই যাক্। ঘুরে আসুক।

কেদার গামছা পরে পুকুরে স্নান করে এসে বললেন, ওমা শরৎ, একটা ডাব খাওয়াতে পারবি?

—না বাবা একটা ছোট্ট ডাব ওবেলা ঠাকুরদের দিয়েচি—এবেলা আর কিছু নেই। পুণ্য বাগ্দীকে ডেকে নিয়ে আসবো?

না থাক্ মা, সব গুছিয়ে নিয়ে রাখো—রাজলক্ষ্মী মা এলি কখন? তা তুই একটু সাহায্য কর না!

—ও তো করচেই বাবা। ও উত্তর-দেউলে পিদিম দেবে পর্য্যন্ত বলচে। এ গাঁয়ের মধ্যে আর কেউ এতদূর আসেও না, খোঁজখবরও নেয় না। ও আছে তাই তবু মানুষের মুখ দেখতে পাই।

পরদিন প্রভাসের মোটর সামনের বারুইদ'র বিল পার হয়ে যাওয়ার পরে কেদারের মুখে প্রথম কথা ফুটলো। পেছনের সিটে তিনি মেয়েকে নিয়ে বসেচেন—সামনের সিটে বসেচে অরুণ ও প্রভাস—অরুণ গাড়ী চালাচ্চে।

কেদার মাঝে মাঝে বিস্ময়সূচক দু-একটা রব করছিলেন এতক্ষণ, এইবার মেয়েকে সম্বোধন ক'রে প্রথম কথা বললেন।

—ও শরৎ, কি জোরে যায় বটে মটোর গাড়ী, বারুইদ'র বিল গড়শিবপুর থেকে পাক্কা চার ক্রোশ রাস্তা। হেঁটে আসলে দু-ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার কম পৌছুনো যায় না—আর এই ছাখো, চোখের পাতা পাল্টাতে না পাল্টাতে এসে হাজির বারুইদ'র বিলে—

—হাজির কি বাবা, বিল পেরিয়েও তো গেল।

—ও মানুষ না পাখী? কি জোরেই যায় তাই ভাবচি।

—হ্যাঁ বাবা, কলকাতা কতদূর বললে প্রভাস-দা?

—বেলা বারোটা কি একটার মধ্যে যাবো বলচে। ত্রিশ ক্রোশ হবে এখান থেকে কলকাতা।

প্রভাস সামনের সিটে বসে মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে বললে, কাকাবাবু কখনো কলকাতায় এসেছিলেন ?

কেদার বললেন, তা দু-বার এর আগে আমি কলকাতা ঘুরে এসেছি। তবে সে অনেক দিন আগের কথা। প্রায় দু'যুগ হোল।

অরুণ বললে, সে কলকাতা আর নেই, গিয়ে দেখবেন। শরৎ-দি, আপনি কখনো যান্‌নি কলকাতায় এর আগে ?

—নাঃ, আমি কোথাও যাই নি..

—কলকাতাতেও না ?

—কলকাতা তো কলকাতা! বলে কখনো রাণাঘাট কি রকম সহর তাই দেখিনি! রাজী হয়ে গেল তাই বাবা, নইলে আমার আসা হোত না। পিদিম দেখানোর জন্যেই তো যত গোলমাল।

আশ্চর্য্যের ওপর আশ্চর্য্য। ধর্ম্মদাসপুরে এসে গাড়ী দাঁড়িয়েছে ছায়ায়। এখনি এল ধর্ম্মদাসপুরে। কেদার খাজনা আদায় করতে বেরিয়েচেন সকালে—বেলা এগারোটার কমে ধর্ম্মদাসপুরে পৌছুতে পারেন নি। আর সেই ধর্ম্মদাসপুর পার হয়ে গেল বড় জোর চল্লিশ মিনিটে। কি তারও কমে।

শরৎকে বললেন, মা, এই ছাখো ধর্ম্মদাসপুর গেল, সেই যে একবার ওল এনেছিলাম মনে আছে ? সে এখান থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম। কি জোরে যাচ্ছে একবার ভেবে ছাখো দিকিন্?···হ্যাঁ, গাড়ী বের করেচে বটে সায়েবেরা!

শরৎ ক্রমাগত ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন করতে লাগলো, বাবা—আর কত দেরী আছে কলকাতা? কতক্ষণে আমরা কলকাতা পৌছবো ?

প্রায় ঘণ্টা চারেক একটানা ছোটার পরে একটা সহর বাজারের মত জায়গায় গাড়ী ঢুকলো। কেদার বললেন, এটা কি জায়গা ?

প্রভাস বললে, এটা বারাসাত। আর বেশি দূর নেই কলকাতা। এখান থেকে একটু চা খেয়ে নেবেন কাকাবাবু?

কেদার বললেন, কেন এখানে কি তোমার কোনো জানাশুনো লোকের বাড়ী আছে নাকি? চা খাবে কোথায়?

—না, জানাশুনো কেউ নেই। দোকানে খাবো। চায়ের দোকান আছে অনেক—

—না বাপু। তোমারা খাও, আমি দোকানের চা কখনও খাইনি ও আমার ঘেন্না করে। আমি বরং একটু তামাক ধরিয়ে খাই। অনেকক্ষণ তামাক খাওয়া হয়নি।

দোকানের চা শরৎও খেলে না। অরুণ ও প্রভাস নিজেরা গাড়ীর কাছে চা আনিয়ে খেলে। কেদার আরাম করে হুঁকো টানতে টানতে বললে, চা ভালো?

প্রভাস ব্যস্ত হয়ে উঠে বললে, কেন, মন্দ না। খাবেন, আনাবো?

—না, আমি সে জন্যে বলচি নে। আমি দোকানের চা কখনো খাই নি, ও খাবোও না কখনো। তোমারা খাও। আমরা সেকেলে মানুষ, আমাদের কত বাচবিচার।

গাড়ী ছেড়ে যশোর রোড দিয়ে অনেকখানি এসে একটা বড় লোকের বাগানবাড়ীর মধ্যে ঢুকলো। ফটক থেকে লাল সুরকির রাস্তা সামনের সুদৃশ্য অট্টালিকাটির গাড়ী-বারান্দাতে গিয়ে শেষ হয়েচে। পথের দু-ধারে এরিকা পামের বড় বড় চারা গাছ, ক্রোটন, শেফালি, চাঁপা, আম, গোলাপজাম প্রভৃতি নানারকম গাছ।

প্রভাস বললে, আপনারা নামুন—এবেলা এখানে থাকবেন আপনারা। এটা অরুণদের বাগানবাড়ী, ওর দাদামশায়ের তৈরী বাড়ী এটা। কেদার ও শরৎ দু-জনেই বাড়ী দেখে আনন্দে ও বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলেন। এমন বাড়ীতে বাস করবার কল্পনাও কখনো

তাঁরা করেন নি। মার্বেল পাথরে বাঁধানো মেজে, ছোট বড় আট-দশটা ঘর। বড় বড় আয়না, ইলেকট্রিক পাখা, আলো, কৌচ, কেদারা। তবে দেখে মনে হয় এখানে যেন কেউ বাস করেনি কোনো দিন, সব জিনিসই খুব পুরোনো—দু-একটা ঘর ছাড়া অন্য ঘরগুলোতে ধুলো, মাকড়সার জাল বোঝাই।

কেদার কথাটা বললেন প্রভাসকে।

প্রভাস বললে, ওর দাদাবাবু সৌখীন লোক ছিলেন, তিনি মারা গিয়েচেন আজ বছর কয়েক। এখন মাঝে মাঝে অরুণেরা আসে—সব সময় কেউ থাকে না।

শরৎ বললে, এটাই কি কলকাতা প্রভাস-দা?

—না, এটাকে বলে দমদমা। এর পরেই কলকাতা সুরু হোল। তোমরা বিশ্রাম কর—ওবেলা কলকাতা বেড়িয়ে নিয়ে আসবো। এখুনি ঝি আসবে, যা দরকার হয় বলে দিও ঝিকে—সব গুছিয়ে এনে দেবে। ঠাকুর আসবে এখন—

শরৎ বললে, কি ঠাকুর?

—রান্না করতে আসবে ঠাকুর?

—বাবা ঠাকুরের হাতে রান্না খেতে পারবেন না প্রভাস-দা, ঠাকুর আসবার দরকার নেই। আমি আছি তবে কি জন্যে?

—কলকাতায় এলে একটু বেড়াবে না, বসে বসে রান্না করবে গড়শিবপুরের মত? বাঃ—

—তা হোক্ গে। আমার রান্না করতে কতক্ষণ যাবে বলুন তো? ক'জন লোকের রান্না করতে হবে?

প্রভাস ও অরুণ শরতের প্রশ্ন শুনে হেসে বললে—ক'জনের লোকের রান্না আবার। তোমাদের দু-জনের, আবার কে আসবে তোমার এখানে খেতে? তুমি তো আর রাঁধুনী বামনী নও যে দেশ শুদ্ধু লোকের

রেঁধে বেড়াবে? আচ্ছা, আমরা এখন আসি কাকাবাবু বিকেলে ছ'টার সময় আবার আসবো। [illegible] লেনে আমাদের যে বাড়ী আছে সেখানে নিয়ে যাবো ওবেলা।

ওরা গাড়ী নিয়ে চলে গেলে কেদার আর একবার তামাক সাজতে বসলেন।

শরৎ চারিদিকে বেড়িয়ে এসে বললে, বাঃ, চমৎকার জায়গা। ওদিকে একটা বাঁধাঘাটওয়ালা পুকুর। দেখবে এসো না বাবা? তোমার কেবল তামাক খাওয়া আর তামাক খাওয়া? এই তো একবার খেলে বারাসাত না কি জায়গায়?

কেদার অগত্যা উঠে মেয়ের পিছু পিছু গিয়ে পুকুর দেখে এলেন। বাধা ঘাট অনেক দিনের পুরোনো—কতকাল এ ঘাট যেন কেউ ব্যবহার করে নি। পুকুরের ওপারেও বাগান, কিন্তু ওদিকটাতে আগাছার জঙ্গল বড় বেশি।

শরৎ বললে, বাবা, খিদে পেয়েচে?

—নাঃ—

—ঠিক পেয়েচে বাবা। উড়িয়ে দিলে শুনবো না। ভাঁড়ারে জিনিসপত্র সব আছে দেখে এসেচি—হালুয়া আর লুচি করে আনি।

কেদার চুপ করে তামাক টানতে লাগলেন, মেয়ের কাজে বাধা দেবার বিশেষ কোনো লক্ষণ প্রকাশ করলেন না অবিশ্যি। শরৎ কিন্তু অল্প একটু পরে রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে বললে—বাবা মুস্কিল বেধেচে—

—কি রে?

—এখানে তো দেখচি পাথুরে কয়লা জ্বালানো উনুন। কাঠের উনুন নেই। কয়লা কি করে জ্বালতে হয় জানি নে যে বাবা? ঝি না এলে হবেই না দেখচি।

শরৎ ছেলেমানুষের মত আনন্দে বাগানের সব জায়গায় বেড়িয়ে ফুল তুলে ডাল ভেঙ্গে এ গাছতলায় লোহার বেঞ্চিতে বসে ও গাছতলার লোহার বেঞ্চিতে বসে বসে উৎপাৎ করে বেড়াতে লাগলো। বেশ সুন্দর ছায়াভরা বাগান। কত রকমের ফুল—অধিকাংশই যে চেনে না, নামও জানে না। কেদার মেয়ের পীড়াপীড়িতে এক জায়গায় গিয়ে লোহার বেঞ্চিতে খানিকটা বসে কলের পুতুলের মত দু-একবার মাথা দুলিয়ে বলতে লাগলেন—বাঃ, বেশ—বাঃ—

বেলা যখন বেশ পড়ে এসেচে, তখন প্রভাস মোটর নিয়ে এসে বললে—আসুন কাকাবাবু, চলো শরৎ—কাকাবাবুকে কিছু খাইয়েচ?

শরৎ হেসে বললে, তা হয় নি। ঝি তো মোটেই আসেনি।

—তুমি তো বললে তুমিই করবে? জিনিসপত্র তো আছে।

—কয়লার উনুনে জ্বাল দিতে জানিনে, কয়লা ধরাতে জানিনে; তাতেই তো হোল না।

প্রভাস চিন্তিতমুখে বললে, তাই তো। এ তো বড় মুস্কিল হোল!—

কেদার বললেন, কিছু মুস্কিল নয় হে প্রভাস। চলো তুমি, ফিরে এসে বরং জলযোগ করা যাবে—

প্রভাস বললে, যদি নিকটের ভাল দোকান থেকে কিছু মিষ্টি কিনে আনি, তা আপনার চলবে না কাকাবাবু?

শরৎ হেসে বললে, বাবা ওসব খাবেন না প্রভাস-দা, তা ছাড়া আমি তা খেতেও দেবো না। কলকাতা সহরে শুনেচি বড় অসুখ বিসুখ, যেখান সেখান থেকে খাবার খাওয়া ওঁর সইবে না।

অগত্যা সকলে মোটরে উঠে বসলেন, গাড়ী ছাড়লো।

প্রথমে যশোর রোডের দু-ধারে বাগানবাড়ী ও কচুরীপানা বোঝাই ছোট বড় জলা ছাড়িয়ে বেলগেছের মোড়ের আলোকোজ্জ্বল দৃশ্য দেখে পিতাপুত্রী বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে পড়লো। ওদের দুজনের মুখে আর

কোনো কথা নেই। গাড়ী ওখান থেকে এসে পড়লো কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে —এবং দু-ধারে দোকান পসার, থিয়েটার, সিনেমা, ইলেকট্রিক আলোর বিজ্ঞাপন, দোকানের বাইরে শো-কেসে বহুবিচিত্র কাপড়, পোষাক, পুতুল, আয়না, সেণ্ট, সাবান, স্নো প্রভৃতির সুদৃশ্য সমাবেশের মধ্য দিয়ে গাড়ী এসে পড়লো হ্যারিসন রোডের মোড়ে এবং এখান থেকে গাড়ী ঘুরে গেল হাওড়ার পুলের ওপর ওপার হয়ে হাওড়া ষ্টেশনের গাড়ী-বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো।

পুল পার হবার সময় প্রভাস বললে, ওই দেখুন হাওড়ার পুল, নীচে গঙ্গা—আমরা যাচ্ছি হাওড়া ষ্টেশনে।

এবারও কেদার বা শরৎ কারো মুখ থেকে কোনো কথা বেরুলো না।

প্রভাস গাড়ী থামিয়ে বললে, কাকাবাবু, চলুন ষ্টেশনের রেষ্টোরেণ্ট থেকে আপনাকে চা খাইয়ে আনি—খাবেন কি?

কেদারের কোনো আপত্তি ছিল না—কিন্তু মেয়ে বাপের পরকালের দিকে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রেখেচে—বাবা নাস্তিক মানুষ—ওঁর এ বয়েসে কোনো অশাস্ত্রীয় অনাচারের সংস্পর্শে কখনো সে আসতে দেবে না কেদার তা ভাল জানতেন। তিনি মেয়ের মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাইলেন বটে, কিন্তু শরৎ তাঁর মুখের দিকে ভাল করে না চেয়েই বললে, চলুন প্রভাস-দা, উনি ওখানে খাবেন না—

অগত্যা প্রভাস আবার গাড়ী ছেড়ে হাওড়ার পুলের ওপর এল এবং আস্তে আস্তে চলতে লাগলো।

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, ওই দেখুন সব জাহাজ, শরৎ-দি ছাখো সমুদ্রে যে সমস্ত জাহাজ যায়, ওই দাঁড়িয়ে আছে—

ষ্ট্রাণ্ড রোড্ দিয়ে গাড়ী এল আউট্রাম ঘাটে। ওদের দু-জনকে নামিয়ে নিয়ে প্রভাস আউট্রাম ঘাটের জেটিতে গিয়ে একখানা বেঞ্চিতে বসলো। সামনের গঙ্গাবক্ষে ছোট বড় ষ্টীমার বাঁশি বাজিয়ে চলেচে,

বড় বড় ভড় ও বজরা ডাঙ্গার দিকে নোঙর করে রেখেচে, সার্চ্চলাইট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাল একখানা বড় ষ্টীমার আস্তে আস্তে যাচ্চে নদীর মাঝখান বেয়ে, সুবেশা নরনারীরা জেটির ওপর বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে—চারিদিকে একটা যেন আনন্দ ও উৎসাহের কোলাহল।

একটা বড় বয়া ঢেউয়ের স্রোতে দুলচে দেখে শরৎ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, ওটা কি ?

প্রভাস বললে, জাহাজ বাঁধে ওই আংটাতে, বয়া বলে ওকে আরও অনেক আছে নদীতে—

এতক্ষণ ওদের দু-জনের কথা যেন ফুটলো। কেদার নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বাপরে, এ কি কাণ্ড ! হ্যাঁ, সহর তো সহর, বলিহারি সহর বটে বাবা

শরৎ বললে, সত্যি বাবা, এমন কখনো ভাবিনি। এ যেন যাদুকরের কাণ্ড ! আচ্ছা, এখানে জলের ওপর ঘর কেন ?

প্রভাস বুঝিয়ে দিয়ে বললে, শরৎ-দি, কাকাবাবুকে এবার চা খাওয়ানো চলবে এখানে ? খুব ভাল বন্দোবস্ত।

শরৎ রাজি হোল না। বাবাকে পরকালে যমের বাড়ী সে কখনো পাঠাতে পারবে না! যা নাস্তিক উনি, এমনি কি গতি হয় ওঁর ভগবান জানে। তার ওপর রাশ আলগা দিলে কি আর রক্ষা আছে ? বাবা ধেই ধেই করে নৃত্য করে বেড়াবেন এই কলকাতা সহরে।

প্রভাসের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে শরৎ একটু বিরক্তই হোল। সে যখন বলচে যে বাবা যেখানে সেখানে খাবেন না, তখন তাঁকে অত প্রলোভন দেখবার মানে কি ?

বললে, আচ্ছা প্রভাস-দা, ওঁকে খাইয়ে কেন বাবার জাতটা মারবেন এ কদিনের জন্যে ? ও কথাই ছেড়ে দিন।

এবার কিন্তু কেদার বিদ্রোহ ঘোষণা করে বললেন, হ্যাঃ যত সব !

একদিন কোথাও চা খেলেই একেবারে নরকে যেতে হবে! নরক অত সোজা নয়, পরকালও অমন ঠুনকো জিনিস নয়! চলো সবাই মিলে চা খেয়ে আসা যাক হে—

শরৎ দৃঢ়স্বরে বললে, না, তা কখনো হবে না। যাও দিকি! সন্দে-আহ্নিক তো কর না কোনোকালে আবার ছত্রিশ জাতের হাতের জল না খেলে চলবে না তোমার বাবা?

কেদারের সাহসের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গেল। প্রভাসও আর অনুরোধ করলে না, তিনিও আর যেতে চাইলেন না। ওখান থেকে সবাই এল ইডেন গার্ডেনে। রাত প্রায় সাড়ে আটটা, বহু সুসজ্জিত সাহেব-মেমকে বেড়াতে দেখে শরৎ তো একেবারে বিস্ময়ে স্তম্ভিত। এত সাহেব-মেম একসঙ্গে কখনো দেখা দূরে থাক, কল্পনাও করেনি কোনো দিন। শরৎ হাঁ করে একদৃষ্টে এরিকা পামের কুঞ্জের মধ্যে বেঞ্চিতে উপবেশন রত দুটি সুবেশ, সুদর্শন সাহেব ও মেমের দিকে চেয়ে রইল। হঠাৎ কি ভেবে তার চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়তেই আঁচল দিয়ে ক্ষিপ্র-হস্তে সে মুছে ফেললে। শরতের মনে পড়লো, গ্রামের লোকের দুঃখদারিদ্র্য, কত ভাগ্যহত, দীনহীন ব্যক্তি সেখানে কখনো জীবনে আনন্দের মুখ দেখলে না। ব্যাণ্ডষ্ট্যাণ্ডে ব্যাণ্ড বাজছিল অনেকক্ষণ থেকে। শরৎ অনেকক্ষণ বাবার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজনা শুনলে। কিন্তু ওর ভালো লাগলো না। সবই যেন বেসুরো, তার অনভ্যস্ত কানে পদে পদে সুরের খুঁৎ ধরা পড়েছিলো।

প্রভাস বললে, সিনেমা দেখবে তো বলো নিয়ে যাই।

শরৎ কখনো না দেখলেও সিনেমা সম্বন্ধে গড়শিবপুরে থাকিতেই সহর-প্রত্যাগতা নববিবাহিতা বালিকা কিংবা বধূদের মুখে অনেক গল্প শুনেচে। বাবাকে এমন জিনিস দেখাতেই হবে, সে নিজে দেখুক না দেখুক। কিন্তু আজ আর নয় বাবার কিছু খাওয়া হয়নি বিকেল

থেকে। একবার তার মনে হোল বাবা চা খেতে চাইচেন, খান বরং কোনো ভাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দোকানে বসে! কি আর হবে! বাবা যা নাস্তিক, এত বয়েস হোল একবার পৈতে গাছটা হাতে করে গায়ত্রী জপটা করেন না কোনোদিন, পরকালে ওঁর অধোগতি ঠেকাবার সাধ্যি হবে না শরতের—সুতরাং ইহকালে যে ক'দিন বাঁচেন, অন্ততঃ সুখ করে যান। ইহকালে পরকালে দু-কালেই কষ্ট করে আর কি হবে?

শরৎ বললে, বাবাকে চা খাইয়ে নিই কোনো দোকানে বসে। ভাল দোকান দেখে—ব্রাহ্মণের দোকান নেই?

কেদার অবাক হয়ে মুখের দিকে চাইলেন। প্রভাস বিপন্ন মুখে বললে, ব্রাহ্মণের দোকান—তাইতো—ব্রাহ্মণের দোকান তো এদিকে দেখচি নে—আচ্ছা, হয়েচে—এক উড়ে বামুন ঘড়া করে চা বেচে ওই মোড়টাতে, ভাঁড়ে করে দেয়—সেই সবচেয়ে ভালো। চলুন নিয়ে যাই।

চা পান শেষ করে ওরা আবার মোটরে চৌরঙ্গী পার হয়ে পার্কষ্ট্রীটের মোড় পর্য্যন্ত গেল। এক জায়গায় এসে কেদার বললেন, এখানটাতে একটু নেমে হেঁটে দেখলে হোত না প্রভাস? বেশ দেখাচ্চে—গাড়ী এক জায়গায় রেখে ওরা পায়ে হেঁটে চৌরঙ্গীর চওড়া ফুটপথ দিয়ে আবার ধর্ম্মতলার মোড়ের দিকে আসতে লাগল দোকান হোটেলগুলির আলোকোজ্জ্বল অভ্যন্তর ও শো-কেসগুলির বিচিত্র পণ্যসম্ভার ওদের একেবারে তাক লাগিয়ে দিয়েচে—শরৎ তো একেবারে বিস্ময়বিমুগ্ধ।

কতকাল মেয়েমানুষ হয়েও সে জিনিসপত্রের লোভ করেনি। জিনিসপত্র অধিকার করে রাখবার মেয়েদের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি চেপে চেপে রাখে মনের মধ্যে, শরতের সে সব বহুদিন চলে গিয়েছিল মন থেকে মুছে—কিন্তু আজ যেন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠচে তারা।

একটা দোকানে ক্রিষ্ট্যালের চমৎকার ফুলদানি দেখে শরৎ ভাবলে—

আহা, একটা ওইরকম ফুলদানি কেনা যেতো!—বুনোফুল কত ফোটে এই সময় কালো পায়ার দীঘির পাড়ের জঙ্গলে, সাজিয়ে রাখতো সে রোজ রোজ। একটা চমৎকার পুতুল সাদা পাথরের, একটা কি অদ্ভুত রংএর কাঁচের বল তার মধ্যে বিজলির আলো জলচে···কি চমৎকার চমৎকার শাড়ী একটা বাঙালীর দোকানে, রাজলক্ষ্মীর জন্যে ওইরকম শাড়ী একখানা যদি নিয়ে যাওয়া যেতো! জন্মে সে এরকম রঙের আর এ রকম পাড়ের শাড়ী কখনো দেখেনি।

প্রভাস বললে, এটাকে বলে নিউমার্কেট। চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে এলাম —চলুন শরৎদির জন্যে কিছু ফল কিনি।

শরৎ বললে, না, আমার জন্যে আবার কেন খরচ করেন প্রভাস-দা? ফল কিনতে হবে না আপনার।

প্রভাস ওদের কথা না শুনে ফলের দোকানের দিকে সকলকে নিয়ে গেল। এর নাম ফলের দোকান! শরৎ ভেবেছিল, বুঝি ঝুড়িতে করে তাদের দেশের হাটের মত কলা, পেঁপে, বাতাবী নেবু বিক্রি হচ্ছে রাস্তার ধারে—এরই নাম ফলের দোকান। কিন্তু এ কি ব্যাপার! এত স্তূপীকৃত বেদানা, কমলানেবু, কিস্‌মিস, আনারস, আঙ্গুর যে একজায়গায় থাকতে পারে, এ কথা সে জানতো এখানে আসবার আগে? তবুও তো এগুলো তার পরিচিত ফল, পাড়াগাঁয়ের মেয়ে অন্য কত শত প্রকারের ফল রয়েচে যা সে কখনো চক্ষেও দেখেনি—নামও শোনেনি

শরৎ জিজ্ঞেস করলে, কাগজে জড়ানো জড়ানো ওগুলো কি ফল প্রভাস-দা?

—ও আপেল। কালিফোর্নিয়া বলে একটা দেশ আছে আমেরিকায়, সেখান থেকে এসেচে। তোমার জন্যে নেবো শরৎ-দি? আর কিছু আঙ্গুর নিই। কাকাবাবু আনারস ভালবাসেন?

একটা বড় ঠোঙায় ফল কিনে ওরা নিউমার্কেটের বিভিন্ন দিকে

বেড়াতে বেড়াতে এক জায়গায় এল—সেখানে একটা আস্ত বাঘের হাঁ-করা মুণ্ড মেজের ওপর দেখে শরৎ চমকে উঠে বাবাকে দেখিয়ে বললে, বাবা, একটা বাঘের মাথা!

কেদারও অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন সেদিকে।

প্রভাস বললে, এরা জন্তুর চামড়া আর মাথা এরকম সাজিয়ে বিক্রি করে। এদের বলে ট্যাক্সিডারমিষ্ট। এরকম অনেক দোকান আছে।

এইবার সত্যি সত্যি একটা জিনিস পছন্দ হয়েচে বটে শরতের। ওই বাঘের মুণ্ডু শুদ্ধু ছালখানা। তার নিজের শাড়ীর দরকার নেই, গহনা দরকার নেই—সে সব দিন হয়ে গিয়েচে তার জীবনে। কিন্তু এই একটা পছন্দসই জিনিস যদি সে নিজের দখলে নিজের ঘর সাজিয়ে রাখতে পারতো, তবে সুখ ছিল পাঁচজনকে দেখিয়ে, নিজে পাঁচবার দেখে, পাঁচজনকে ওর গল্প করে। ডেকে এনে পাঁচজনকে দেখাবার মত জিনিস বটে!

মুখ ফুটে সে প্রভাসকে দামটা জিজ্ঞেস করলে। প্রভাস দোকানে ঢুকে বললে, ওটা বিক্রির জন্যে নয়। দোকান সাজাবার জন্যে। তবে ওরকম ওদের আছে,—আড়াই শো টাকা দাম।

অরুণ বললে, এখন কোথায় যাওয়া হবে?

প্রভাস বললে, কেন সিনেমায়? কি বলেন কাকাবাবু—

শরতের যদিও সিনেমা দেখবার আগ্রহ খুবই প্রবল, তবুও সে যেতে রাজি হোল না। বাবা সেই কোন্ সকালে দুটো খেয়ে বেরিয়েছেন, এখন গিয়ে রান্না না চড়িয়ে দিলে আবার তিনি কখন খাবেন।

অগত্যা সকালে মোটরে আলোকোজ্জ্বল কলিকাতা নগরীর বিরাট সৌন্দর্য্যের মধ্যে দিয়ে ওরা চলে এল আবার সেই বেলগেছের পুলের মুখে।

শরৎ এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এই বার বললে, বাবাঃ, কত বড় সহর? কুলও নেই, কিনারাও নেই।

প্রভাস হেসে বললে, শরৎ-দি, একি আর তুমি ধর্ম্মদাসপুর পেয়েছ? গড়শিবপুর থেকে ধর্ম্মদাসপুর যত বড়—ততখানি লম্বা হবে কলকাতা। আজ চল কাল আবার ভাল করে দেখো। আমাদের মলঙ্গালেনের বাড়ীতেও নিয়ে যাব।

বেলগেছের পুল ছেড়ে দু-ধারের দৃশ্য যেন অনেকটা পাড়াগাঁয়ের মত। বড় বড় বাগান বাড়ীর ঘন বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে দু-চারটি বিজলি বাতি, কোনো কোনো বাগানবাড়ী একদম অন্ধকার। এখানে এক পশলা বৃষ্টি আসতে গাড়ীর জানালার কাচ উঠিয়ে দেওয়া হোল হাণ্ডেল ঘুরিয়ে—খাড়া সোজা পথ তীব্র হেডলাইটের আলোয় স্পষ্ট ফুটে উঠেছে চোখের সামনে—দ্রুতগামী মোটর লম্ফে লম্ফে যেন সে সুদীর্ঘ পথটার খানিকটা করে অংশ এক এক কামড়ে গিলে খাচ্ছে। শরৎ হাঁ করে চেয়ে রইল।

ওদের বাগান বাড়ীটার ফটক দিয়ে গাড়ী ঢুকলো ভেতরে।

এ বাগানটা যেন আরও অন্ধকার। তবে সব ঘরেই বিজলি বাতির বন্দোবস্ত।

প্রভাস কি টিপলে—পুটুস্ পুটুস্—এ ঘরে আলো জ্বলে উঠলে সবুজ কাঁচের বড় চিমনির মধ্যে দিয়ে—বারান্দায় পুটুস্ পুটুস্—দীর্ঘ বারান্দার এদিক থেকে ওদিকে তিনটি আলো জ্বলে উঠলো।

শরৎ বললে, আমায় দেখিয়ে দিন প্রভাস-দা কি করে জ্বালতে হয়—

পুটুস্—বাতি নিবে গেল—একদম অন্ধকার।

—এইটে হাত দিয়ে টেপো শরৎ-দি—এই দেখো—এই জ্বললো—আবার উঠিয়ে দাও—এই নিবে গেল—

শরৎ বালিকার মত খুসিতে বার বার সুইচ টিপে আলো একবার জ্বালিয়ে নিবিয়ে দেখতে লাগলো।

—বাবা, স্থাখো কি রকম, তুমি এ রকম দেখো নি—

কেদার তাচ্ছিল্যের সুরে বলিলেন, ওসব তুমি দেখো মা। আমি এর আগেও এসেছি, ওসব দেখে গিয়েছি—

শরৎ বললে, সে কবে বাবা? তুমি আবার কবে কলকাতায় এসেছিলে শুনি?

—তুই তখন জন্মাস নি। কলকাতায় তখন ঘোড়ার ট্রাম চলতো। তোর মার জন্যে বড়বাজার থেকে ভাল তাঁতের ডুরে-শাড়ী কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম, তাই দেখে তোর মার কি আহ্লাদ!...তখন ইলেকটিরি আলো সব রাস্তায় ছিল না, দু-একটা বড় রাস্তায় দেখেছিলাম। লোকের বাড়ীতে তখন গ্যাস জ্বলতো—

প্রভাস বিস্ময়ের সুরে বললে, সত্যি কাকাবাবু, আপনি যা বলচেন ঠিক তো। আমি বাবার মুখেও শুনেছি প্রথম হ্যারিসন রোডে ইলেক্‌ট্রিক লাইট জ্বলে তখন—

—হাঁ, হাঁ, ওই যে রাস্তা বললে, ওখানেই আমি দেখেছি—অনেক দিনের কথা।

ইতিমধ্যে ঝি এসে জানালে, উনুনে আঁচ দেওয়া হয়েছে। শরৎ তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে গেল—যাবার সময় বলে গেল বোসো বাবা, ভাল করে চা করে আনি—প্রভাস-দা, অরুণবাবু যাবেন না চা না খেয়ে।

রাত সাড়ে ন'টার মধ্যে ক্ষিপ্রহস্তে রান্না-বাড়া সাঙ্গ করে শরৎ বাবাকে খাওয়ার ঠাঁই করে দিলে। প্রভাস ও অরুণ তার অনেক আগে চা পান করে বিদায় নিয়েছে।

শরৎ মাথা দুলিয়ে বললে, ভাত কিন্তু নয় বাবা—লুচি—

—যা হয় দাও মা। লুচি কেন?

—লুচির বন্দোবস্ত দেখি করে রেখেছে। ঘি, আটা—চা'ল আনে নি—